

বনফুল

রচনাবলী ০৬

বনফুল রচনাবলী

ষষ্ঠ খণ্ড

শ্রীবলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়

গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড ॥ কলকাতা-৭৩

সম্পাদনা :
ডঃ সরোজমোহন মিত্র
শ্রীশচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীনিরঞ্জন চক্রবর্তী
সহযোগী :
শ্রীশুভেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রচ্ছদ-রূপায়ণ :
শ্রীশৈলেন শীল
শ্রীসমরেশ বসু

মুদ্রাকর :
শ্রীদুলালচন্দ্র ভুঞ্যা
সুদীপ প্রিণ্টার্স
৪/১এ, সনাতন শীল লেন, কলকাতা-১২

প্রকাশক :
মুরলীধর ঘটক
গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড
১১এ, বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায় স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩

সূচীপত্র

উপন্যাস :

অগ্নি

।। এক ।।

অংশুমান স্বপ্ন দেখছে। দিবাস্বপ্ন। জেলে বসে বসে। দেশের জন্য জেলে এসেছে। একখানা বই পড়তে পেয়েছে—ইলেক্‌ট্রিসিটির ইতিহাস। সেইটে কেন্দ্র করেই স্বপ্ন জাগছে নানা রঙের। দেশের অন্তরার, রূপকথার। মন উড়ে চলেছে জেলের প্রাচীর ভেদ করে দূরদূরান্তে, অতীতে ভবিষ্যতে আশা-আকাঙ্ক্ষার কল্পলোকে।

"যাচ্ছি, যাচ্ছি, তোমারই কাছে যাব, ডাক শুনতে পেয়েছি, যাচ্ছি....।" সে চলেছে। অনাদি অনন্ত অতীত থেকে অনাদি অনন্ত ভবিষ্যের দিকে অন্তহীন প্রবাহে। তার চলার বেগ, তার আগ্রহ, তার গতি-ব্যাকুলতা যুগে যুগে উতলা করেছে মানুষকে। মানুষ বোঝেনি ঠিক। বিস্মিত হয়েছে, অনুসন্ধান করেছে। আজও করছে।

চুম্বক লোহাকে আকর্ষণ করে। কম্পাসের কাঁটা উত্তর দিকে ফিরে থাকে অহরহ্। কেন? যীশুখ্রীস্টের জন্মের অনেক আগে বৈজ্ঞানিক জন্মেছে। সত্য আলেয়ার পিছনে ছুটে চলেছে অবিরাম।

চীন দেশের নাবিকেরা সমুদ্র-লঙ্ঘন করছে চুম্বকের সাহায্যে। গ্রীসের হোমার, থেলিস, পাইথাগোরাস, ইউরিপিডিস, প্লেটো, অ্যারিস্টটল—সকলেরই ধ্যানভঙ্গ হয়েছে মাঝে মাঝে চুম্বকের টানে। লুক্রেটিয়াস, সিসেরো অবাক্ হয়েছে চুম্বকের কাণ্ড দেখে।

"যাচ্ছি, যাচ্ছি, তোমারই উদ্দেশে চলেছি...." এ কথার অর্থ কিন্তু বোঝেনি তখনও কেউ। বোঝেনি, কিন্তু তার গতি-বেগকে কাজে লাগাতেও ছাড়েনি।

একজন চীন-সম্রাট বিধ্বস্ত করছেন তাঁর প্রতিপক্ষকে চুম্বকের সাহায্যে দিক নির্ণয় করে। চলেছে ক্রুজেডাররা ধর্ম-যুদ্ধ করতে। যুদ্ধের অবসরে আহরণ করছে চুম্বক-তত্ত্ব শত্রুপক্ষ আরবদের কাছ থেকেই।... গ্রীসের ওরেক্‌ল্‌কে নিয়ন্ত্রিত করছে চুম্বক।..... কে রাজা হবে ঠিক করছে শূন্যে অবস্থিত চুম্বকের আংটি টেবিলের উপর বিছানো বর্ণমালার উপর ঘুরে ঘুরে।

রেশমের কাপড় দিয়ে তৃণমণিকে (Amber) ঘষলে তৃণমণি নানাবিধ হালকা জিনিসের টুকরো আর্কষণ করে। কেন? সুদূর অতীতে প্রাচীন গ্রীসে সবিস্ময়ে মানুষ ভাবছে, নিশ্চয় ওদের মধ্যেও আত্মা আছে। সুপ্ত আত্মা ঘর্ষণে জেগে ওঠে। তৃণমণি আর চুম্বকে দেবতার প্রকাশ প্রত্যক্ষ করে পুজো করছে কেউ কেউ। বিস্মিত মানবের জাগ্রত অনুসন্ধিৎসা সত্য সন্ধান করে চলেছে তবু। ধার্মিক ধর্ম-তত্ত্ব ভুলে সবিস্ময়ে ভাবছেন। পাদ্রি নিমগ্ন হয়েছেন চুম্বকের গবেষণায়।

"যাচ্ছি, যাচ্ছি, ডাক শুনতে পেয়েছি আমি, যাচ্ছি...." তার গতির স্পন্দন আকুল করে তুলেছে মানুষকে। নানা বিজ্ঞানীর মনে নানা অর্থ বহন করছে। অর্থ অর্থান্তরে পরিণত হচ্ছে। যুগ যুগান্তরে।

রাণী এলিজাবেথের ডাক্তার তিনি। অর্থোপার্জনের দিকে তাঁর মন নেই। ডাক্তারির দিকেও

না। রুটির জন্যে ওসব করতে হয়, তাই করা। তাঁর সমস্ত মন পড়ে আছে চুম্বকের দিকে। চুম্বকেরই নানা তথ্য খুঁজছেন, ভাবছেন, লিখছেন। চুম্বক আর বিদ্যুৎ....কি এরা? একই জিনিসের বিভিন্ন প্রকাশ নয়তো? হয়তো....হয়তো....। সারাজীবন কেটে গেল প্রমাণ সংগ্রহ করতে। হঠাৎ মারা গেলেন একদিন। প্লেগে।

সে চলেছে।

শত বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করে, মেঘ-মেদুর অম্বর, অন্ধকার রাত্রি, ছায়াছন্ন বনভূমি, সমস্ত তুচ্ছ করে রাধা যখন অভিসারে চলেছিলেন, নিকুঞ্জগৃহে অপেক্ষমান পীতবসন বনমালী ছাড়া কিছুই যখন তাঁর চেতনা-গোচর ছিল না, নামসমেতং কৃতসঙ্কেতং বাদয়তে মৃদুবেণুম্—সেই বাঁশী ছাড়া আর কিছুই যখন তিনি শুনতে পাচ্ছিলেন না, তখন নিখিল বিশ্বও কি রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠেনি? আকাশে বাতাসে চন্দ্রে তারায় শিহরন কি লাগেনি? কবির মনে জাগেনি কি স্বপ্ন? সেদিনকার স্বপ্ন-প্রবাহই কি আকুল করেনি পরবর্তী যুগের চণ্ডীদাস জয়দেবকে?

তার গতির ছন্দও স্বপ্ন জাগিয়েছিল।

বেতার-বার্তার স্বপ্ন দেখেছিলেন কেউ কেউ সে যুগেও।

অক্ষ-সংলগ্ন বিরাট এক গন্ধক-গোলক বস্ত্রঘর্ষণে বিদুতায়িত হয়ে উঠেছে। সশব্দে খানিকটা আলো ছিটকে পড়ল। বিস্ময়ে চমকে উঠলেন আবিষ্কারক। যন্ত্র-যোগে প্রথম বিদ্যুৎস্ফুরণ।

"যাচ্ছি....যাচ্ছি....যাচ্ছি...."

অপরা-তড়িৎ কেবলই মিলতে চায় পরা-তড়িতের সঙ্গে।

রহস্য-লোকে আলোকপাত হতে লাগল ক্রমশ। টোয়াইন সুতো দিয়ে পরীক্ষা করে চমকে গেলেন একজন। সুতো বেয়েও বিদ্যুতের তরঙ্গ চলে। সাত শো পয়ষট্টি ফিট দূরেও বিদ্যুতের অস্তিত্ব দেখতে পেলেন তিনি। কৌতূহল জাগল, মানুষের শরীরের ভিতর দিয়েও এর গতিবিধি আছে নাকি? ছোট ছেলেদের উঁচুতে ঝুলিয়ে পরীক্ষা করতে লাগলেন, তাদের শরীরের ভিতর দিয়ে বিদ্যুৎ চলাচল করে কি না! ছোট ছেলেরা তাঁকে দেখলেই পালাত। মুরগী নিয়ে পড়লেন শেষটা। সারাজীবন ধরে হাতড়ে গেছেন। রহস্যের পর রহস্য, নিত্য নূতন রহস্য। মৃত্যুশয্যায় শুয়ে শুয়েও বলছেন, টুকে নাও, টুকে নাও। অনেক কিছু দেখেছি, অনেক কিছু পেয়েছি, প্রকাশ করে যেতে পারলাম না। টুকে নাও—শিগ্‌গির—। বলতে বলতেই অন্তিম নিশ্বাস পড়ল।

এল আবার নূতন মানুষ। বাজল নূতন সুর তার কানে। চোখে ফুটল নূতন দৃষ্টি-ভঙ্গী। দু রকম বিদ্যুৎ আছে—এক রকম কাচ থেকে হয়, আর এক রকম রজন থেকে।

চুম্বক, বিদ্যুৎ—কি এরা? সুপ্ত আত্মা? দেবতার প্রকাশ? অশ্রুতিগোচর সুর কিন্তু বাজতেই লাগল—"যাচ্ছি, যাচ্ছি, যাবই?"

শুনতে পেলে না কেউ। বিচলিত হল তবু নানাভাবে।

কৃষ্ণের বাঁশি বাজে, তবু যেতে পারে না রাধা। জটিলা কুটিলা আয়ান ঘোষ। রাজপ্রাসাদে বসে কাঁদে জাহানারা। নূরমহলের চামেলীকুঞ্জে বর্ষা নেমেছে। সমস্ত অন্তর গলে পড়ছে যেন। "দুলেরা, দুলেরা, কোথা তুমি? আমরা জলাশয়, তোমরা মরাল। কেন দূরে সরে আছ এখনও?" জাহানারা কাঁদে, কিন্তু যেতে পারে না। বাধা দুস্তর। জাহানারা পাতশাহ বেগম, দুলেরা সামান্য গায়ক মাত্র। সব বাধা অতিক্রম করা যায় না।

...সব জিনিস বিদ্যুৎ-পরিবাহী নয়—আবিষ্কার করলেন একজন।

দেখা যায়, কিন্তু দেখা যায় না। কাছে আসে, কিন্তু থাকে না। বাসনালোলুপ মানুষের চিত্ত উন্মুখ হয়ে ওঠে। বাসনার বহ্নিতে ইন্ধন যোগায় বুদ্ধি। চিরকাল যুগিয়েছে।

ঘোড়া গরু কুকুর হরিণ পাখি বনচর জলচর খেচর—সমস্ত কিছু উৎসুক করেছিল একদিন মানব-মনীষাকে। এদেরও দেখা যেত, কিন্তু রাখা যেত না। কাছে আসত, কিন্তু ধরা দিত না। মানুষ ফাঁদ পাততে শিখল। খাদ্যের লোভে, সঙ্গীর লোভে, অসংখ্য অদৃশ্য প্রবৃত্তির অমোঘ তাড়নায় দলে দলে ধরা পড়ল প্রলুব্ধ পশুর দল। আয়ত্তাতীত ছিল যারা, আয়ত্তাধীন হল। বন্য মানব সভ্য হল। বন্যপশুর দল ঢুকল এসে মানবনির্মিত পশুশালায়। গড়ে উঠল কৃষিসভ্যতা।

"যাচ্ছি, যাচ্ছি, যাচ্ছি..."

সেও যেতে চায়। সুযোগ পেলেই চলে যায়। সুযোগ পায় না কিন্তু সব সময়ে। কাচ বিদ্যুৎ-পরিবাহী নয়। কাচের কারাগারে বন্দী করলে পালাতে পারে না সে। মানুষ পশুশালা তৈরি করেছিল, হারেম তৈরি করেছিল, লিডেন জারও করলে। কাচের কারাগারে বন্দী হল সে। হঠাৎ অংশুমানের মনে হল, অস্তরাও তো বন্দী হয়ে আছে বিরাট একটা সামাজিক লিডেন জারে।

প্রথম লিডেন জারে আবিষ্কারক প্রচণ্ড একটা ধাক্কা খেয়েছিলেন। ধাক্কা দিয়ে পালিয়েছিল সে। প্রথম বন্দিনী মানবীও হয়তো প্রচণ্ড ধাক্কা দেয় তার প্রথম অপহারককে। বন্য মানবীর মনে কি প্রেম ছিল না? সে কি কুক্কুরীর মত বলিষ্ঠতমের কাছেই আত্মসমর্পণ করত জৈবিক প্রেরণায়? বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় না। বরং এই কথাই ভাবতে ইচ্ছে করে, আজও যেমন সে প্রেমে পড়ে, তখনও পড়ত। বিচার-বুদ্ধির মানদণ্ডকে অগ্রাহ্য করে অকারণে তার সমস্ত চিত্ত উন্মুখ হয়ে উঠত একটি বিশেষ মানুষের জন্য। সে সুন্দর বলে নয়, ধনী বলে নয়, বলিষ্ঠ বলে নয়—সে সে বলে। তার বিশেষ একটি রূপ বিশেষ করে তার চোখেই পড়েছিল বলে।

অস্তরা কি দেখেছিল তার মধ্যে? অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল অংশুমান। মনে হল, একটা সত্যের আভাস পেয়েছে সে। জেলে এই একটি মাত্র বই পেয়েছে সে পড়বার জন্যে। খবরের কাগজও আসে—ইংরেজ সম্পাদিত দৈনিক একখানা। এই বইটাই কিন্তু পেয়ে বসেছে তাকে। এর মধ্যেই অভিনব কল্পনার খোরাক পেয়েছে সে। প্রেমের আকর্ষণই সবচেয়ে বড় আকর্ষণ পৃথিবীতে। অপরা-তড়িৎ পরা-তড়িতের দিকে ছুটে চলেছে কিসের আকর্ষণে? প্রেমের? কে জানে!

খবরের কাগজ দিয়ে গেল। ইলেক্‌ট্রিসিটির ইতিহাস মুড়ে রেখে খবরের কাগজখানা খুললে সে। মিনিট খানেক পরে হঠাৎ তার গালে ঠাস করে চড় মারলে কে যেন একটা। খবরের কাগজটা তাড়াতাড়ি নামিয়ে রেখে দিলে সে। না, খবরের কাগজ সে পড়বে না। মিথ্যেয় ভরতি।

"ও খবরের কাগজ পড়বে না? শোন তবে। তুমি চোর, তোমার বাবা চোর, তোমার চৌদ্দ পুরুষ চোর। এদের জুতো-পায়ের ধুলো মাথায় পড়াতে তবে তোমরা উদ্ধার হয়েছ। তুমি পাজি, তোমার বাবা পাজি, তোমার চৌদ্দ পুরুষ পাজি। এদের সংস্পর্শে এসে তবে তোমরা ভদ্র হয়েছ। তুমি মূর্খ, তোমার বাবা মূর্খ, তোমার চৌদ্দ পুরুষ মূর্খ। এদের কাছে লেখাপড়া শিখে তবে তোমরা মানুষ হয়েছ...

তারস্বরে চিৎকার করছে কানের কাছে। নির্বাক হয়ে শুনে যেতে হচ্ছে। হাত পা মুখ সব বাঁধা। চিৎকার করছে নিজের লোকেরাই—নিজের বাবা, নিজের ভাই, নিজের বন্ধু। কেউ চিৎকার করছে চরিত্র-ভ্রষ্ট হয়েছে বলে, কেউ চাবুকের চোটে, কেউ বকশিশের লোভে। চিৎকার করে চলেছে দিনরাত। হিমালয় থেকে কুমারিকা পর্য্যন্ত কোথাও বাদ নেই। তুমুল চিৎকার...বিরাট চিৎকার... চাবুকের চোটে চিৎকার করছে..., বকশিশের লোভে...

হঠাৎ ঘুমটা ভেঙে গেল। উঃ, কি দারুণ দুঃস্বপ্ন! চোখ চেয়ে দেখলে একবার, চারিদিকে অন্ধকার। চোখ বুজে পাশ ফিরে শুল। ঘুম আসছে না। তার সমস্ত চিত্ত জুড়ে একটি কথাই জাগছে সারা দিন ধরে। বিজ্ঞানের এত আবিষ্কার শুধু কি মানব-পশুর পাশবিক শক্তিকে বাড়াবার জন্যেই? প্রেম নয়, হিংসাই কি তার পরিণতি? অন্তরার মুখখানা মনের মধ্যে ফুটে উঠল আবার। লজ্জিত হল একটু।

"আমার আবিষ্কারের আসল সত্যটা তো তুমি জান।" চমকে উঠল অংশুমান। একটি হাস্যদীপ্ত মুখ চেয়ে আছে তার দিকে। তীক্ষ্ণ নাসা, আকর্ণ-বিশ্রান্ত চক্ষু, প্রশস্ত ললাট। মাথার সামনের দিকে টাক। ভয় পেয়ে গেল সে।

কে আপনি?

আমি গ্যাল্‌ভানি। তুমি কষ্ট পাচ্ছ, তাই তোমায় সান্ত্বনা দিতে এসেছি। ভালোবেসেছ, তার জন্যে লজ্জা কি? ভালোবাসাই মনুষ্যত্বের লক্ষণ। আমি ভালোবেসেছিলাম বলেই অতবড় আবিষ্কারটা করে ফেলতে পারলাম। স্ত্রীর জন্যে নিজের হাতে যদি ব্যাঙের ঝোল রাঁধতে না যেতাম, তা হলে হয়তো কিছুই হত না...

আর একজন এসে দাঁড়ালেন।

ঠিক বলেছ। বিয়ে না করলে আমিও হয়তো বৈজ্ঞানিক হতাম না। মাদামোয়াজেল জুলিকে ভালোবেসে বিয়ে করেছিলাম বলেই উপার্জনের চেষ্টায় বৈজ্ঞানিক হতে হল। তা না হলে হয়তো ল্যাটিন কবিতা নিয়েই মেতে থাকতাম সারা জীবন...

একটু মুচকি হেসে গ্যালভ্যানি চলে গেলেন। অংশুমান বিস্মিত হয়ে চেয়ে রইল দ্বিতীয় লোকটির মুখের দিকে। একমাথা কোঁকড়ানো বড় বড় চুল। বড় বড় নীল চোখে প্রশান্ত হাস্যোজ্জ্বল দৃষ্টি। বলিষ্ঠ নাক, পুরু ঠোঁট। প্রকাণ্ড কলারওলা বুক-খোলা জামা গায়ে। গলায় একটা মাফলার জড়ানো।

আপনি...?

আমি অ্যাল্‌পিয়র। আমাদের জীবন-চরিত নিয়ে তন্ময় হয়ে আলোচনা করছ তুমি, তাই একটা সাড়া পড়ে গেছে আমাদের মধ্যে। আমরা অনেকেই আসব তোমার কাছে। ভয় পেয়ো

না। তার পর একটু হেসে বললেন, ভয় পাবার ছেলে অবশ্য তুমি নও। যা কাণ্ড করেছ! কাণ্ডটা যে কত ভয়ানক তা আমার অজানা নেই, ফ্রেঞ্চ রিভলিউশনের মধ্যে আমি মানুষ। কিন্তু হ্যাঁ, যে কথাটা বলতে এসেছিলাম, তুমি যা ভেবেছিলে আজ, যেটাকে সত্যের আভাস বলে মনে হচ্ছিল তোমার, সেটা বেশ নতুন কথা, হয়তো সত্য কথাই।

'হয়তো' বলছেন কেন?

সত্যের নানা মূর্তি—কোন্‌টা ঠিক তা কি করে বলব? এই দেখ না, ফ্রেঞ্চ রিভলিউশনকে প্রথমে সত্যের বড় একটা প্রকাশ বলে মনে হয়েছিল আমার, কিন্তু তারা যখন আমার বাবাকে কেটে ফেললে, তখন আমি মুষড়ে গেলাম। সত্যের চেহারা গেল বদলে। হোরেসের 'গুড টু লিসিনিয়াস' তখন একমাত্র সত্য বলে মনে হতে লাগল, তার জোরেই বেঁচে উঠলাম আবার। আসল কথা কি জান, যেটাকে সত্য বলে মনে হচ্ছে, সেইটেকে প্রাণপণে আঁকড়ে থাক, যতক্ষণ না সেটা মিথ্যায় রূপান্তরিত হয়।

চোখ দুটো হাসিতে জ্বলজ্বল করতে লাগল। অকস্মাৎ অন্ধকার মিলিয়ে গেলেন তিনি। অংশুমান প্রথমে ভয় পেয়েছিল, কিন্তু ভয় কেটে গেল তার। মনে পড়ল, ঠাকুমা একদিন দেখা দিয়েছিলেন তাকে স্কুলে টিফিনের সময়। পরলোক আছে। মানুষ মরে না, কেউ মরে না।

সোৎসাহে বিছানায় উঠে বসল সে। চতুর্দিকে অন্ধকার। অন্ধকারের দিকেই নির্নিমেষে চেয়ে রইল। দেখতে পেল, অন্ধকারের বুক চিরে বিরাট একটা বিদ্যুৎতরঙ্গ প্রসারিত হয়ে রয়েছে সুদূর ভবিষ্যতের দিকে। সেই প্রদীপ্ত ক্ষুরধার আলোক-রেখা ধরে চলেছে অসংখ্য নরনারীর জ্যোতির্ময় মিছিল।

।। দুই।।

বাইরের অন্ধকারাচ্ছন্ন আকাশ নির্মেঘ। অসংখ্য নক্ষত্র জ্বলছে। সহস্রপাদ সহস্রশীর্ষ সহস্রাক্ষ পুরুষের উজ্জ্বল দৃষ্টিতে জ্বলছে যেন অনন্তকালের অগ্নিদীপ্ত ইতিহাস। মাঠের মাঝখানে বটগাছটাকে ঘিরে খদ্যোৎকুল শুরু করেছে অগ্ন্যুৎসব। গাঢ় তমিস্রা ভেদ করে পেচকের কর্কশ রব প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠল, তা সঙ্গীতে রূপান্তরিত হল পেচকীর কর্ণে। অন্ধকারাচ্ছন্ন গভীর রাত্রি গম্ভীর। সাবধানসঞ্চরণে চলেছে শ্বাপদ, তস্কর, যোগী, ভোগী, দৃশ্য অদৃশ্য অসংখ্য প্রাণী, অসংখ্য উদ্দেশ্যে স্মরণাতীত কাল থেকে। আকাশের অগ্নি মর্ত্যের মৃত্তিকায় নেমে লীলায়িত হয়েছে নব নব রূপে নব নব প্রেরণায়। অন্ধকার পুরীর রহস্যালোকে রূপায়িত হচ্ছে চিরন্তন স্বপ্ন।

রোজ যেমন হয়।

।। তিন।।

প্রতিদিনের মত তার পরদিনেও যথারীতি জেরা শুরু হয়ে গেল। সি. আই. ডি. দারোগাটি বিনয়ের অবতার। একমুখ হেসে পকেট থেকে পানের ডিবে বার করে একসঙ্গে গোটা চারেক

পান মুখে পুরে ফেললেন। তার পর ডিবেটি অংশুমানের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, নিন, আসুন।

আমি নেব না। ধন্যবাদ।

আজও নেবেন না?

অংশুমান চুপ করে রইল।

দারোগা সাহেব তর্জনীতে খানিকটা চুন লাগিয়ে নীচের দাঁত দিয়ে সেটা কুরে তুলে নিলেন। জরদা খেলেন একটু। তার পর উঠে জানলা দিয়ে পিক ফেললেন একবার।

আপনি গোড়া থেকেই একটা ভুল করছেন অংশুমানবাবু। আপনি ধরে নিয়েছেন যে, আমরা আপনার শত্রুপক্ষ। গভর্মেণ্টি আপনার শত্রু হতে পারে, আপনারা নিজেরাই শত্রুতা করছেন তার সঙ্গে; কিন্তু আমরা আপনার শত্রু নই, অন্তত আমি নই। আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করি, যাতে আপনাদের সুবিধে হয়।

হাস্যদীপ্ত চক্ষু মেলে চেয়ে রইলেন।

অংশুমান নীরব।

আপনার সঙ্গে আর কে কে ছিল—এই খবরটুকু পেলেই আপনাকে ছেড়ে দেব আমরা। আপনি যে নির্দোষ সে খবর আমরা পেয়েছি। কিন্তু দোষীকেও তো ধরতে হবে। আপনি সে বিষয়ে একটু সাহায্য করুন আমাদের শুধু। সেইজন্যেই আপনাকে আটকে রাখা। নাম কটা বলে দিন, ব্যাস্।

আমি তো বলেছি, আমি কিছু জানি না।

দেখুন, ও-সব কথা বলে ভোলাতে পারবেন না আমাদের। আপনি যে জানেন তা আমরা জানি।

অংশুমান চুপ করে রইল।

আপনি শিক্ষিত লোক, আপনার অন্তত আইনকে সাহায্য করা উচিত। সমাজকে রক্ষা করবার জন্যেই তো আইন, আপনার অন্তত সে আইনের মর্যাদা রক্ষা করা কর্তব্য। একজন লোককে নিষ্ঠুরভাবে পুড়িয়ে মারা হয়েছে। ন্যায়ত হত্যাকারীদের শাস্তি দেওয়া আপনারও কর্তব্য নয় কি? জাস্টিস বলে একটা জিনিস আছে তো!

হঠাৎ গ্রীক দার্শনিকের কথাগুলো মনে পড়ে গেল তার। লিস্‌ন্ দেন, আই প্রোক্লেম দ্যাট মাইট ইজ রাইট অ্যাণ্ড জাস্টিস ইজ দি ইন্‌টারেস্ট অফ দি স্ট্রঙ্গার...। সঙ্গে সঙ্গে অর্ধদগ্ধ ডেপুটিটার মুখখানাও মনে পড়ল। হাত-পা-মুখ বেঁধে টাঙিয়ে পোড়ানো হয়েছিল তাকে পায়ের দিক থেকে। তার সেই ঠিকরে-বেরিয়ে-আসা লাল বড় চোখ দুটো এখনও যেন চেয়ে আছে তার দিকে। তারও তো মা বউ ছেলে মেয়ে আছে! তারা কি করছে এখন? তাদের দুঃখে মনটা দ্রবীভূত হচ্ছিল। কিন্তু বহু অসহায় আর্ত নারীকণ্ঠের চিৎকার আবার বেজে উঠল কানে সহসা।...দলে দলে পাঠান-সৈন্য ঘরে ঘরে ঢুকে নারী-ধর্ষণ করছে ওই ডেপুটিটার হুকুমে।

একমুখ হেসে দারোগাবাবু আবার প্রশ্ন করলেন, বেশ, না হয় ধরেই নিলাম, আপনি কিছু জানেন না। আপনি কাকে সন্দেহ করেন তাও বলুন অন্তত।

অংশুমান প্রস্তরমূর্তিবৎ বসে রইল, কোন উত্তর দিলে না।

।। চার।।

জেলের বাইরে প্রকাণ্ড মাঠ। মাঠের উপর বিশাল একটা শিরীষ গাছ। তার উঁচু ডালে বসে একটা দাঁড়কাক একটানা ডেকে চলেছে কা--কা—কা--কা—কা...। আর একটি ডালে পাশাপাশি বসে আছে একজোড়া ঘুঘু। স্তিমিত-নয়ন নির্বিকার একটি ঘুঘু হঠাৎ সচকিত হয়ে উঠে বসল, ঘাড় বেঁকিয়ে ঠোঁট দিয়ে পিঠ চুলকোতে লাগল। শিরীষগাছের পত্রপুঞ্জে ফুটেছে মরকত-মণির আভা। কাছেই ছোট্ট এক টুকরো ঢালু জমি অপরূপ হয়ে উঠেছে নবদুর্বাদলশ্যাম কান্তিতে। খঞ্জন-দম্পতি মনের আনন্দে চরে বেড়াচ্ছে তার উপরে। তাদের লঘুচপল গতি, পুচ্ছের আন্দোলন নিঃশব্দ ছন্দে স্পন্দিত করছে পারিপার্শ্বিককে। জলে স্থলে আকাশে বাতাসে নিস্তব্ধ দ্বিপ্রহরের স্বর্ণকান্তি সমুদ্ভাসিত। দ্বিপ্রহরের উগ্র জ্যোতিতে চকচক করছে বেঅনেটের ডগাটা। জেলের গেটে খাকী পোশাক পরে নিঃশব্দে পদচারণ করছে পাঠান প্রহরী।

।। পাঁচ।।

অপমানে সমস্ত চিত্ত অবসন্ন, হতাশার লক্ষ কণ্টকে বর্তমান-ভবিষ্যৎ সমাকীর্ণ। তবু সেই কণ্টকবনে ফুল ফুটে রয়েছে একটি। অম্লান কুসুম। অন্তরা।

অন্তরাকে ভালবেসেছিলাম কেন--ভাবছিল অংশুমান। ভালবাসার অর্থ কি? কুসুমের কানে কানে মধুকরের যে গুঞ্জন, কমলকোরকের সুপ্ত পাপড়িতে সূর্যালোকের যে জাগরণমন্ত্র, তাই কি ভালবাসা? লজ্জাবতীর মত স্পর্শকাতর, সূর্যমুখীর মত উন্মুখ, আলোকের মত স্বচ্ছ, অন্ধকারের মত নিবিড় কি এ? সহসা তার মনে হল, অন্তরাকে ভালবেসে কি অন্যায় করেছি, অবনত করেছি নিজেকে? যে ভালবাসাকে কোনদিন বিবাহের বন্ধনে বাঁধা যাবে না, যা অসামাজিক, অযৌক্তিক, অহেতুক...। অহেতুক? হঠাৎ মনে হল! অন্তরার সমস্ত মূর্তিটা উদ্ভাসিত হয়ে উঠল মানসপটে। ওই তন্বী স্বর্ণলতা, ওকে ভালবাসার হেতু নেই কোনও? অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল অংশুমান।... নিশীথ রজনীর তারাভরা আকাশ...দিগন্ত-বিস্তৃত পল্লীপ্রান্তরে ইন্দ্রধনুশোভিত ক্ষান্ত-বর্ষণ মেঘপুঞ্জ...বিশাল সাগরের অগণিত ঊর্মিশিখরে অনাবিল জ্যোৎস্না লাস্য-লীলা... ছবির পর ছবি জাগতে লাগল মনে।

সহসা মনে হল, সহসা যেন দেখতে পেল সে, দান্তে ছুটে চলেছে বিয়াত্রিচের পিছনে পিছনে নরক পর্যন্ত। নরক...? হ্যাঁ, নরকই তো। ভালবাসা কি মানুষকে নরকগামী করে? ভাবতে লাগল সে। আমি যা ভোগ করছি এও তো নরক-যন্ত্রণা! অন্তরার জন্যেই তো কারাবরণ করেছি। অন্তরার চক্ষে নিজেকে বীর প্রতিপন্ন করবার জন্যেই তো ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম এই পাশবিক ঘূর্ণাবর্তে। তার কাছে আস্ফালন করেছিলাম নিজের পৌরুষ-মর্যাদা, সমস্ত ভবিষ্যৎ ভাসিয়ে দিয়ে। প্রদীপ্ত মুগ্ধ দৃষ্টিতে সে দেখেছিল। কোন মন্তব্য করেনি, কোন উৎসাহ দেয়নি, কিন্তু তার মুগ্ধ দৃষ্টি থেকে যা ক্ষরিত হচ্ছিল তাই যথেষ্ট ছিল আমার পক্ষে। তাকে খুশি করবার জন্যে, তার হৃদয় হরণ করবার জন্যেই জীবনমরণ তুচ্ছ করে মেতে উঠেছিলাম আমি। তার স্মিত হাসি, মৌন জয়ধ্বনি পুরস্কৃত করেছিল আমাকে। ধন্য হয়েছিলাম... কিন্তু তার পরিণাম কি নরকযন্ত্রণা ভোগ করা? এই অন্ধকার ঘরটায় একা কাটাতে হবে দিনের পর দিন, কতদিন কে

জানে। পরক্ষণেই মনে হল, ওই বিয়াত্রিচের প্রেমই দান্তেকে স্বর্গেও নিয়ে গিয়েছিল শেষে।...রুমঝুম রুমঝুম রুমঝুম...মধুর নূপুররবে অন্ধকার ছন্দিত হয়ে উঠল সহসা।

কে?

আমি বেহুলা। দেবসভায় নৃত্য করছি মৃত স্বামীর গলিত দেহে প্রাণ-সঞ্চার করবার জন্যে।

সব থেমে গেল আবার। স্তব্ধ হয়ে বসে রইল অংশুমান। অনেকক্ষণ বসে রইল। যখন সচেতন হল, তখন তার সমস্ত চিত্ত পরিপূর্ণ। অন্তরা...অন্তরা... অন্তরা...। পরিপূর্ণ চিত্ত-সাগরের প্রত্যেক ঊর্মিটিই অন্তরা, কিন্তু সাগরের অন্তস্তলে স্রোত বইছে। প্রশ্নের, সন্দেহের। অর্থ কি এ ভালোবাসার? বহুর মধ্যে এককে, নির্বিশেষের মধ্যে বিশেষকে এমনভাবে আবিষ্কার করলাম কেন? অন্তরার মধ্যে যে এত মাধুর্য আছে, তা আমার চোখেই ধরা পড়ল কোন্ মন্ত্রে? অর্থ কি এ আবিষ্কারের...

আবিষ্কারের অর্থ বড় রহস্যময়।

ঘাড় ফিরিয়ে অংশুমান দেখলে, অন্ধকার আলোকিত হয়েছে খানিকটা। একটি মুখ ফুটে উঠেছে তার মধ্যে। গোঁফদাড়ি নেই। অতিশয় শুচিস্নিগ্ধ মুখচ্ছবি। চোখাচোখি হতেই সুমিষ্ট হাসি হেসে বললেন, আমি অরস্টেড। তার পর চুপ করে রইলেন।

নীরবতা ঘনিয়ে এল চতুর্দিকে। অরস্টেডের দৃষ্টি থেকে একটা নীরব সান্ত্বনা ক্ষরিত হচ্ছিল যেন। মনে হচ্ছিল, একটু যেন অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছিলেন তিনি। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের নির্মম পেষণে এই যে লক্ষ লক্ষ লোক মরছে, এর জন্যে তিনিই যেন দায়ী, এমনই একটা ভাব ফুটে উঠছিল তাঁর চোখের দৃষ্টিতে। অংশুমানের দিকে চেয়ে আর একটু হেসে বললেন, আবিষ্কারের কাহিনী বড় রহস্যময়। তার দায়িত্ব বা কৃতিত্ব কারও প্রাপ্য নয়। শিশু যখন আবিষ্কার করে যে, মাতৃস্তন্যে দুগ্ধ আছে, তখন তার কৃতিত্ব কতটুকু! আবিষ্কার করেই বা সে কি করে, কে বলে দেয় তাকে?

হাসিমুখে চেয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। তারপর একটু ইতস্তত করে বললেন, যে আবিষ্কারের জন্যে আমার এত নাম, তাতে আমার কৃতিত্ব যে কতটুকু তা তো জানই। আমার চোখে পড়েছিল। আমি লেকচার দিচ্ছিলাম, একটা কয়েলের ভিতর দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হচ্ছিল, কাছেই ছিল একটা ম্যাগনেটিক নিড্‌ল। হঠাৎ সেটা নড়ে উঠল, হঠাৎ আমার চোখে পড়ে গেল। প্রথমটা পড়েনি, কিন্তু যতবারই কয়েলের ভিতর দিয়ে কারেন্ট গেল, ততবারই নড়ল সেটা। কেউ যেন আমার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলে। বিজ্ঞান-জগতে যেটা যুগান্তকারী আবিষ্কার, সেটা একটা আকস্মিক ঘটনামাত্র। তার জন্যে আমি দায়ী হতে পারি না—না না কিছুতেই।

আর্তনাদ করে উঠলেন যেন, তার পর অদৃশ্য হয়ে গেলেন। আর্তনাদটা মনে মনে উপভোগ করলে অংশুমান। কিন্তু পরমুহূর্তেই মনে ঘনিয়ে এল বিষাদের ছায়া। তার আবিষ্কারটা তো আকস্মিক ঘটনামাত্র নয়। সে যেচে গিয়ে আলাপ করেছিল। অন্তরার চোখে মুখে কি যেন একটা ছিল। কিছুতেই নিজেকে সম্বরণ করতে পারেনি সে। যদিও তার সামনে একটা কথাও বলতে পারত না, কিন্তু দুর্নিবার আকর্ষণে যেতে হত তাকে প্রত্যহ। তার চোখে নিজেকে বৃহৎ প্রতিপন্ন করবার দুর্নিবার প্রলোভনেই সে...

বাজে চিন্তা করে অকারণ শক্তি ক্ষয় করছ।

এলেন আর একজন। একমাথা ঝাঁকড়া কটা চুল। চমৎকার চোখ দুটি। নাক তীক্ষ্ণ।

অকারণে শক্তি ক্ষয় করছ। তোমার প্রণয়িনীর জন্যে তুমি দেশের কাজে নামনি, ওটা বাজে কথা, স্রেফ বাজে কথা। দেশই তোমার বরাবর লক্ষ্য, প্রণয়িনীটা উপলক্ষ্য মাত্র। প্রণয়িনীই যদি তোমার লক্ষ্য হত, তা হলে তুমি পাঁচিল টপকাতে, ডেপুটি পোড়াতে যেতে না।

একটা চাপা হাসি উঁকি দিচ্ছিল চোখ দুটি থেকে, কিন্তু নিমেষে সেটাকে অবলুপ্ত করে ফুটে উঠল অনুযোগমিশ্রিত ভর্ৎসনা।

কক্ষনোও যেতে না। মানুষের জীবনের আসল লক্ষ্য কি অর্থাৎ কোন্ রাস্তায় গেলে তার আত্মা সত্যিই পরিতৃপ্ত হয়, তা প্রথমটা সে বুঝতে পারে না। লেখক ডাক্তার হয়, কবি ব্যবসা করতে যায়, দেশপ্রেমিক নারীপ্রেমে কিংবা যশের নেশায় মশগুল হয়ে পড়ে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাকে স্বখাতে ফিরে আসতে হয় বাজে বন্যাগুলো সরে গেলে। এই দেখ না, আমি সোল্জার হব বলে মেতেছিলাম...

একটু হেসে তারপর বললেন, না মেতে উপায়ও ছিল। সোল্জার হওয়াটাই তখনকার দিনে ফ্যাশান ছিল যে। ফ্যাশান জিনিসটা হাম-জ্বরের মত, ওর কবল এড়ানো শক্ত। কিন্তু পলিটেক্নিকের পরীক্ষায় পাস না করলে সেকালে সোল্জার হওয়া যেত না। সেই পরীক্ষা দিতে হলে অঙ্ক শিখতে হত। অঙ্ক নিয়ে মাতলাম। সেই যে মাতলাম, ব্যাস্। ওরা দেখলে আমাকে যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠানো বৃথা। পাঠালে অব্জার্ভেটরিতে। বিওর সঙ্গে ভাব হল। গ্যাসের রিফ্র্যাক্টিং প্রপার্টি নিয়ে পড়লাম। তার পর মেরিডিওনাল মেজার্মেণ্ট। পিরেনিজ পাহাড়ের চূড়ায় উঠে...তুমি তো সব জানই।

একটু চুপ করে আর একটু হেসে বললেন, না, জান না, নিদারুণ শীতে পিরেনিজ পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে যখন ভৌগোলিক সঙ্কেত করেছিলাম, তখন আমার কষ্ট হয়নি, আনন্দ হয়েছিল— আমার জীবনচরিতকার সে কথাটা লেখেনি। তার পর পাহাড় থেকে নামবার সঙ্গে সঙ্গে স্প্যানিয়ার্ডরা আমাকে স্পাই ভেবে যখন তাড়া করেছিল, তখনও আমার ভয় হয়নি, অদ্ভুত একটা আনন্দ হচ্ছিল, এমন কি বেল্ভার ক্যাস্লে পালিয়ে এসে সেই ভণ্ড পাদ্রিটার পাল্লায় পড়লাম যখন, যিনি আমাকে বিষ খাওয়াবার চেষ্টা করেছিলেন, তখনও আমার রাগ হয়নি, মজা লাগছিল। আমার মনের মধ্যে অফুরন্ত নির্ভীক যে আনন্দের ভাণ্ডার ছিল, সে খবর আমার জীবনচরিত থেকে পাওনি তুমি। ওইটে ছিল বলেই কাবু করতে পারেনি আমাকে। বিপদ তো কম হয়নি, সবই তো পড়েছ! পাদ্রির কাছ থেকে পালিয়ে পেয়ে গেলাম একখানা অ্যাল্জেরিয়ান জাহাজ, কিন্তু কিছুদূর যেতে না যেতেই পড়লাম আবার একদল স্প্যানিয়ার্ড জলদস্যুর হাতে। তারা আমাকে বন্দী করে নিয়ে এল স্পেনে। প্রথমে রাখলে একটা উইণ্ডমিলে, তার পর একটা জাহাজের খোলে, প্রায় তোমারই মত অবস্থা হয়েছিল। কিন্তু দমিনি। ওদেরই একজনের সঙ্গে ভাব করে ফেললাম। হ্যাঁ ওইটি চাই, দরকার হলে শত্রুপক্ষের সঙ্গেও ভাব করা চাই। শত্রুপক্ষের মধ্যেও ভাব করবার মত লোক পাওয়া যায় বইকি। আমি যে লোকটার সঙ্গে ভাব করেছিলাম, সে অতি চমৎকার লোক। এত চমৎকার যে, নিজের গাঁটের পয়সা খরচ করে আমায় ছাড়িয়ে নিলে, তার পর টিকিট করে তুলে দিলে একটা জাহাজে। কিন্তু কপাল ছিল মন্দ, ঝড় উঠল। আমাদের জাহাজকে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে গিয়ে হাজির করলে একেবারে আফ্রিকায়। সেখানে আবার স্প্যানিয়ার্ড। কিন্তু এবার ব্যাটারা নিজেদের মধ্যেই এমন মারামারি শুরু করে দিলে যে,

আমি পালাবার সুযোগ পেয়ে গেলাম। অনেক বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করে ছ মাস পরে দেশে ফিরি। এত কাণ্ড করেও কিন্তু সোলজার হলাম না, কিছুই হলাম না, শেষ পর্যন্ত আমাকে ইলেক্‌ট্রিসিটি আর ম্যাগনিটিজ্‌ম্‌ নিয়ে পড়তে হল। কয়েলের ভিতর দিয়ে কারেণ্ট গেলে ম্যাগ্‌নেটিক নিড্‌ল নড়ে উঠছে কেন—অরস্টেডের এই আবিষ্কার পেয়ে বসল আমাকে। যতক্ষণ না বার করলাম যে, কয়েলের ভিতর দিয়ে কারেণ্ট গেলে কয়েলটাই ম্যাগ্‌নেট হয়ে যায়, ততক্ষণ আমার শান্তি ছিল না। কিন্তু বার করবার পর কি আনন্দ! তাই ভাবছি, আনন্দটাই আসল জিনিস, ওটা না থাকলে কিছু হয় না। আমার কিন্তু সবচেয়ে বেশি আনন্দ হয়েছিল অরোরা বোরিয়ালিস আর ম্যাগ্‌নেটিক স্টর্মের সম্পর্ক আবিষ্কার করে, মানে, হল কি...

অংশুমান সবিস্ময়ে শুনছিল।

আপনি কি আরোগা?

প্রশ্ন শুনে থমকে গেলেন আরোগা। পর মুহূর্তেই চটে গেলেন কথায় বাধা পড়াতে।--আমি কে তা নিয়ে কি দরকার, যা বলছি শোন না। আনন্দটিই আসল জিনিস, ওইটে না থাকলে তলিয়ে যাবে। তুমি ওই যে একটা থিয়োরি খাড়া করে মন গুমরে বসে আছ যে, অন্তরার জন্যেই এত কাণ্ড করেছ, ওটা একদম বাজে কথা। যা তোমার আনন্দকে ম্লান করছে, জানবে তা বাজে জিনিস—বিষবৎ পরিত্যাগ করবে সেটা। তা ছাড়া সত্যিই ওটা বাজে কথা। অন্তরা হয়তো তোমাকে প্রেরণা যুগিয়েছে -আমি যেমন সোল্‌জার হতে চেয়েছিলাম; কিন্তু দেশই তোমার--

তুমি বড্ড বেশি বকবক করছ। ঘুমুতে দাও না বেচারীকে একটু।--আর একজন এসে দাঁড়ালেন আরোগার পাশে। প্রশস্ত ললাট, সামনের দিকে টাক থাকাতে আরও প্রশস্ত দেখাচ্ছে। মাথার পিছনে ছোট ছোট কাঁচা-পাকা চুল। কাটা কাটা নাক মুখ চোখ। বলিষ্ঠ চেহারা। কিন্তু সমস্ত মুখে বিনীত ভদ্রতা যেন মাখানো।

ঘুমুবে? এর মধ্যেই? এই তো সবে দশটা বেজেছে। অংশুমানের দিকে চেয়ে আরোগা প্রশ্ন করলেন, এঁকে চেনো? তার পর নিজেই উত্তর দিলেন, ইনি স্টার্জন। হ্যাঁ, সেই মুচির ছেলে। এঁরই বাপ কেবল মাছ ধরে আর পাখি শিকার করে বেড়াতেন, তাও চুরি করে। পোচিং! ইনিও আর্মিতে ঢুকে কুড়ি বছর কামান দেগেছিলেন। কিন্তু কিচ্ছু হয়নি। হল একদিন, বিরাট এক ঝড় উঠে। বজ্রের গর্জন শুনে আর বিদ্যুতের ঝলকানি দেখে তাক লেগে গেল ভদ্রলোকের। কামান দাগার অবসরে লুকিয়ে লুকিয়ে পড়াশোনা শুরু করতে হল। প্রথমে গ্রীক ল্যাটিন অঙ্ক, তার পর ইলেক্‌ট্রিসিটি ম্যাগ্‌নেটিজ্‌ম্‌। শেষ পর্যন্ত ইলেক্‌ট্রো-ম্যাগ্‌নেট তৈরি করতে হল।

না না, আমি--

একটু অপ্রতিভ হয়ে পড়লেন স্টার্জন। তার পর সামলে নিয়ে বললেন, এস, চল যাই। ও ঘুমুক এখন—

এই কুনো স্বভাবের জন্যেই তুমি মরেছ। তোমার কীর্তিটা লোকে জানতে পারলে না ভাল করে। ওদিকে আমেরিকায় হেনরির জয়জয়কার। আচ্ছা, হেনরি কোথা গেল বল তো? তারও যে আসবার কথা ছিল! আসবে বোধ হয় এখুনি, দাঁড়াও না একটু, বেশ জমানো যাক সবাই মিলে।

না, চল, যাই আমরা।

হেনরির সামনে দাঁড়াতে লজ্জা করছে বুঝি? আমি বলছি, ইলেক্‌ট্রো-ম্যাগ্‌নেটের কীর্তি

তোমারই প্রাপ্য, হেনরির নয়। হেনরিও সে কথা স্বীকার করবে। তার সামনে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার অধিকার আছে তোমার, লজ্জা কি?

আরোগার চোখের দৃষ্টিতে চাপা কৌতুক ফুটে উঠল।

কি যে বলছ, লজ্জা কিসের। তা ছাড়া আমার প্রাপ্য তো আমি পেয়েছি।

কি পেয়েছ?

একটা রূপোর মেডেল। ইলেক্‌ট্রো-ম্যাগ্‌নেট তৈরি করে বিক্রিও করেছি অনেকগুলো। লেক্‌চারার হয়েছিলাম, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হয়েছিলাম, আবার কি চাই?

চোখ মুখ প্রদীপ্ত হয়ে উঠল হঠাৎ। যাঁকে লাজুক বলে মনে হচ্ছিল, দেখা গেল, তিনি বেশ সপ্রতিভ।

অংশুমান আর থাকতে পারলে না।

আচ্ছা, একটা কথা কি আপনাদের কখনও মনে হয়নি, নেগেটিভ ইলেক্‌ট্রিসিটি পজিটিভের দিকে যায় কেন?

যায় কেন? যায় বলেই যায়, যাওয়াই নিয়ম।—ভ্রূযুগল উত্তোলন করে আরোগা বললেন।

স্টার্জন ভ্রূকুঞ্চিত করে রইলেন।

কেন এমন নিয়ম হল?

আরোগা 'শ্রাগ' করলেন। তার পর স্টার্জনের দিকে ফিরে বললেন, তুমি ঠিকই ধরেছ, এর ঘুমোনো দরকার এখন।

অংশুমানকে বললেন, ঘুমোও তুমি। আর যে কথাটা বলতে এসেছিলাম, সেই কথাটা মনে রেখো,—দেশই তোমার আসল প্রেরণা, অন্তরা নয়। একটা বাজে চিন্তা করে মুষড়ে পড়বার দরকার নেই। চললাম। গুড্ নাইট্।

চলে গেলেন দুজনেই।

অংশুমানের ঘুম এল না। চোখ বুজে সে শুয়ে রইল চুপ করে। নীরবতা ঘনিয়ে এল আবার চতুর্দিকে। তার পর ধীরে ধীরে গুঞ্জনধ্বনি উঠল। স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হতে লাগল ক্রমশ।

"যাচ্ছি, যাচ্ছি.......তোমারই দিকে চলেছি অক্লান্ত গতিতে...সত্য পথে...সমস্ত বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করে...."

কে—কে তুমি?

চিৎকার করে উঠে বসল অংশুমান। কোন উত্তর এল না। হঠাৎ সে দেখতে পেলে, অসংখ্য উজ্জ্বল খদ্যোতপুঞ্জ উড়ে চলেছে অজানা অন্ধকারের দিকে অশ্রান্ত গতিতে তমিস্রাকে তুচ্ছ করে। বিস্মিত দৃষ্টিতে চেয়ে রইল খানিকক্ষণ। চলেছে অন্তহীন প্রবাহে জ্যোতির বুদ্বুদমালা। কে ওরা...কি ওরা...? চোখ বুজে শুয়ে পড়ল। চেষ্টা করতে লাগল ঘুমোবার। ঘুম কিন্তু এল না। বার বার মনে হতে লাগল, সত্যিই কি অন্তরা উপলক্ষ্য মাত্র, দেশই আসল লক্ষ্য....

দুইই এক।

অংশুমান চোখ খুলে দেখলে, আবার দুজন পাশাপাশি এসে দাঁড়িয়েছেন। দেখেই চিনতে পারলে, দুজনেরই ছবি অনেকক্ষণ ধরে দেখেছিল সে আজ সকালে। হেনরি আর ফ্যারাডে।

ফ্যারাডে হেসে বললেন, আমরা দুজনেই প্রমাণ করেছি যে, দুইই এক। ইলেকট্রিসিটি আর ম্যাগ্‌নেটিজিম্ একই জিনিসের এ-পিঠ ও-পিঠ। বিদ্যুৎপ্রবাহ লোহার তারকে যেমন চুম্বকে

পরিণত করে, চুম্বকও লোহার তারকে তেমনি বিদ্যুতায়িত করতে পারে। শুধু তাই নয়, এখন আমরা বুঝেছি, একই শক্তির বহু রূপ। বিদ্যুৎ, চুম্বক, আলো—একই শক্তির বিভিন্ন লীলা। ক্লোরিন গ্যাস যখন লিকুইড হল, তখনও তাই দেখলাম। তোমার প্রেমও তাই। অন্তরা আর দেশ যাকেই ভালোবাস, জিনিসটা এক। এটাও এনার্জির আর একটা রূপ বোধ হয়। হঠাৎ থেমে গেলেন ফ্যারাডে, ভ্রূকুঞ্চিত করে অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন, তার পর বললেন, আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে গতি—দ্রুত গতি, নিরবচ্ছিন্ন আবর্তন। চুম্বকের ক্ষেত্রে দ্রুতবেগে আবর্তিত হলে সামান্য ধাতুখণ্ডেও বিদ্যুৎতরঙ্গ বইবে। দ্রুতগামী বিদ্যুৎতরঙ্গের সমীপবর্তী হলে সামান্য লৌহখণ্ডও পরিণত হবে চুম্বকে। সামান্য কামারের ছেলে মাইকেল ফ্যারাডেও জীবনের ঘূর্ণাবর্তে দ্রুতবেগে আবর্তিত হতে হতে চুম্বক হয়ে উঠেছিল, তাই না তার টানে স্বয়ং সার্ হাম্‌ফ্রি ডেভি এসে হাজির হয়েছিলেন তার দ্বারে। হা-হা-হা-হা—

উচ্চকণ্ঠে হেসে অদৃশ্য হয়ে গেলেন ফ্যারাডে।

জোসেফ হেনরি দাঁড়িয়ে রইলেন নিস্পন্দ হয়ে। যেন অ্যাপোলো। ঋজু, বলিষ্ঠ, সৌম, শান্ত। চোখের দৃষ্টিতে প্রতিভাত হয়েছে মনীষা ও মাধুর্যের মিলন-মহিমা। স্মিতমুখে চেয়ে রইলেন তিনি অনেকক্ষণ অংশুমানের দিকে।

তার পর বললেন, ফ্যারাডে যা বললেন, তা ঠিক। গতিই আসল। চুম্বকের আবহাওয়ায় অবিরাম বিঘূর্ণিত না হলে বিদ্যুৎপ্রবাহ বইত না, আর তা না বইলে গড়ে উঠত না বর্তমান জগৎ। সবই ঠিক। কিন্তু এটাও মনে রাখা উচিত শুধু গতি নয়, গতিপথেরও বিশেষ মূল্য আছে একটা। একই বৈদ্যুতিক শক্তি সোজা তারে যতটা স্পার্ক দেয় তার চেয়ে ঢের বেশি দেয় তারটা কয়েল করে নিলে। তোমাদের পরাধীনতার মোচড় তেমন জোরালো হয়নি বোধ হয়, তাই জোরে স্পার্ক দিতে পারছ না....।

তাঁর গম্ভীর মুখ হাস্যস্নিগ্ধ হয়ে উঠল।

জোরালো হয়নি? এর চেয়ে আর কি হবে?—বলে উঠল অংশুমান।

তাহলে বোধ হয় লীক করছে কোনখান থেকে। লীক করলে জোর কমে যায়। স্টার্জনের ইলেক্‌ট্রো-ম্যাগ্‌নেট যে বেশি ভারী জিনিস তুলতে পারেনি, তার কারণ তারগুলো ইন্‌স্যুলেটেড ছিল না। আমি পাড়ার মেয়েদের খোসামোদ করে প্রত্যেক তারের গায়ে সিল্কের ওয়াড় পরিয়ে দিয়েছিলাম। আমার ম্যাগ্‌নেট তাই জোরালো হয়েছিল। তোমরা শক্তিকে সংহত করতে পারছ না বোধ হয়। বাজে বক্তৃতার অকারণ লম্ফঝম্পে অনেক শক্তি নষ্ট হচ্ছে সম্ভবত.....

কিসের শক্তি আপনি বলছেন?

ধর, প্রেমেরই। ও, কিন্তু আর একটা ব্যাপারও হতে পারে। একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন।

স্ক্রীনিং এফেক্‌ট্ হতে পারে। প্রাইমারি কয়েল আর সেকেণ্ডারি কয়েলের মাঝখানে যে-কোন একটা ধাতুর চাদর রাখলে কারেণ্টের জোর কমে যায়। অন্তরা আর তোমার মাঝখানে সমাজটা স্ক্রীনের কাজ করছে হয়তো, কিংবা হয়তো, তোমার দ্বিধা। সিমিলার্‌লি, দেশ আর তোমার মাঝখানে বিদেশী শাসন, কিংবা তোমাদের তামসিকতা, কিংবা সামথিং, ঠিক জানি না....এইগুলো অনুসন্ধান করা দরকার। আচ্ছা, ধর—না থাক্, রাত হয়েছে, ঘুমোও তুমি।

আচ্ছা, অন্তরাকে ভালোবেসেছি বলে দেশের প্রতি আমার একনিষ্ঠতা কি কমে যেতে পারে?—প্রশ্নটা না করে পারলে না অংশুমান।

তা কখনও যায় নাকি? এই আমারই বেলা দেখ না, আমি তো জীবনে একনিষ্ঠ হতে পারিনি। ছেলেবেলায় একনিষ্ঠ কবি ছিলাম, কাব্য নিয়ে উন্মত্ত হয়ে থাকতাম। সেকালের এমন কোন নভেল নাটক ছিল না, যা পড়িনি। শুধু নিজে পড়তাম না, আর পাঁচজনকে ডেকে পড়ে শোনাতাম। থিয়েটার করা একটা বাতিক ছিল। যেখানেই সৃষ্টির মহিমা দেখেছি, মন মেতে উঠেছে। গ্রেগারির বইখানাও যেই হাতে পড়ল, বিস্ময়ে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল মন। কল্পলোকের নূতন একটা দ্বার খুলে গেল যেন। কাব্য ভালো লাগত বলে বৈজ্ঞানিক হতে আমার আটকায়নি। বস্তুত বড় বৈজ্ঞানিক আর বড় কবিতে কোন তফাতই দেখতে পাই না আমি। অন্তরার প্রতি তোমার প্রেম দেশপ্রেমকে ম্লান করবে কেন? বিজ্ঞানের উপমা দিয়েই যদি বলি, বেশি তার জড়ালে ইলেক্‌ট্রোম্যাগ্‌নেটের শক্তি যদি বাড়ে—দেশের বেশি লোককে ভালোবাসলে দেশপ্রেমই বা বাড়বে না কেন? দেশ মানে—দেশের মাটি নয়, দেশের মানুষ। দেশের মানুষকে ভালোবাসি বলেই দেশের মাটি ফুল ফল কীট পতঙ্গ পর্যন্ত প্রিয় হয়ে ওঠে,—মানুষের সঙ্গে মানুষের যোগ তো ভালবাসা দিয়েই হয়। সেই যোগসূত্র দিয়েই তুমি তোমার আদর্শ, তোমার আবেগ সুপ্রসারিত করতে পারি নিত্য নূতন লোককে ভালবেসে। যত বেশি লোককে ভালবাসবে, তত বেশি জোর পাবে। আর একটা বৈজ্ঞানিক উপমা মনে পড়ছে। অ্যাম্‌পিয়রই প্রথমে ভেবেছিল যে, বিদ্যুৎতের তরঙ্গযোগে দূরে খবর পাঠানো সম্ভব। চেষ্টাও করেছিল। কিন্তু হল না, তার তরঙ্গের জোর ছিল না বলে। বার্লো দেখিয়ে দিলে যে, দু'শো ফিটের বেশি যাবার শক্তি নেই তার। আমি কিন্তু আমার ইন্‌টেন্‌সিটি ব্যাটারি আর ইন্‌টেন্‌সিটি ম্যাগ্‌নেট দিয়ে এক মাইলের বেশি দূর পর্যন্ত কারেণ্ট নিয়ে গিয়েছিলাম। এক মাইল দূরে গিয়ে আমার কারেণ্ট ম্যাগ্‌নেটিক নিড্‌লটিকে ঘুরিয়ে ঠিক ঘণ্টা বাজিয়ে দিয়েছিল।

কৃতিত্বের আনন্দে চোখের দৃষ্টি উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

তা হলে প্রেমের একনিষ্ঠতা বলে আপনি কিছু মানেন না?

মানি বইকি। কাব্য পড়েছি, প্রেমের একনিষ্ঠতা মানি না? কিন্তু আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে, শক্তি শুধু প্রেম নয়। একটি খাবারের প্রতি তুমি যদি একনিষ্ঠ থাকতে পার, তার জন্যে বাহবা অবশ্যই তোমার প্রাপ্য। কিন্তু একাধিক খাবার খেয়ে হজম করতে পারলে একনিষ্ঠতা থাকবে না বটে, কিন্তু শক্তি বাড়বে। তা ছাড়া প্রথম জীবনে মানসিক একনিষ্ঠতার অর্থ আছে নাকি কোন? যতটা পার, যেখান থেকে পার, আহরণ করে যাও। সমস্ত পরিপাক করে প্রাণবন্ত জীবনীশক্তির সংহত একনিষ্ঠতা পরে হবে। আমি প্রথম জীবনে কাব্য নিয়ে ছিলাম, তারপর বিজ্ঞান। বিজ্ঞান-জগতেও এক রাস্তায় চলিনি। ইলেকট্রিসিটি নিয়ে ছিলাম অনেকদিন। তার পর আবিষ্কার করলাম থার্মো-টেলিস্কোপ। সূর্যের গায়ে যে কালো কালো স্পট আছে, তাদের টেম্পারেচার কত—তাই নিয়ে কাটল কিছুদিন। তার পর কোহিশন অব লিকুইড্‌স, ফস্‌ফরেসন্‌স্‌, শব্দ-বিজ্ঞান—কত কি করেছি, এখনও করছি, কিন্তু লাভ ছাড়া ক্ষতি হয়েছে বলে তো মনে হয় না। না না, ওসব ভুল ভাবছ, অন্তরা তোমার দেশপ্রেমের ক্ষতি করতে পারবে না। ঘুমোও, অনেক রাত হয়েছে, চললাম...

মিলিয়ে গেলেন।

অংশুমানের মনের সমস্ত গ্লানি অপসারিত হয়ে গেল। অন্তরার ভালোবাসাটা কাঁটার মত

বিঁধে ছিল মনে। দেখতে দেখতে ফুল হয়ে ফুটে উঠল সেটা। চোখ বুজে সে স্বপ্ন দেখতে লাগল, অন্তরাই যেন দেশ-মাতৃকা।

"যাচ্ছি—যাচ্ছি—তোমারই কাছে...."

ধীরে ধীরে গুঞ্জন উঠল আবার।

।। ছয়।।

ছোট বড় স্তূপ স্তর, নানাবিধ মেঘপুঞ্জ নিঃশব্দ মন্থর গতিতে একত্রিত হয়েছে পূর্বদিগন্তে। রাত্রি দ্বিপ্রহর। চতুর্দিকে স্তব্ধ। চক্রবালরেখা-সংলগ্ন বৃক্ষশ্রেণী স্তম্ভিত হয়ে আছে। দূর থেকে মনে হচ্ছে, কালকালিন্দীর কৃষ্ণতরঙ্গমালা মূর্ত হয়ে গেছে যেন সহসা অদ্ভুত কোন মন্ত্রবলে। বেতসবনে অস্ফুট মর্মরধ্বনি উঠছে একটা। অন্ধকার অন্তরের অব্যক্ত বেদনা মূর্ত হতে চাইছে যেন সে অস্পষ্টতায়। কিসের প্রত্যাশায় প্রতীক্ষা করছে সব? সারি সারি বাদুড় উড়ে চলেছে। বর্ষা-স্নাত বনানীর বন্য-মদির গন্ধে অন্ধকার ভারাক্রান্ত। ঝিল্লী ডাকছে না। সমস্ত নিঃশব্দ। সেই নিঃশব্দতার পটভূমিকায় অস্ফুট মর্মরধ্বনির সূক্ষ্মজাল সূক্ষ্মতর হচ্ছে ক্রমশ অন্ধকারের নিবিড়তায়। কি যেন একটা আসন্ন! সাগ্রহে প্রতীক্ষা করছে সবাই। সহসা মেঘের কোনে কোলে লাগল জরির পাড়, বৃক্ষশ্রেণীর শিখরে শিখরে জাগল জ্যোতির আভাস, ঝিল্লীর কণ্ঠে ফুটল ভাষা, আকুল হয়ে উঠল বনমর্মর।

চাঁদ উঠল। চিরকাল যেমন ওঠে।

।। সাত।।

সি. আই. ডি. দারোগা আবার এলেন।

আর বোধ হয় আপনাকে বাঁচাতে পারলাম না মশাই।

অংশুমান রোজ যেমন থাকে, আজও তেমনই চুপ করে রইল।

আপনি চুপ করে আছেন, কিন্তু আর কেউ চুপ করে নেই। সবাই আপনার নাম বলছে।

আড়চোখে চাইলেন একবার অংশুমানের দিকে, তারপর পানের ডিবে বার করে চার-পাঁচ খিলি পান কুপকুপ করে খেয়ে ফেললেন।

আসুন!

আমি তো খাই না জানেন।

আরে, নিন না মশাই, এক খিলি খেয়েই দেখুন না। চমৎকার মিঠে পান, খাসা লাগবে। নিন, লোকে অনুরোধে ঢেঁকি গেলে, আপনি এক খিলি পান খেতে পারছেন না?

অংশুমান চুপ করে রইল।

আচ্ছা, পান না নিলেন, আসল কথাটা বলে ফেলুন দিকি। আমার কথাটা শুনুন, যা জানেন বলে ফেলুন সব। বলে ফেলাটাই বুদ্ধিমানের কাজ, কারণ ঢেকে রাখতে পারবেন না তো কিছু। আপনার বন্ধুরাই বলে দেবে সব। দিচ্ছেও। ধরাও পড়েছে অনেকে।

অংশুমান নীরব।

বলবেন না কিছু?

বলছি তো, আমি কিচ্ছু জানি না।

দারোগা সাহেবের ধৈর্যচ্যুতি ঘটল এবার একটু।

আপনি মনে করছেন, আপনি খুব দেশের কাজ করছেন। কিন্তু এর ফলে কি হবে জানেন? দেশই আপনার উচ্ছন্ন যাবে। গভর্মেন্টের সঙ্গে বেশি চালাকি চলে না। রেল-লাইন উপড়ে, টেলিগ্রাফের তার কেটে, পোস্ট-অফিস পুড়িয়ে, কতক্ষণ জব্দ করবেন আপনি গভর্মেন্টকে, যখন তাদের হাতে হাজার হাজার এরোপ্লেন আর বোমা রয়েছে? মেরে ধুনে দেবে সব। অতও করতে হবে না, চাবুকের চোটেই সিধে হয়ে যাবে। প্রতি গ্রাম থেকে পিউনিটিভ ট্যাক্স আদায় হচ্ছে, গোরা সোল্‌জার দেখেই পেচ্ছাপ করে ফেলছে অধিকাংশ লোক, আপামর ভদ্র হুমড়ি খেয়ে এসে পড়ছে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের পায়ের তলায়। তার পর কন্‌ট্রোলের যে রকম ব্যবস্থা হচ্ছে শুনলাম তাতে একটি লোক খেতে পাবে না, পরতে পাবে না, প্রয়োজনীয় কোন জিনিস পাবে না আর। এক মুঠো চালের জন্যে, এক টুকরো কাপড়ের জন্যে হন্যে কুকুরের মত ঘুরে বেড়াতে হবে সবাইকে এই গভর্মেন্টেরই দ্বারে দ্বারে। আর এসব কেন হবে, জানেন? আপনাদের মত ত্যাঁদড় লোকেদের একগুঁয়েমির জন্যে। আপনাদের কি করে শায়েস্তা করতে হয় তা গভর্মেন্ট জানে, মাঝ থেকে কতকগুলো নিরীহ লোক মারা যাবে।

উঠে গিয়ে একবার পিক ফেললেন। তারপর অপেক্ষাকৃত কোমলকণ্ঠে বললেন, তার চেয়ে বলে ফেলুন যে, হীট অব দি মোমেন্টে করে ফেলেছিলাম, মাথার ঠিক ছিল না, আমরা সামলে সুমলে নেব সব। ছাড়া পেয়ে যাবেন। সদ্‌বুদ্ধিটা নিন দয়া করে।

আর এক খিলি পান খেলেন।

অংশুমান নীরব।

যা জানেন, অকপটে বলে ফেলুন সব। কেন কচলাচ্ছেন মিছে?

আমি কিচ্ছু জানি না।

আচ্ছা লোক আপনি মশায়! ধন্য! ঢের ঢের লোক দেখেছি, কিন্তু আপনার মত এমনটি আর দেখিনি। মিছিমিছি কত লোককে কষ্ট দিচ্ছেন বলুন তো! আপনার বুড়ো বাবাকে পর্যন্ত ধরে নিয়ে গেছে, জানেন? মারধোর পর্যন্ত করছে নাকি।

অংশুমান চমকে উঠল।

বাবাকে ধরবার মানে?

মানে আপনিই!

আর একটু থেমে হেসে বললেন, আর আপনিই এর প্রতিকার করতে পারেন। সত্যি কথাটা বলতে দোষ কি?

অংশুমান নীরব। বাবার শীর্ণ মুখখানা চোখের উপর ভাসছিল তার। সত্যিই নিরীহ লোক। সারাজীবন কেরানীগিরি করে সসঙ্কোচে কাটিয়েছেন। চারটে মেয়ের বিয়ে দিতে আর অংশুমানকে পড়াতেই যথাসর্বস্ব গেছে। ধার হয়েছে কিছু। আশা ছিল, অংশুমান এম. এস-সি পাস করে সংসারের দুঃখ ঘোচাবে। এম. এস-সি সে পাস করেছে। কিন্তু সংসারের দুঃখ ঘুচল কি?

কি ঠিক করলেন?

বলেছি তো, আমি কিছু জানি না।

উঃ, সাংঘাতিক লোক আপনি! ডেন্‌জারাস। নিজেই কষ্ট পাবেন। আচ্ছা, এখন উঠি তবে। আবার আসব। সহজে হাল ছাড়বার লোক আমি নই। ভেবে দেখুন, ভেবে দেখুন, ভালো করে ভেবে দেখুন। সংসারটাকে এমন করে ডুবিয়ে দেবেন না, বুঝলেন, ভেবে দেখুন।

চলে গেলেন।

নিস্তব্ধ হয়ে বসে রইল অংশুমান।

।। আট।।

কখনও ফুলের উপর বসছে, কখনও পাতার উপর, কখনও বেড়ার শুকনো কঞ্চির ডগায়। বসেই উড়ছে আবার। চঞ্চল একদল প্রজাপতি। এক মুহূর্ত স্থির নয়, পাগলের মত উড়ে বেড়াচ্ছে খালি। নানা রঙের। সূর্যালোকের রঙগুলো হঠাৎ যেন স্বাতন্ত্র্য-লাভ করেছে এই নির্জন প্রান্তরে। স্পর্শ করে বেড়াচ্ছে সবকিছু মনের আনন্দে। শিয়ালকাঁটার কণ্টকপল্লবকে মহিমান্বিত করে সোনার বরণ যে ফুলগুলি ফুটেছে, তারা যেন উপভোগ করছে খামখেয়ালী প্রজাপতিদের এই হুড়োহুড়ি। অপরূপ হাসি ফুটেছে তাদের মুখে। কুহু-কুহু কুহু-কুহু কলকণ্ঠে বাহবা দিয়ে উঠল যেন কোকিলটা। বসছে উড়ছে, বসছে উড়ছে—বিরাম নেই, ক্লান্তি নেই। বিচিত্রপক্ষ কতকগুলো খেয়াল মাতামাতি করে বেড়াচ্ছে দুপুরের রোদে।....

চিরকালই করে।

।। নয়।।

অন্ধকার।

অসংখ্য ক্ষুধিত পীড়িত অশিক্ষিত স্বার্থপর ধূর্ত মিথ্যাচারী বিশ্বাসঘাতক বিলাস-লোলুপ কামনা-ক্লিষ্ট আতুর জনতা....হিমালয় থেকে কুমারিকা, গুজরাট থেকে আসাম....কোথাও বাদ নেই। অথচ সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা এই দেশ, রামায়ণ মহাভারত জাতক গীতা এই দেশেরই কাব্য, মহত্ত্বই এ দেশের মেরুদণ্ড, পরার্থপরতাই জীবন-মন্ত্র। সেই দেশের এ কি দুর্দশা! আকাশচারী বিহঙ্গম আফিঙের নেশায় অভিভূত, পিঞ্জর-বন্দনা করছে মধুরকণ্ঠে। নাদিরশাহ তৈমুরলঙ্গ বহু ভারতবাসীকে হত্যা করেছিল, বহু বিদেশী দস্যু বহুবার লুণ্ঠন করে গেছে ভারতকে, কিন্তু এমন নিঃস্ব আমরা কখনও হইনি। আজ আমাদের মনুষ্যত্ব নেই, আদর্শ লাঞ্ছিত, বিবেক মোহগ্রস্ত। যে পদাঘাতে আমাদের সমস্ত চূর্ণবিচূর্ণ হয়েছে, সেই পদই লেহন করে চলেছি সগৌরবে। ওই দারোগাটাও আমাদের দেশের লোক।....

উত্তপ্ত মস্তিষ্কে উঠে বসল অংশুমান। মনে হল, যেন দমবন্ধ হয়ে আসছে। বাবার মুখটা মনে পড়ল আবার। মারধোর করছে? ওই নিরীহ বৃদ্ধকে মারতে হাত উঠছে কার? আমাদেরই দেশের লোকের, আবার কার? পাঞ্জাবে জালিয়ানওয়ালাবাগ হয়েছিল, কিন্তু পাঞ্জাবীরাই সবচেয়ে বেশি রাজভক্ত। বাংলাদেশ শ্মশান হয়ে গেল, কিন্তু বাঙালীরই গোয়েন্দাগিরিতে আজও সবচেয়ে বেশি দক্ষ। ঘরে ঘরে বিশ্বাসঘাতক, কাউকে বিশ্বাস নেই। না, কাউকে না। কিন্তু সত্যি কি

কোনও উপায় নেই? আছে, নিশ্চয় আছে। কোথায় ত্রাণকর্তা, কোথায় তুমি?—আর্তনাদ করে উঠল অংশুমান।

ধীরে ধীরে কারা-প্রাচীরে মূর্ত হয়ে উঠল এক অশ্বারোহী মূর্তি ; কৃপাণধারী দিব্যকান্তি পুরুষ। অশ্বটি বড় জীর্ণশীর্ণ। কৃপাণটিও মরচেধরা। প্রশান্ত দৃষ্টি মেলে তিনি চেয়ে রইলেন অংশুমানের দিকে। প্রত্যাশাভরা প্রদীপ্ত দৃষ্টি। অংশুমানের সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। স্তব্ধ হয়ে বসে রইল সে। মুখে ভাষা ফুটল অনেকক্ষণ পরে।

আপনি কে?

আমি? চিনতে পারছ না?

অংশুমান চেনবার চেষ্টা করলে, কিন্তু পারলে না। অথচ অচেনাও নয়, কোথায় যেন.....

তোমাদেরই সৃষ্টি আমি। যুগে যুগে তোমরাই সৃষ্টি করেছ আমাকে নানা রূপে। ....তোমাদের সৃজনীশক্তির মধ্যেই আমার অস্তিত্ব অমরত্ব লাভ করেছে কূর্ম মৎস্য বরাহ অবতারে। নৃসিংহরূপে আমিই হিরণ্যকশিপুকে ধ্বংস করেছি, বলির গর্ব আমিই চূর্ণ করেছি একদিন, অত্যাচারী ক্ষত্রিয়কুলকে আমারই পরশু নির্মূল করেছিল, দশমুণ্ড রাবণকে আমিই সংহার করেছি একদা, কুরুক্ষেত্র প্রকম্পিত হয়েছিল একদা আমারই পাঞ্চজন্য-নির্ঘোষে, কংস-জরাসন্ধকে আমিই বধ করেছি, আবার অহিংসার বাণী আমিই প্রচার করেছি বুদ্ধরূপে। আমারই চিরন্তন আশ্বাসবাণী মূর্ত হয়েছে তোমাদের কবির রচনায়।—

পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।

কিন্তু তোমাদের পুরুষকারই আমাকে সম্ভব করে। আমি আজও তোমাদের কাছে কল্পনামাত্র, তাই আমার অশ্ব জীর্ণশীর্ণ, কৃপাণ তীক্ষ্ণতাহীন।

অংশুমান সবিস্ময়ে চেয়ে রইল অশ্বটির দিকে। সত্যিই বড় রুগ্ন। তার মনের কথা টের পেয়ে সেই দিব্যকান্তি পুরুষ আবার বললেন, আমার অশ্ব রুগ্ন নয়, ক্ষুধিত। সামান্য ভূমির শস্যে এর পুষ্টি হয় না।

কোন্ ভূমির শস্য চাই তা হলে?

তাজা প্রাণের রক্ত যে ভূমিতে সার সিঞ্চন করেছে, সেই ভূমির শস্য চাই এই দেবদত্ত অশ্বকে সঞ্জীবিত রাখার জন্যে। বিদেশীর চর্বিত নানা ইজম গলাধঃকরণ করে যে পুরীষ তোমরা সৃষ্টি করছ, তাও একপ্রকার সার বটে, কিন্তু সে সারে উৎপন্ন ফসল আমার অশ্ব স্পর্শ করে না, তাই সে দুর্বল। আমার কৃপাণও তাই অতীক্ষ্ণ। ধৈর্যের কঠিন প্রস্তরে সবল হস্তে শাণ দিয়ে আমার হস্তে এ কৃপাণ তুলে দেবে যে, কোথায় সেই বীরপুরুষ? তাকেই অন্বেষণ করছি। তারই সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছি কারা থেকে কারান্তরে। আমি জানি কারাপ্রাচীরের অন্তরালেই তার তপস্যা,....বন্দিনী জননীর কোলে আমিও জন্মলাভ করেছিলাম একদিন এই কারাগারেই।

বলুন কে আপনি?

আমি তোমাদেরই অসমাপ্ত কল্কি অবতারের কল্পনা। মিলিয়ে গেলেন ধীরে ধীরে।

আবার অন্ধকার।.....

তোমাদেরই পুরুষকার আমাকে সম্ভব করে—ধীরে ধীরে এই কথাগুলো মূর্ত হয়ে

সকৌতুকে চেয়ে রইল যেন তার দিকে। কি রকম পুরুষকার চাই? জ্ঞান হয়ে থেকে একদিনও তো অলস হয়ে বসে থাকেনি সে। ভালো হব, বড় হব, দেশকে ভালো করব, বড় করব,—এই সাধনাই তো করছে অহরহ। তবু কিছু হবে না?

হবেই। নিশ্চয় হবে। সমস্ত জীবনকে ইন্ধন করেছ, আগুন জ্বলবে না, তা কি হতে পারে কখনও? জ্বলবেই।

সবিস্ময়ে অংশুমান চেয়ে রইল। নিজের দৃষ্টিকে বিশ্বাস করতে পারছে না। স্বয়ং বিবেকানন্দ সামনে দাঁড়িয়ে।

এক টুকরো চকমকির মধ্যেও আগুন প্রচ্ছন্ন থাকে; আঘাত করলেই তা ছিটকে বেরিয়ে আসে। আঘাত কর, আঘাত কর, ক্রমাগত আঘাত করে যাও, ব্যর্থতায় হতাশ হয়ো না।

সহসা অন্তর্ধান করলেন।

অন্ধকার হয়ে গেল আবার।

অংশুমানের সমস্ত চিত্ত পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। মনে হল বিবেকানন্দের এই বাণী নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে পথে পথে প্রচার করা উচিত তারস্বরে "আঘাত কর, আঘাত কর, ক্রমাগত আঘাত করে যাও, ব্যর্থতায় হতাশ হয়ো না।"

সহসা উঠে ছুটে বেরিয়ে যেতে গেল সে, বন্ধ দরজায় প্রত্যাহত হয়ে নতুন করে আবার মনে পড়ল যে, সে বন্দী। বন্দী! তা হলে? মনের মধ্যে যত কথা জমে উঠেছে, তা কি কোনদিন বলা হবে না কাউকে? এই চারটে দেওয়ালের মাঝখানে তা চাপা থেকে যাবে চিরকাল? সমস্ত ছাপিয়ে এই দুঃখটাই তার মনে বড় হয়ে উঠল, চাপা থেকে যাবে সব? যা ভাবলাম যা দেখলাম, যা শুনলাম, তা বাইরে আর প্রকাশ করতে পারব না হয়তো জীবনে। বাইরের সঙ্গে যোগসূত্র ছিন্ন হয়েছে চিরকালের মত।

"একটা কথা শুনলে বোধ হয় আশ্বস্ত হবে—যোগসূত্র কখনও ছিন্ন হয় না, ছিন্ন করা যায় না। আমরাই প্রথমে এর আভাস পেয়ে প্রমাণ করেছিলাম। তারপর আরও অনেকে করেছেন পরে আরও ভালোভাবে।"

অংশুমান দেখলে, সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছেন কয়েকজন। সকলেরই ছবি দেখেছিল, সকলকেই চিনতে পারল সে। ওয়াট্‌সন সাল্‌ভা, সোমেরিং, স্টিন্‌হীল, মর্স, লিণ্ডসে, হাইটন....। সবাই স্মিত দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন তার দিকে।

"আগে সকলের ধারণা ছিল যে, তার না থাকলে বুঝি বিদ্যুৎ এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় যেতে পারে না। আমরা কিন্তু হাতে-কলমে প্রমাণ করেছিলাম যে, মাটি এবং জলও বিদ্যুৎ-তরঙ্গ বহন করতে পারে। এরই জোরে টেলিগ্রাফ তৈরি করেছিলাম আমরা সেকালে। সফলও যে হয়েছিলাম, তা তো পড়েছ। তারের অভাবে বিদ্যুৎপ্রবাহের গতি যেমন আটকায় না, প্রচার করবার মত সত্যি যদি কোনও জোরালো বাণী থাকে তোমার, জেলের দেওয়ালও তা আটকাতে পারবে না। অদ্ভুত উপায়ে অদৃশ্য পথে তা উদ্দিষ্ট ব্যক্তির মনে গিয়ে পৌঁছবেই।"

একটু হেসে ওয়াট্‌সন চলে গেলেন। যাবার সময় হাইটনকে কনুই দিয়ে একটা ধাক্কা মেরে গেলেন। ভাবটা—তোমার বক্তব্যটা এইবার বলে ফেল। হাইটন এগিয়ে এসে একটু গলা-খাঁকারি দিয়ে বললেন, যখন অক্ষর সৃষ্টি হয়নি, তখনও মানুষ জ্ঞানের চর্চা করত। তাদের জ্ঞানের ধারা কি অবলুপ্ত হয়েছে? তোমাদের বেদ উপনিষদ বেঁচে রইল কি করে?

সাল্‌ভা বললেন, অন্তরা তোমার মনের কথা টের পেয়েছিল কি করে? মুখ ফুটে তাকে বলনি তো কোনদিন কিছু।

পেয়েছিল নাকি?—মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ল অংশুমানের।

সমস্বরে হেসে উঠলেন সবাই। তার পর চলে গেলেন সবাই একযোগে।

অন্ধকার....

বিনা-তারে বার্তা-বহনের আকাঙ্ক্ষা বৈজ্ঞানিকের মনে জেগেছিল তারের অযোগ্যতা দেখে। মানুষ দ্রুত সুনিশ্চিতভাবে বার্তা পাঠাতে চায়, অব্যাহত হবে তার গতি....তারের সে ক্ষমতা ছিল না।

মনে ছবির পর ছবি ফুটতে লাগল।

১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই অক্টোবর। রাত্রিকাল। মর্স নদীর ভিতর এক মাইল লম্বা মোটা একটা ইন্‌স্যুলেটেড তার ফেলেছেন এই প্রমাণ করবার জন্যে যে, জলের ভিতরও তারযোগে বিদ্যুৎপ্রবাহ পরিচালিত করা সম্ভব। রাত্রে তারটা জলে ফেলে এলেন, সকালে দেখাবেন সকলকে। পরদিন বিরাট জনতা সমবেত হয়েছে নদীর ধারে মর্সের এক্‌স্‌পেরিমেণ্ট দেখবার জন্যে। জলের ভিতর দিয়ে বিদ্যুৎতরঙ্গ আসবে! রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছে সবাই। বিদ্যুৎতরঙ্গ একবার একটু এল, তার পর আর এল না। হো-হো করে হেসে উঠল সবাই। যত সব আজগুবি কাণ্ড। এই পাগলটার পাল্লায় পড়ে সমস্ত সকালটাই মাটি। ঠাট্টায় বিদ্রূপে হাসিতে কলরবে পূর্ণ হয়ে উঠল চতুর্দিক। মুখ কালো করে বসে রইলেন মর্স যন্ত্রটার দিকে চেয়ে। কি হল? এল না কেন? হৈ-হৈ করতে করতে জনতা ছত্রভঙ্গ হল। মর্স বেরুলেন কারণ অনুসন্ধান করতে। কারণ পাওয়া গেল কিছুদূর গিয়েই। একটা নৌকো নঙ্গর তোলবার সময় তারটাকে টেনে তুলেছিল, তারপর সেটার আদি-অন্ত না পেয়ে তা থেকে প্রায় দুশো ফিট কেটে নিয়ে সরে পড়েছিল। মর্স ভাবলেন, এত বড় লম্বা তার জলের তলায় রাখলে এ রকম নানা দুর্ঘটনা অহরহই ঘটবে। সুতরাং তার চলবে না। জলকেই করতে হবে বৈদ্যুতিক বাণীর বাহক। মর্সের জীবন-কাহিনী মনে পড়ল অংশুমানের। কিছুতেই নিরস্ত হননি। প্রথম জীবনে হতে চেয়েছিলেন চিত্রকর। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ-সাদে-স্যাম্বের বন্ধু বিখ্যাত মার্কিন চিত্রশিল্পী অ্যাল্‌স্টনের শিষ্য ছিলেন তিনি। 'ডেথ অব হার্‌কিউলিস' ছবিখানা এঁকে নামও হয়েছিল। কিন্তু পেট ভরল না তাতে। 'দি জাজ্‌মেণ্ট অব জুপিটার' ছবিখানার ক্রেতাই জোটেনি এক বছর। সক্রিয় মন অলস হয়ে বসে থাকেনি। বিজ্ঞান-চর্চায় মেতে উঠলেন। নূতন ধরনের পাম্প করে ফেললেন একটা, মিনিটে ৩৬০ গ্যালন জল তুলতে পারে। পেটেণ্ট করলেন সেটা। পেট ভরল। তার পর আকৃষ্ট হলেন ইলেকট্রিসিটির দিকে। অবাক হয়ে গেলেন এর বিচিত্র সম্ভাবনায়। একবার এক জাহাজে আসতে আসতে একজন আরোহীর মুখে শুনলেন যে, যত দূরই হোক না কেন, বিদ্যুৎতরঙ্গ এক স্থান থেকে আর এক স্থানে নিমেষেই নীত হয়; তখনই তাঁর মনে হল, তাহলে এই তরঙ্গযোগে নিমেষের মধ্যে খবরই বা পাঠানো যাবে না কেন? সাঙ্কেতিক শব্দ সৃষ্টি করলেই যাবে। জাহাজেই তাঁর মাথায় এল ডট্‌ আর ড্যাশের কথা।....মর্সের টেলিগ্রাফিক কোড আজ বিশ্ববিখ্যাত। যিনি বিশ্ববিখ্যাত চিত্রকর হতে পারতেন, পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপে তাঁকে হতে হল বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক। মানুষ যা হতে চায়, তা হতে পারে না। অংশুমান আশ্বস্ত হল যেন একটু। মনের মধ্যে একটা সংশয় কাঁটার মত খচখচ করছিল। বারংবার মনে হচ্ছিল, সামান্য

কেরানীর ছেলে আমি, আমার কি উচিত ছিল না লেখাপড়া শেষ করে সংসারের ভার নেওয়া? বাবার বুকের রক্ত-জল-করা পয়সায় লেখাপড়া শিখেছি, কি প্রতিদান দিলাম তাঁকে? পুলিসের হাতে মার খাচ্ছেন আমার জন্যে?....পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপ?....হঠাৎ মর্সের মুখখানা ফুটে উঠল চোখের সামনে। মুখময় বলি রেখা, অধরে বিষণ্ণ হাসি।

হ্যাঁ, পারিপার্শ্বিক অবস্থায় চাপ। গাছের ফল যখন স্বপ্ন দেখে যে আকাশে উড়ে যাব, তখন মাধ্যাকর্ষণের কথাটা সে ভুলে যায়। এ ছাড়া তোমার অন্য গতি ছিল না।

মিলিয়ে গেল মুখখানা।

অংশুমানের মনে প্রশ্ন জাগছিল একটা। মাধ্যাকর্ষণের টানে যে ফল মাটিতে নেমে আসে, তার ভবিষ্যৎ সার্থক ওই মাটিতেই অঙ্কুরিত বীজের নব নব উন্মেষে। আমার এই অসমসাহসিকতার কি ভবিষ্যৎ আছে কোনও? এই স্বেচ্ছাবৃত কৃচ্ছ্রসাধন....। আবার ছবি ফুটে উঠল একটা। পিঠে কাপড়ের বোঝা, হাতে বই—চলছে বালক লিগুসে। গরিব চাষার ছেলে, তাঁতীর কাজ শিখছে। তাঁত বোনা শেখে, কাপড়ের বোঝা পিঠে করে দোকানে দিয়ে আসে। স্কুলের যাবার সঙ্গতি নেই। অধ্যয়নস্পৃহা কিন্তু প্রবল। পিঠে কাপড়ের বোঝা নিয়ে পথ চলতে চলতে বই পড়ছে...গ্রাম্য মেঠো পথ বেয়ে তন্ময় হয়ে চলেছে লিগুসে। কিছুতেই দমবে না। ছুটিতে কাজ করে ট্যুশনি করে কত কষ্টে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করলে বাইশ বছর বয়সে। শেষ করলে আর্ট কোর্স, তার পর থিয়োলজি পড়লে, তার পর বিজ্ঞান। কখনও থামেনি, দ্বিধাগ্রস্ত হয়নি....

লিগুসে সশরীরে এসে সামনে দাঁড়ালেন। চোখ-মুখ দেখে মনে হয় না যে, অতবড় বিদ্বান। সর্বদাই যেন ভীত সঙ্কুচিত হয়ে আছেন, যেন কিছু জানেন না। কথা বলতেও ইতস্তত করছেন, পাছে বেঁফাস কিছু বলে ফেলেন—এই ভয়। অংশুমানের দিকে চকিতে একবার চেয়ে দেখলেন, ঘন ঘন চোখের পাতা পড়ল কয়েকবার, তার পর একটু ইতস্তত করে বললেন, তোমার মত আমিও একদিন দ্বিধাগ্রস্ত হয়েছিলাম। দ্বিধা নয়, ত্রিধাই বলতে পার। ইলেকট্রিকসিটি নিয়ে নাড়াচাড়া করতে গিয়ে দেখলাম যে, এর তিনটে সম্ভাবনা আছে। প্রথম, এর শক্তি দিয়ে নানা রকম কাজ করানো সম্ভব—এ চাকা ঘোরাতে পারে, ভারী জিনিস তুলতে পারে। দ্বিতীয়, সংবাদ বহন করতে পারে। তৃতীয়, আলো দিতে পারে। আমি কোন্‌টা নিয়ে গবেষণা শুরু করব, তা ঠিক করতে পারিনি প্রথমে। অনেক ভেবেচিন্তে শেষে ঠিক করলাম—আলো। যে আলো হাওয়ায় নিববে না, ঝড়ে কাঁপবে না, তারই সন্ধান করতে হবে সকলের আগে। কেন আমার এ ইচ্ছে হয়েছিল জানি না। আলোক-প্রবণতা বোধ হয় মানব-মনের আদিমতম এবং আধুনিকতম বৈশিষ্ট্য....

চুপ করলেন কয়েক মুহূর্ত, চোখ-মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল একটু।

ডাণ্ডি জেলের কয়েদীদের পড়াতাম। অনেক কাল পড়িয়েছি। সেখানেও দেখেছি, মানুষের মন আলোর সন্ধান করছে কেবল। আমার একটি ছাত্র বেশ কৃতী হয়েছিল। তারও ঝোঁক হল আলোর দিকে। জ্যোতিষ্ক-বিদ্যায়। অন্ধকার জেলে বছরের পর বছর কাটিয়েছে যে, সে তন্ময় হয়ে গেল আকাশের সূর্যতারার স্বপ্নে।—এই বলে ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেলেন লিণ্ডসে।

আলো!

লক্ষ কোটি সূর্য-তারকা-বিদ্যুৎ-বিচ্ছুরিত এক মহাকাশ ধীরে ধীরে মূর্ত হয়ে উঠল অংশুমানের মানসদৃষ্টির সম্মুখে।

"আলোর অর্থ অন্ধকারও হতে পারে। অত্যুগ্র-আলোক-বিভ্রান্ত যে মন অন্ধকার-কামনায় আলো নিবিয়ে দিতে চাইছে, সেও এক হিসাবে আলোরই উপাসক। আলো মানে বিদ্রোহ.....। প্রকাণ্ড পাহাড়ের সর্বোচ্চ চূড়ায় দাঁড়িয়ে আমি যখন ঘুড়ি উড়িয়ে আকাশের বিদ্যুৎকে পৃথিবীর বিদ্যুতের সঙ্গে একসূত্রে বাঁধবার চেষ্টা করছিলাম, তখন আসলে আমি দূরত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করছিলাম। মানুষ বিদ্রোহী জীব...সে ওলটাতে চায় এবং ওলটাতে পারে।"

লুমিস এসে এই কথাগুলি বলে দাঁড়িয়ে রইলেন উদ্ধত ভঙ্গীতে একটা প্রত্যুত্তরের আশায়। অংশুমান কিছু বলবার পূর্বেই আবার বললেন, তুমিও পারবে। চিয়ার আপ্।— বলেই মিলিয়ে গেলেন।

।। দশ ।।

কমরেড মীনা দত্ত

সুচরিতাসু,

ভাই মীনু, এতদিন আমার চিঠি না পেয়ে আশ্চর্য হয়েছ হয়তো। অনেক আগেই আমার উত্তর দেওয়া উচিত ছিল, সময় করে উঠতে পারিনি। ঘণ্টা মিনিট যে সময়ের মাপকাঠি সে সময় আমার প্রচুর ছিল, আমি ডেপুটি-গৃহিণী, ছেলে-পিলে হয়নি, চাকর-বামুন আছে, স্বামী টুরে টুরে বেড়ান, সুতরাং সময় বলতে সাধারণত যা বোঝায়, তা আমার যথেষ্ট। সময় ছিল না মনের, যে মন তোমার চিঠির জবাব দেবে। আগস্ট-ডিস্টারবেন্সের তুমুল তুফানে সমস্ত মন এমন বিপর্যস্ত হয়েছিল যে, চুল বাঁধবার অবসর পর্যন্ত ছিল না। অথচ আমি প্রত্যক্ষভাবে ওতে যোগ দিইনি। ডেপুটি-গৃহিণীর ওসবে যোগ দেবার উপায় নেই। আমাদের প্রতিবেশী অংশুমানবাবুর সঙ্গে ভাসা-ভাসা আলাপ করেছি খালি সংযত ভাষায়, কিন্তু পরোক্ষলোকে আমার মন অলস হয়ে বসে থাকেনি। সে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লক্ষ্য করছিল, ওই অংশুমানবাবুরই কার্যকলাপ। মুগ্ধ হয়ে গেছি তার বীরত্ব দেখে, মনে মনে প্রণাম করেছি তাকে শতবার। এখন সে জেলে। সুতরাং তোমার চিঠির জবাব দেবার অবসর হয়েছে। অবসর পেলেও এর আগে এমন করে জবাব দিতে পারতাম না, কারণ জবাবটা নিজের কাছে এখন যতটা স্পষ্ট হয়েছে, আগে ততটা ছিল না। সুতরাং আশা করছি, তোমাকে বোঝাতে পারব।

তোমাদের দলে যতদিন ছিলাম, ততদিন বুঝিনি, এখন কিন্তু ভালো করে বুঝতে পারছি যে, আমার অন্তত কমিউনিস্ট হওয়ার প্রেরণা ছিল দেশ-প্রেম নয়, আত্ম-প্রেম। ক্যাপিটালিস্টদের ধ্বংস করার যে মুখস্থ বুলি আওড়াতাম, তা পরশ্রীকাতরতার তাড়নায়, প্রোলিটারিয়েটদের প্রতি বেদনা-বোধের তীব্রতায় নয়। 'মাদার রাশিয়া'তে যেসব আত্মত্যাগী যুবক-যুবতী কিশোর-কিশোরীর কথা পড়েছি, আমাদের মধ্যে তাদের মত যারা আছে (আছে নিশ্চয়ই, যদিও আমার চোখে পড়েনি), তারা কই আমাদের দলে যোগ দেয়নি তো। আমার বিশ্বাস, আজকাল এই যে দলে দলে ছেলে-মেয়েরা বিশেষ করে মেয়েরা, কমিউনিস্ট হচ্ছে, ওটা ফ্যাশানের খাতিরে, কমিউনিজমের প্রতি শ্রদ্ধাবশত ততটা নয়। এটা বর্তমান যুগের সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার একটা অনিবার্য ফল বলতে পার। আমাদের ঘরে ঘরে ছেলেরা বেকার, মেয়েরা অবিবাহিতা। অথচ

তারা বুলি কপচাতে শিখেছে। প্রকৃত শিক্ষা আমরা পাই না। আমরা ডিগ্রী লাভ করেই কুলীন। আচার বিনয় বিদ্যা প্রতিষ্ঠা প্রভৃতির তোয়াক্কা রাখি না। উদর-সর্বস্ব স্বার্থপর বণিক-সভ্যতার তথাকথিত বৈজ্ঞানিক চাকচিক্যে মুগ্ধ হয়ে আমরা তাদের কাছে আত্মবিক্রয় করে যে পাঠ নিয়েছি, তার মূলমন্ত্র স্বার্থপরতা। আমাদের ঘরে ঘরে বেকার ছেলে আর অবিবাহিতা মেয়ের দল এই শিক্ষা পেয়ে অসন্তুষ্টির তুষানলে দগ্ধ হচ্ছিল এতদিন। কারণ এই শিক্ষার ফলে বেচারাদের লোভ উদ্দীপ্ত হয়েছে যোল আনা, অথচ তা চরিতার্থ করবার কোন উপায় নেই। রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার গুণে ছেলেরা উপার্জন করতে পারে না, সমাজ-ব্যবস্থার গুণে মেয়েদের বর জোটে না। দুস্তর বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করে তবু যে-সব ছেলে উপার্জন করতে পেরেছে বা যে-সব মেয়ের বিয়ে হয়েছে, তাদের সৌভাগ্যে মনে মনে ঈর্ষান্বিত হওয়া ছাড়া অধিকাংশ বঞ্চিতদের অন্য কোন উপায় ছিল না এতদিন! বিদ্রোহী রাশিয়ার জ্বলন্ত দৃষ্টান্তে উৎসাহিত হয়ে এখন তারা সেই পরশ্রীকাতরতার গায়ে লেনিন-স্টালিনের বড় বড় নাম জুড়ে দিয়েছে। জোর-গলায় বলে বেড়াচ্ছে, যাদের তোমরা এতদিন বড়লোক বলে এসেছ, আমরা ধরে ফেলেছি, আসলে তারা ছোটলোক, তারা পুঁজিবাদী, এই দেখ কার্ল মার্কস্......

যে পরশ্রীকাতরতাটা প্রকাশ করতে আগে লোকে লজ্জিত হত, একটা বড় নামের মুখোশ পরে তা-ই ঢাক-ঢোল বাজিয়ে প্রচার করাটা গৌরবজনক হয়ে দাঁড়িয়েছে আজকাল। কিন্তু ভেবে দেখ, ধনীমাত্রেই পাজি, শ্রীসম্পন্ন ব্যক্তিমাত্রেই জুয়াচোর—এই নীতি প্রচার করা অন্য যে-কোন দেশের পক্ষে শোভন হোক, ভারতবর্ষের পক্ষে নয়। যে হিন্দুধর্ম ভারতবর্ষের গৌরব, পরমতসহিষ্ণুতা ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধা যে হিন্দুধর্মের বৈশিষ্ট্য, সেই ভারতবর্ষের ধনীমাত্রেই পাজী—এই মত প্রচার করতে যাওয়া কি লজ্জাকর! একটু যদি ভালো করে ভেবে দেখ, হিন্দুধর্মই প্রকৃত স্বাধীনতার ধর্ম। প্রকৃত সাম্যবোধ আত্মানুসন্ধী হিন্দুধর্মেই আছে, অন্য কোন ধর্মে নেই; কারণ সাম্যবোধ জিনিসটা আধ্যাত্মিক আধিভৌতিক, পশু-জগতে ওর স্থান নেই। হিন্দুধর্মই একমাত্র ধর্ম, যে প্রত্যেক নরনারীর ব্যক্তিগত আধ্যাত্মিক প্রেরণাকে শ্রদ্ধা করেছে, বেয়নেট উঁচিয়ে বলেনি—তুমি এই ইজ্‌মে বিশ্বাস করবে কি না, যদি না কর, তা হলে তোমার বাঁচবার অধিকার নেই। এই সাম্যবোধই হিন্দু-ভারতবর্ষকে আধিভৌতিক জগতে দুর্বল করেছে হয়তো, সে নির্বিচারে ভিন্নধর্মাবলম্বীকে হত্যা করতে পারেনি বলেই এদেশে এত ধর্ম-বৈচিত্র্য, এত মতানৈক্য। ভারতবর্ষের তথাকথিত রাজনৈতিক একতা নেই, কারণ ভারতবর্ষ আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে বহুর মধ্যে এককে প্রত্যক্ষ করবার চেষ্টা করেছে, এবং তা করতে গিয়ে আধিভৌতিক জগতে জাতিহিসাবে দুর্বল হয়ে পড়েছে, কারণ আধিভৌতিক জগৎটা পশুর জগৎ। মানুষ যেখানে পশু সেখানেই সে আধিভৌতিক জগতে বিচরণ করে, দেহের ক্ষুধা, পাশবিক বাসনা মেটাবার জন্যে মারামারি কাটাকাটি করে, সাম্য-অসাম্য নিয়ে মাথা ঘামায় না, প্রয়োজনের তাগিদে শক্তির শরণাপন্ন হয়, কেড়ে খায়, দুর্দিনের জন্য সঞ্চয় করে। তুমি হয়তো বলবে, আধিভৌতিক জগৎটাও তো আছে, ওটাকে তো অস্বীকার করলে চলবে না, বহু লোক দারিদ্র্যের চাপে মরে যাবে আর জনকতক ঐশ্বর্য ভোগ করবে—এ রকম সমাজব্যবস্থাই কি ভালো? কে বলছে, ভাল? আধিভৌতিক জগৎটা যে আছে, তা তো প্রতিমুহূর্তে অনুভব করছি, অস্বীকার করব কি করে? আমার আপত্তি ভণ্ডামিতে। ক্ষুধার আহার, কামনার ইন্ধন সন্ধান করে বেড়াচ্ছি যখন, তখন আবার সাম্যের মুখোশ কেন? বিদ্যুৎতালোকিত সুসজ্জিত ঘরে ফ্যানের তলায় বসে

চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে কিষাণদের দুঃখ, শ্রমিকদের কষ্ট নিয়ে অমুক দাদার সঙ্গে উত্তেজিত আলোচনার ছবিটা যে আধুনিক পরিবেশে দুষ্মন্ত-শকুন্তলারই সাবেক ছবি, তা অস্বীকার করে যে ভণ্ডামিটাকে আমরা প্রশ্রয় দিয়েছি তাতেই আমার আপত্তি। মাছের লোভে ছিপ ঘাড়ে করে টোপ নিয়ে মাছ ধরতে বেরিয়েছি, ওর মধ্যে আবার সাম্যের আস্ফালন কেন? দীনের দুঃখে সত্যিই যারা বিচলিত হয়, তারা অত স্বার্থপর হয় না, হতে পারে না। নিঃস্বার্থপর ত্যাগী কমিউনিস্ট যে নেই তা আমি বলছি না, অনেক আছে হয়তো, কিন্তু আমাদের দলটির যে ছবি দেখেছি তা শ্রদ্ধেয় সাম্যবাদীর ছবি নয়। কমিউনিজ্‌ম জিনিসটা যে খারাপ, তাও আমার বক্তব্য নয়। সাময়িক প্রয়োজনে যুগে যুগে ওর উদ্ভব হয়েছে নানা রূপে! বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও রাজনৈতিক পরিবেশ অনুসারে ওর চেহারাও হয়েছে নানা রকম। বঙ্গদেশে গোপালদেবের আমলে কিংবা আরও পূর্বে যে প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হয়েছিল, তার পরবর্তী যুগেও যে দীর্ঘকালব্যাপী কৈবর্ত-বিদ্রোহ হয়েছিল তা মূলত বিংশ শতাব্দীর রাশিয়ান বিদ্রোহেরই পূর্ব সংস্করণ। যা একটু তফাত তা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও রাজনৈতিক পরিবেশের বিভিন্নতার জন্য। কমিউনিজ্‌ম যে অতি আধুনিক অভূতপূর্ব একটা কিছু, তা মনে করবার কোনও কারণ নেই! মানবের ইতিহাসে এ জিনিস বার বার ঘটেছে ও ঘটবে। সুতরাং কেউ তোমাদের পার্টি পরিত্যাগ করলে বা তোমাদের কথায় সায় না দিলেই তোমরা তাকে প্রগতি-বিরোধী, সেকেলে, রিঅ্যাক্‌শনারি প্রভৃতি বিশেষণে লাঞ্ছিত কর, সেটা যুক্তিসহ আচরণ নয়। তা ছাড়া আর একটা কথাও তোমরা ভুলে যাও, সেকেলে হতেই বা দোষ কি, যখন মনুষ্যত্বের দিক দিয়ে একাল সেকালের চেয়ে এক পাও এগোয়নি।

আমাদের দেশের জনসাধারণের দুর্দশার সীমা নেই। সে দুর্দশা ঘোচাবার জন্যে যাঁরা জীবন পণ করেছেন, তাঁরা পূজনীয়; কিন্তু তোমাদের চেষ্টা, কি করে তাঁদের খেলো করবে, কোন্ আধুনিক মুখস্থ-করা ফরমুলায় ফেলে তাঁদের কর্মপদ্ধতির দোষ বার করবে। স্বাধীনতা-অপহারক বিদেশী রাজাই আমাদের দুর্দশার কারণ। সেই বিদেশী রাজা স্বদেশে বিদেশে আমাদের নামে রটিয়ে বেড়াচ্ছে যে মিথ্যে কথা, তোমরাও তাতে সায় দিয়ে চলেছ ক্রমাগত। তোমরাও বলছ যে, হিন্দু-মুসলমান মিলন হচ্ছে না বলেই আমরা স্বাধীনতা পাবার উপযুক্ত নই; তোমরাও বলছ যে, অখণ্ড ভারতকে স্বাধীনতা দিলে অন্যায় করা হবে, পাকিস্তানই এর একমাত্র সমাধান। তোমরাও বুঝতে চাইছ না যে, হিন্দু-মুসলমান কেন, ইচ্ছা করলে রাজশক্তি পিতা-পুত্র স্বামী-স্ত্রীতে মনোমালিন্য ঘটিয়ে দিতে পারে অনুগ্রহ-নিগ্রহের মাত্রা বাড়িয়ে কমিয়ে। তোমরা 'ফুড ফ্রণ্ট' করে এদেশের পুঁজিবাদীদের নাস্তানাবুদ করেছ, কিন্তু আসল পুঁজিবাদীর রোমটি পর্যন্ত স্পর্শ করনি। ভারতবর্ষে যে বিদ্রোহ করবার জন্যে তোমরা একদা উৎকণ্ঠিত ছিলে, সেই বিদ্রোহ যখন সত্যি সত্যি হল, তখন তোমরা শুধু সরেই দাঁড়ালে না, তার বিরুদ্ধাচরণও করতে লাগলে অ্যান্টি-ফ্যাসিস্ট অজুহাতে। কোনও স্বাধীনতাকামী লোকই ফ্যাসিজ্‌মের সমর্থন করে না, কিন্তু তোমাদের অ্যান্টি-ফ্যাসিস্ট আচরণগুলো বড় বেশি রকম পরস্পরবিরোধী। কেউ যদি মনে-প্রাণে জীবহত্যাবিরোধী বৈষ্ণব হতে চায়, তা হলে কেউ আপত্তি করবে না, অনেকে তাকে ভক্তিও করতে পারে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সে যদি কসাইখানা নির্মাণে সাহায্য করে, তাহলে ব্যাপারটা সন্দেহজনক হয়ে ওঠে। তোমাদের গুরু স্টালিন স্বদেশপ্রীতির জন্য মানবপ্রীতি বিসর্জন দিতে ইতস্তত করেননি—এক কথায় থার্ড ইণ্টারন্যাশনালের সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে দিলেন; কিন্তু

তোমরা স্বদেশের বিদ্রোহ-প্রচেষ্টাকে বাধা দিলে বিদেশী ফ্যাসিজ্‌ম্‌কে ধ্বংস করবার অজুহাতে। এ তোমাদের কেমন গুরুভক্তি, বুঝি না। সুতরাং সন্দেহ হয়, গুরুতর ভক্তি করবার মত কোনও দেবতার সন্ধান পেয়েছ হয়তো কাছে-পিঠে। ফ্যাসিজ্‌ম্‌ ধ্বংস করাই যদি তোমাদের নীতি, তা হলে জিজ্ঞাসা করি, আমাদের সম্পর্কে ইংরেজও কি কম ফ্যাসিস্ট? তোমরা বলবে, আমরা তো তার বিরুদ্ধে ক্রমাগত যুদ্ধ করছি। কিন্তু যার বিরুদ্ধে ক্রমাগত যুদ্ধ করছ, সে-ই যখন তোমাদের পিঠ চাপড়াচ্ছে, তার নিজেরই বিরুদ্ধে প্রোপাগাণ্ডা ছাপাবার জন্যে প্রচুর কাগজ দিচ্ছে, তখন ব্যাপারটা একটু গোলমেলে ঠেকে। সামান্য বিরোধিতার জন্যে যারা গুলি চালিয়ে হাজার হাজার লোক মেরে ফেলতে ইতস্তত করে না, মেদিনীপুর চট্টগ্রাম উজাড় করে দেয়, দেশের নেতাদের বিনাবিচারে আটকে রাখে বছরের পর বছর, তারা তোমাদের সম্পর্কে এমন মহৎ হয়ে উঠল কি করে? হয়তো এ সমস্তরই উপযুক্ত জবাবদিহি তোমাদের কাছে আছে, হয়তো আমি যা বুঝেছি তা সমস্তই ভুল (আহা, তাই হোক), হয়তো আমি এত কথা লিখতামও না, কিন্তু আমি কেন তোমাদের সঙ্গে সম্পর্ক আর রাখতে পারিনি, তা জানতে চেয়েছ বলেই অকপটে সমস্ত কথা খুলে বলতে হল, তা না হলে এসব অপ্রিয় আলোচনা তোলবার ইচ্ছে ছিল না। কারণ আমি জানি, আলোচনা দ্বারা তোমাদের স্বপক্ষে আনতে পারব না। তোমরা তর্কপটু চীৎকারদক্ষ বিদ্বান লোক, তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করা সম্ভবই হবে না হয়তো। এর উত্তরে তুমি যে কড়া জবাব দেবে, তার প্রত্যুত্তর দেবার সামর্থ্য বা প্রবৃত্তিও আমার আর থাকবে না সম্ভবত। তবু এত কথা লিখলাম, কেবল নিজের আচরণের সঙ্গতিরক্ষার জন্য।

একটা কথা আমি বুঝেছি, কারও উদ্দেশ্য যদি মহৎ এবং আচরণ যদি অকপট হয়, তাহলে কেবল মতবিরোধের জন্য কেউ তাকে ঘৃণা করে না। ভণ্ডই ঘৃণ্য। বিয়ে করবার পর আত্ম-আবিষ্কার করে আমি চমকে গেছি। সেজে-গুজে আমি যে তোমাদের পার্টিতে রোজ যেতাম, এতে আমার মা আপত্তি করলে তাঁদের মুখের উপর কড়া কড়া কথা শুনিয়ে দিতে আমার আপত্তি ছিল না, দিয়েছিও কতবার, গুরুজনদের মুখের উপর কড়া জবাব দেওয়াটাই ছিল আমার বাহাদুরি। ঔদ্ধত্য যদিও কোন কারণেই মার্জনীয় নয়, তবু তা মানিয়ে যেত যদি আমার উদ্দেশ্য মহৎ এবং আচরণ অকপট হত। শ্রমিকদের উদ্ধারের ছুতোয় যা করতাম, চলিত ভাষায় তার নাম--আড্ডা দেওয়া এবং অত্যন্ত বাজে কাজে সময় নষ্ট করা। তার মধ্যে ত্যাগ ছিল না, ছিল মুখোশ-পরা স্বার্থপরতা। তার প্রমাণ, শেষ পর্যন্ত ওই আড্ডা থেকেই স্বামী নির্বাচন করে ঘর-সংসার গুছিয়ে বসেছি। শ্রমিকদের নিয়ে মাথা ঘামাবার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে হঠাৎ। আমার কমরেড স্বামীটিও ক্যাপিটালিজ্‌মের বিরুদ্ধে ওজস্বিনী ভাষায় অনেক বক্তৃতা দিতেন, কিন্তু সুযোগ পাওয়া মাত্র ক্যাপিটালিস্ট গভর্মেণ্টের অধীনে চাকরি নিতে তাঁর বাধেনি; এখন তাঁর হুকুমে পুলিস গুলি চালাচ্ছে ওই শ্রমিকদেরই উপর, কিষাণদের কাছ থেকে পিউনিটিভ ট্যাক্স আদায় করছেন তিনি। গুজব—শীঘ্রই রায়সাহেব হবেন নাকি কর্মপটুতার জন্য। তুমিও তাঁর ভক্ত ছিলে একজন, সেদিন তোমার এক তাড়া চিঠি আবিষ্কার করলাম তাঁর ড্রয়ার থেকে। এখনও তুমি তাঁকে ভক্তি করতে পারছ কি না জানি না (শুনেছি, ভক্তির বিশুদ্ধতা নির্ভর করে ভক্তের একনিষ্ঠার উপর, ভক্তিভাজনের গুণাগুণের উপর নয়), আমি কিন্তু আর পারছি না। আত্ম-আবিষ্কার করে নিজেরই উপর শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলেছি! ছি ছি, কি লজ্জা! এতদিন যেটাকে

তরবারি বলে আস্ফালন করেছিলাম, দেখছি, তাতে খাঁটি ইস্পাতের নাম-গন্ধ নেই, ঝুটো বীরত্বের রাঙতা দিয়ে মোড়া বাঁখারি সেটা। অশ্রদ্ধায় আত্মগ্লানিতে মরে যেতে ইচ্ছে করছে।

...আরও একটা জিনিস আবিষ্কার করেছি। মানুষের মন শ্রদ্ধা করবার জন্য সতত উন্মুখ। দেহের ক্ষুধার মত এটিও একটা ক্ষুধা। জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে সে শ্রদ্ধেয়কে খুঁজে বেড়ায়। সমাজ বা শাস্ত্র যাঁদের শ্রদ্ধা করতে বলেছেন, যেমন পিতা, মাতা বা স্বামী, তাঁরা সত্যিই যদি শ্রদ্ধাস্পদ হন, তাহলে জীবন চরিতার্থ হয়ে যায়; কিন্তু যদি না হন, তা হলে মন ভুল করে না। সমাজ বা শাস্ত্রের শাসন মেনে আমরা লেবেল-মারা পূজনীয়দের প্রতি মৌখিক একটা শিষ্টাচার করি বটে, কিন্তু মনে মনে আমরা সন্ধান করে বেড়াই সত্যিকার শ্রদ্ধেয়কে। নিরন্তর এই সন্ধান চলেছে। দেহের ক্ষুধার মত এও অনিবার্য। এর প্রেরণায় মন ঘুরে বেড়ায় দেশ থেকে দেশান্তরে, পুস্তক থেকে পুস্তকান্তরে, যুগ থেকে যুগান্তরে, জন্ম থেকে জন্মান্তরেও হয়তো।

অংশুমানবাবুকে দেখে প্রথমে সন্দেহ হয়েছিল। সন্দেহ হবার কারণ আমার নিজের মধ্যেই ছিল। যে নিজে ভণ্ড, সে সত্যিকার ধার্মিককে প্রথমে চিনতে পারে না, ভণ্ড বলে মনে করে। তার নিজের দৃষ্টিই বক্র, মন স্বচ্ছ নয়, সে সহজে প্রসন্ন মনে কারও মহত্ত্ব স্বীকার করতে পারে না, নিজের ক্ষুদ্র চরিত্রের মাপকাঠি দিয়ে মাপতে গিয়ে সকলকেই সে ছোট করে ফেলে। অহঙ্কারবশে ভাবতেই পারে না যে, কেউ তার চেয়ে বেশি ভালো হতে পারে। সত্য কিন্তু চাপা থাকে না বেশিদিন। অন্ধকারবিলাসী পেচককেও শেষ পর্যন্ত সূর্যের মহত্ত্ব স্বীকার করতে হয়। পেচক বিস্মিত হয় কি না জানি না, আমি কিন্তু হয়েছিলাম, ওইখানেই বোধ হয় আমি পেচকের চেয়ে বড়। পরে ভেবে দেখলাম, এতে বিস্ময়ের কিছু নেই! এরাই তো চিরন্তন অগ্রণী, সর্বকালে সর্বদেশে এরাই তো আদর্শের পতাকা বহন করেছে প্রাণ তুচ্ছ করে, অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছে সমস্ত সত্তা দিয়ে, আষাঢ়ের নবোদিত জলধরের মত আত্মবিসর্জন দিয়ে ধন্য করেছে পিপাসিত পৃথিবীকে। এরা বিশেষ কোন দলেরও নয়, দেশেরও নয়। এরা কংগ্রেসে আছে, কমিউনিস্ট পার্টিতে আছে, হিন্দু মহাসভায় আছে। প্রাণের আবেগটাই এদের কাছে মুখ্য, দলটা নয়। প্রাণের আবেগে যে-কোনও একটা দলে নাম লিখিয়ে এরা প্রাণপণ করে আদর্শ পালন করবার জন্য। আদর্শই এদের লক্ষ্য, দলটা উপলক্ষ্য মাত্র। অনেক সময় কোনও দলে নাম লেখাবার প্রয়োজনও হয় না এদের। এ সবই জানতাম। তবু যখন আগস্ট-আন্দোলনের ঢেউ আলোড়িত করে তুলল চতুর্দিক, বিক্ষুব্ধ জনতার স্বতঃস্ফূর্ত আক্ষেপে সমস্ত দেশ বিশৃঙ্খল হয়ে উঠল, দোষী-নির্দোষ বিচার না করে বেপরোয়া মিলিটারি গুলি যখন রক্তস্রোত বইয়ে দিলে দেশের বুকে, ইতর-ভদ্র সবাই যখন সন্ত্রস্ত—কখন কি হয়, আমাদেরই এই শহরে ভদ্র গৃহস্থের বাড়িতে পুলিস ঢুকে থামে-বাঁধা স্বামীর সামনে ধর্ষণ করে গেল যখন তার স্ত্রীকে, বৃদ্ধ বাপকে মারতে মারতে অজ্ঞান করে দিলে, লোকের ঘর-বাড়ি নীলাম করে পিউনিটিভ ট্যাক্স আদায় করতে লাগল, তখন আমরা ঘরে খিল দিয়ে আরাম-কেদারায় বসে বসে 'রেন্‌বো' উপন্যাসে নাৎসি জার্মানির অত্যাচারের কাহিনী পাঠ করতে করতে রোমাঞ্চিত হচ্ছিলাম, আর কিছু করিনি। যদিও আমাদের দলের অনেকে বড়াই করে বেড়াচ্ছেন—'অন্ প্রিন্সিপল্' করিনি; আমি কিন্তু অকপটে স্বীকার করছি—করবার সাহস হয়নি। এসব নিয়ে বৈঠকখানায় বসে আলাপ করবার সাহস পর্যন্ত হয়নি স্বাভাবিক কণ্ঠস্বরে। অন্তরঙ্গদের কাছে নিম্নকণ্ঠে আলাপ করবার আগেও বাইরে গিয়ে

দেখে এসেছি, আশেপাশে কেউ আছে কিনা! কলেজ-জীবনে যাঁর শ্রমিকদুঃখকাতরতার অন্ত ছিল না, প্রাক্তন কমরেড আমার সেই স্বামী যখন সশস্ত্র মিলিটারি বাহিনী নিয়ে গ্রামে গ্রামে শৃঙ্খলা-স্থাপনে ব্যস্ত এবং আমি যখন ব্যস্ত সেই স্বামীর পরিচর্যায়, তখন বিস্মিত হলাম অংশুমানবাবুর কাণ্ড দেখে। অতিশয় অপ্রত্যাশিত বলে মনে হল ঘটনাটা। আমাদের বাড়ির সামনের মাঠে প্রকাশ্য দিবালোকে সভা করে ওই মুখ-চোরা ছেলেটি ঘোষণা করলে—এর প্রতিশোধ আমরা নেব। সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব মানুষ আমরা, এই হীন অপমান কিছুতেই সহ্য করব না, প্রাণ দিয়েও প্রমাণ করব যে, প্রাণের চেয়েও মান আমাদের কাছে বড়।

...আমি জানলায় দাঁড়িয়ে দেখছিলাম। দেখলাম—ওর চোখে মুখে অপূর্ব দিব্য-জ্যোতি ফুটে উঠেছে। কেন জানি না, হঠাৎ রাণা প্রতাপসিংহের কথা মনে পড়ে গেল। অত্যন্ত ছোট মনে হতে লাগল নিজেকে।...

ও-ই একমাত্র লোক যার সঙ্গে মাঝে মাঝে রাজনীতি নিয়ে চর্চা হত, দেশের দুঃখ কষ্ট নিয়ে আলোচনা করতাম। আমাদের এ ধরনের আলোচনা যে কি রকম হয়, তা তোমাদের অজানা নেই নিশ্চয়। নিজেকে জাহির করবার আবেগে আত্মপ্রশংসার ফুলঝুরি কাটতে কাটতে এমন তন্ময় হয়ে যেতাম যে, ওর নীরবতাটা প্রথম প্রথম চোখেই পড়ত না। ও নীরবে বসে শুনত খালি। এমন একটা বিদ্বান ছেলে নীরবে আমার কথা শুনে যাচ্ছে বিনা প্রতিবাদে—যদিও এমন ঘটনা আমার জীবনে কখনো ঘটেনি, কারণ ইতিপূর্বে যাদের সঙ্গে পরিচয় ছিল তাদের মধ্যে শ্রোতা ছিল না, বক্তা ছিল সবাই—তবু ওর নীরবতা বিস্মিত করেনি আমাকে। মনে হত, ওটা আমার প্রাপ্য। সূক্ষ্ম একটা গর্বও অনুভব করতাম। ওর সশ্রদ্ধ নীরবতার অর্থও আমি করেছিলাম—আহা, বেচারা বই মুখস্থ করে পরীক্ষাই পাস করেছে খালি, দেশের কোনও খবর রাখে না, দেশের সম্বন্ধে কোনও চিন্তাই করেনি বোধ হয়। দরিদ্র মজুর অসহায় কৃষকদের আত্মমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে না পারলে দেশের ভবিষ্যৎ যে অন্ধকার—এ কথা হৃদয়ঙ্গম করবার মত শিক্ষা হয়নি বেচারার, তাই আমার কথা শুনে তাক লেগে গেছে। ডেপুটি-গৃহিণী আমি, মনোহর শাড়ি ব্লাউজে সজ্জিত হয়ে সর্বাঙ্গে অলঙ্কারের ঝনৎকার তুলে গদি-আঁটা সোফায় বসে বিলিতি কফির পেয়েলায় চুমুক দিতে দিতে দেশের দরিদ্র মজুর ও কৃষকদের মর্মস্পর্শী আলোচনা করতাম। ও চুপ করে শুনত।

...তারপর এল আগস্ট-অন্দোলন। সেই আন্দোলনের পটভূমিকায় অংশুমানবাবুর স্বরূপ দেখে লজ্জায় মরে গেলাম। নিমেষে বুঝতে পারলাম, আমি চালিয়াৎ, ও কর্মী ; আমি ভীরু, ও বীর; যে পুলিসের সম্বন্ধে কথা কইতে আমার গলার স্বর স্বতই খাটো হয়ে পড়ে, ও এগিয়ে যেতে পারে সেই পুলিসের অত্যাচার প্রতিরোধ করবার জন্যে। ওতে আর আমাতে কত তফাত! মনে হল, এ কথা ওরও নিশ্চয় অবিদিত নেই। না জানি মনে মনে কত হেসেছে আমার লম্বা লম্বা বক্তৃতা শুনে। ওর সামনে দাঁড়াব কি করে—এই সমস্যায় যখন আমি আকুল, ও-ই তখন এসে তার সমাধান করে দিয়ে গেল।

...অন্ধকার রাত্রি। স্বামী টুরে বেরিয়ে গেছেন। কারফিউ অর্ডার জারি হয়েছে। বন্দুক ঘাড়ে করে মিলিটারি পুলিস ঘুরে বেড়াচ্ছে চতুর্দিকে। নিঃশব্দচরণে অংশুমান এসে দাঁড়াল। ক্ষণকাল আমার মুখের দিকে নির্নিমেষে চেয়ে রইল, সেই ক্ষণনিবদ্ধ দৃষ্টির মধ্যে কি যে দেখলাম আমি, আমার সমস্ত চিত্ত বিকশিত হয়ে উঠল, মনে হল, ধন্য হয়েছি, কৃতার্থ হয়েছি, চরিতার্থ হয়েছি।

তারপর স-সঙ্কোচে সে বললে, তোমার কাছে একটু দরকারে এসেছি...। আমার এক দূরসম্পর্কের দাদা ওর সহপাঠী ছিল, তাই ও আমাকে 'তুমি' বলত। সেই সূত্রে আলাপও হয়েছিল।

আমার কাছে কি দরকার?

সত্যিই অবাক লাগছিল, ভয়ও হচ্ছিল একটু-একটু।

যে কাজে নেমেছি, তাতে টাকার দরকার। কিছু দিতে পারবে তুমি? আমাদের অবস্থা তো জানই, কিছু টাকা পেলে সুবিধা হত। পারবে দিতে?

সংসার-খরচের কয়েক টাকা মাত্র হাতে ছিল। টাকা-কুড়ি-পঁচিশের বেশি নয়। সে কটা হাতছাড়া করবারও উপায় ছিল না, কারণ স্বামী টুরে, ব্যাঙ্ক বন্ধ। সংসার অচল হয়ে পড়বে। তবু কিন্তু এ সুযোগ ছাড়তে ইচ্ছে হল না। মনে হল, হৃত সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধারের এই একমাত্র উপায়। উঠে গিয়ে দেরাজটা খুললাম। যে জড়োয়া গয়নাগুলো আমার প্রিয়তম সম্পত্তি ছিল, তার বাক্সটা বার করে এনে দিলাম তার হাতে।

টাকা নেই। এইগুলো নিলে যদি হয়, নিয়ে যাও।

সে একবার সকৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে চাইলে আমার মুখের দিকে। তার পর বেরিয়ে চলে গেল! আর ফেরেনি।

এই ঘটনাটুকুর যে বৈজ্ঞানিক নির্যাস তুমি বার করবে তা আমি জানি। তবু তোমাকে সব কথা খুলে লিখলাম কেন, তা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে অনিবার্যভাবে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হচ্ছি, তা হয়তো আমার পক্ষে অপমানজনক (মান-অপমানের প্রচলিত মানদণ্ড অনুসারে); তা হোক, তবু কোদালকে কোদাল বলতে আমি বাধ্য। নিজের এতবড় একটা কৃতিত্বের কথা তোমাকে না জানিয়ে পারছি না ভাই কিছুতেই। মনে হচ্ছে এই বোধ হয় আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি। মনে হচ্ছে, এতদিনে নিজেকে ভারতবর্ষীয় নারী বলে পরিচয় দেবার সামান্য যোগ্যতা বোধ হয় অর্জন করলাম। তোমরা ইচ্ছে কর তো কমরেড অন্তরার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদন করতে পার।

.. কিন্তু ভুল বুঝো না আমাকে। মনে করো না যে, আমি কমিউনিজমের উপর বিদ্বেষভাবাপন্ন। যে সাম্যের আদর্শে মুগ্ধ হয়ে তোমাদের দলে যোগ দিয়েছিলাম, তোমাদের দলে তার অভাব দেখে সে দলের প্রতি শ্রদ্ধা হারিয়েছি, কিন্তু সাম্যের আদর্শ আমার ঠিক আছে। ওইটেই তো মানুষের চিরন্তন আদর্শ। তা ছাড়া কোন ইজ্‌মের উপরই আমার রাগ নেই, কারণ এটা বুঝেছি যে, সব নদীই শেষ পর্যন্ত সাগরে গিয়ে মিশবে যদি তার গতি অব্যাহত থাকে। ইজ্‌মটা বাইরের জিনিস, আসল জিনিস মনুষ্যত্ব। আমরা অনেকেই বাইরের খোসাটার নকল করে মরছি, অন্তর্নিহিত মনুষ্যত্বের সাধনা করবার ধৈর্য আমাদের নেই—এইটেই আমার দুঃখ। চিরকালই আমরা এই করে এসেছি। আর্য ঋষিদের যজ্ঞক্রিয়া পাঁঠা-খাওয়া-উৎসবে পরিণত হয়েছে, বুদ্ধসঙ্ঘ পরিপূর্ণ করেছে অনাচারী শ্রমণ-শ্রমণীর দল, চৈতন্যের ধর্ম নেড়া-নেড়ীর ব্যভিচার হয়ে দাঁড়াল, মহাত্মাজীর অহিংস আন্দোলনকে মূলধন করে কতকগুলো খদ্দরধারী গুণ্ডা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করে বেড়াচ্ছে। কমিউনিজমের বেলাতেও এর ব্যতিক্রম হয়নি। কাস্তে-হাতুড়ির লেবেল মেরে আমাদের মধ্যে অধিকাংশই যা করে বেড়াচ্ছে, তা মনুষ্যত্ব-চর্চা নয়, আত্মবিনোদন। জীবনের বাঁধা-ধরা পথে চলবার সুযোগ কিংবা সামর্থ্য এদের অনেকের নেই,

অধিকাংশই জীবনযুদ্ধে অকৃতী। বিয়ে করেনি, নিজেদের গ্রাসাচ্ছাদন জোটাবার সামর্থ্য পর্যন্ত নেই। বাবা, দাদা বা ওই জাতীয় কারও ঘাড়ে চড়ে পরশ্রীকাতরতার বিষোদ্‌গিরণ করে বেড়াচ্ছে কেবল এবং নিজেদের অক্ষমতার দৈন্যটাকে ঢাকতে চেষ্টা করছে কমিউনিজ্‌মের ঢক্কানিনাদে। বোঝে না যে, অশক্ত অসংযত ভণ্ড বা স্বার্থপর লোক গায়ে একটা লেবেল আঁটলেই লেনিন স্ট্যালিন হয়ে ওঠে না। তার জন্য সাধনা চাই, চরিত্রবল চাই। যে-কোন একটা চ্যাংড়া ছোঁড়া ফড়ফড় করে কমিউনিজ্‌মের বুলি আওড়ায় যখন, তখন লজ্জা হয় আমার। কবে আমরা বুঝতে শিখবো যে, শুধু বুলি আওড়ালেই সিদ্ধি হয় না। সিদ্ধির জন্য সাধনা চাই। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের অনুকরণে অনেকেই এ দেশে দাড়ি রেখে উপনিষদের বুলি আওড়ালে, কিন্তু তার ফল কি হয়েছে?...

এত দুঃখের মধ্যেও সান্ত্বনা পেয়েছি একটি কথা ভেবে যে, অধিকাংশই মেকি হতে পারে, কিন্তু খাঁটি লোকও আছে। এরা আছে বলেই আশা আছে। ইতিহাসে এদের কাহিনী পড়েছি, আমাদের দেশের রাজনৈতিক বিপ্লবে দেখেছি এদের দ্যুতিমান আবির্ভাব। এরা সংখ্যায় কম। তাতে ক্ষতি নেই; একটি সূর্যই অন্ধকার ধ্বংস করে। আর আমার বেশি কিছু বক্তব্য নেই। আশা করি, যা বললাম তার মধ্যেই তোমার চিঠির উত্তর পেয়েছ। আমার ভালোবাসা জেনো। ইতি—

তোমারই

অন্তরা

।। এগারো।।

ইলেকট্রিসিটির বইখানা নিয়ে গেছে। মনের সঙ্গে যে নির্জনে বোঝাপড়া করব তারও উপায় নেই। দু ঘণ্টা অন্তর পুলিশের লোক আসছে। প্রতিবারই নূতন লোক। জেরা চলছে ক্রমাগত। সঙ্গত-অসঙ্গত নানা প্রশ্ন। গাল দিচ্ছে। তাকে, তার বাবাকে, বংশকে, দেশকে, দেশের নেতাদের। অকথ্য, অশ্রাব্য গালাগালি...ঘুমে চোখ বুজে আসছে, দেহ অবসন্ন, কিন্তু ওরা থামবে না। দু ঘণ্টা অন্তর নূতন লোক আসছে। জেরার পর জেরা, প্রশ্নের পর প্রশ্ন, গালাগালির ঝড় বইছে। ঘুমুতে দেবে না। নির্বাক হয়ে শুনে যেতে হচ্ছে খালি। নির্বাকও থাকতে দিচ্ছে না...সঙ্গত অসঙ্গত নানা প্রশ্ন...যা হোক কিছু একটা উত্তর দিতেই হচ্ছে...একটি উত্তর সহস্রবার দিয়েছে, আবার দিতে হচ্ছে। চুপ করে থাকলে গাল দিচ্ছে। জানি না, জানি না, জানি না—কতবার বলা যায় এক কথা! কিন্তু ওরা থামবে না। একটি কথা শুনবে বার বার। বলছে—বলে যাচ্ছে ক্রমাগত। বসতে দেবে না, দাঁড় করিয়ে রেখেছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। শরীরের রক্ত ফুটছে টগবগ করে, জিব শুকিয়ে আসছে, জোর করে চাইতে গিয়ে চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছে। বাইরে শান্তভাব বজায় রেখে তবু বলে যেতে হচ্ছে—জানি না, জানি না, জানি না।

শেষ সি. আই. ডি. ইনস্পেক্টার বিদায় নিয়ে যাবার আগে বলে গেলেন, তিনটে বাজল, এবার উঠি, আবার আসব কাল। ভাল করে ভেবে দেখুন ইতিমধ্যে।

অন্ধকার ঘরে একা রইল অংশুমান।

।। বারো।।

নিশ্ছিদ্র নিবিড় অন্ধকার।

পথ। যে পথ মানুষ সৃষ্টি করে গতিকে মুক্তি দেবার জন্যে সেই পথই আবার মানুষ বন্ধ করে মানুষেরই গতি রোধ আকাঙ্ক্ষায়। মানুষই মানুষের সর্বপ্রধান শত্রু...

ঠক্ ঠক্ ঠকাঠক্...সন্তর্পণে, কিন্তু অনবরত পড়ছে আঘাতের পর আঘাত। দশজন অন্ধকারে প্রাণ তুচ্ছ করে কুড়ুল চালিয়ে যাচ্ছে। গাছ ফেলে রাস্তা বন্ধ করতে হবে। মিলিটারি মোটর না আসতে পারে যেন। ঘর্মাক্ত কলেবরে কুড়ুল চালাচ্ছে সবাই। ধরা পড়লে মৃত্যু সুনিশ্চিত জেনেও। হাত কাঁপছে না কারও। দৃঢ়-নিবদ্ধ ওষ্ঠ, চোখে আগুন জ্বলছে সকলের। সকলেই যুবক নয়। বৃদ্ধ আছে, বালকও আছে।

নিন বাবু মশায়, আমার নৌকোটাও।

সারি সারি নৌকো জমা হচ্ছে ঘাটে-আঘাটায়। প্রত্যেকটার তলা ফেঁড়ে ডুবিয়ে দেওয়া হচ্ছে। মালিকরা নিজেরাই দিচ্ছে। ইচ্ছায় অনিচ্ছায় দিতে হচ্ছে সকলকেই। দেশব্যাপী এই অপমানের প্রতিবাদ করতেই হবে। নদী পেরিয়ে পুলিশ যেন না আসতে পারে। জনতার বিপুল দাবি, দিতেই হবে নৌকো সকলকে। দেখতে দেখতে সব কটা নৌকো ডুবে গেল। ওপারের দিকে চাইলে অংশুমান। অন্ধকার। কিছু দেখা যায় না। আকাশে মনে হল মেঘ করেছে একটু। মেঘের কোলে নক্ষত্র জ্বলছে। এক ঝলক হাওয়া ছুটে এল কোথা থেকে আচমকা। তালগাছের পাতাগুলো হুড়মুড় করে উঠল। শিহরন জাগল নদীর জলে। অংশুমান সওয়ার হল বাইকে, অনেক জায়গায় যেতে হবে এখনও।

মার গাঁইতি, হ্যাঁ দাও আর এক ঘা—

আরে, কোদাল চালাও না ওই দিকটাতে? ভয় কি, ভাবছ কি তুমি?

মায়া হচ্ছে।—হেসে বললে একজন, নিজের হাতে গেঁথেছিলাম একদিন...

হ্যাঁ, চার আনা মজুরির বদলে, সাহেবদের মোটর যাবে বলে।

পড়তে লাগল কোপের পর কোপ।

হুড়মুড় করে ভেঙ্গে পড়ল পুলটা।

ছুটল সবাই অন্ধকার মাঠ ভেঙ্গে।

অদৃশ্য হয়ে গেল নিমিষে...

রাস্তায় বড় বড় গর্ত খোঁড়া হচ্ছে। টেলিগ্রাফের তার একটাও নেই। খুঁটিগুলো পর্যন্ত উপড়ে ফেলেছে সবাই মিলে। টেলিফোনের তারও কাটা হয়ে গেছে...। অংশুমানের দেখা হয়ে গেল হঠাৎ দারোগারই সঙ্গে।

কে?

প্রদীপ্ত টর্চের আলোটা পড়ল মুখের উপর। পালাবার উপায় রইল না। বাইক থেকে নামতে হল।

আমি অংশু।

আপনি! এত রাতে এদিক কোথা গিয়েছিলেন?

মনে হল, কতকগুলো লোক টেলিগ্রাফের তার কাটছে, তাই বেরিয়েছিলাম যদি তাদের ধরতে পারি...

পাগল করে দেবে দেখছি ব্যাটারা। গেল কোন্ দিকে? আমিও তাদের সন্ধানে বেরিয়েছি।

ওই যে ওই দিকে, বাগানের অন্ধকারে সরে পড়ল সব।

যেদিকে লোকগুলো সত্যিই পালিয়েছিল, ঠিক তার উল্টো দিকে অঙ্গুলি-নির্দেশ করে দেখিয়ে দিলে অংশুমান। বিভ্রান্ত দারোগা ছুটল সেই দিকে...

...পোল্যাণ্ড।

একটি ছোট বোর্ডিং স্কুল। পঁচিশটি মেয়ে সারি সারি বসে আছে। কুৎসিত-দর্শনা একটি শিক্ষয়িত্রী পড়া নিচ্ছেন। দশ বছরের একটি মেয়ে মেরী স্‌ক্লাডোওয়াস্‌কা পড়া বলে যাচ্ছে। পোলিশ ভাষায় পোল্যাণ্ডের একটি রাজার কাহিনী। তন্ময় হয়ে শুনছে সবাই। টু' শব্দটি নেই। বে-আইনী কাজ হচ্ছে। জার-শাসিত পোল্যাণ্ডে পোলিশ ভাষায় কিছু পড়াবার হুকুম নেই। তবু কিন্তু পড়ানো হচ্ছে লুকিয়ে। স্কুলের দারোয়ান থেকে আরম্ভ করে হেডমিস্‌ট্রেস্ পর্যন্ত সকলেই এ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। অন্যায় আইন মানবে না তারা।...হঠাৎ ইলেক্‌ট্রিক ঘণ্টাটা বেজে উঠল—জোরে নয় আস্তে। সঙ্কেত। চমকে উঠল সবাই। নিশ্চয় আসছে কেউ। নিমেষের মধ্যে চারটি মেয়ে ইতিহাসের বইগুলো কুড়িয়ে পাশের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল ত্বরিতপদে। সেগুলো লুকিয়ে রেখে ফিরে এল আবার। সেলাই নিয়ে বসল সব, যেন এতক্ষণ সেলাই নিয়ে ছিল সবাই। রাশিয়ান ইনস্‌পেক্টর ঘরে ঢুকলেন।

শিক্ষয়িত্রীটি উঠে বললেন, এ দু ঘণ্টা আমরা মেয়েদের সেলাই শেখাই...

আপনি কি যেন পড়ছিলেন একটা?

ওদের গল্প পড়ে শোনাচ্ছিলাম! এই যে...

রাশিয়ান হরফে ছাপা কেতাদুরস্ত একখানা গল্পের বই আগে থাকতে টেবিলে রাখাই ছিল, দেখালেন সেটা। সন্দিগ্ধ-দৃষ্টিতে সেটা উল্‌টে-পাল্‌টে দেখে রাশিয়ান ইন্‌স্‌পেক্টর তার পর পরীক্ষা শুরু করলেন। রাশিয়ার জারেদের নাম, তাদের জাতিগোষ্ঠীর নাম, তাদের প্রত্যেকের উপাধি কি কি, খটমট নামের বিরাট বিরাট তালিকা আবৃত্তি করতে হল। নির্ভুলভাবে আবৃত্তি করে গেল সেই দশ বছরের মেয়েটি। মেরী স্‌ক্লাডোওয়াস্‌কা...ভবিষ্যৎ মাদাম ক্যুরি।

শত্রুর কাছে মিছে কথা বলায় পাপ নেই।

...না, না...।

আপনি কি দেখেছিলেন?

আমি দেখেছিলাম যে, উনি বাইক করে এসে ভলাণ্টিয়ার যোগাড় করছিলেন তার কাটবার জন্যে। আমাকেও যেতে বলেছিলেন।

আদালতে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে অংশুমান। সাক্ষীর পর সাক্ষী আসছে যাচ্ছে। সে কিন্তু কিছু শুনছে না। তার মানসপটে জাগছে ছবির পর ছবি। আর কানে বাজছে—যাচ্ছি, যাচ্ছি, তোমারই কাছে যাব...। অদৃশ্য অপরা-তড়িৎ ক্রমাগত বলে চলেছে পরা-তড়িতের উদ্দেশে—যাব, যাব, তোমারই কাছে যাব...

হ্যাঁ যাবই, মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও যাব...

এগিয়ে চলেছে জনতা। সামনেই থানা। লাল-পাগড়িতে ভরে গেছে চারদিক। খাকি-পোশাক-পরা মিলিটারি দাঁড়িয়ে আছে বেওনেট উঁচিয়ে। জনতা এগিয়ে চলেছে তবু।

ফ্যায়ার...

শুরু হয়ে গেল গুলি। পতাকাধারী পড়ে গেল একজন। পতাকা পড়ল না কিন্তু...ভূলুণ্ঠিত রক্তাক্ত বীরের দৃঢ়মুষ্টিতে সোজা খাড়া দাঁড়িয়ে রইল। যতক্ষণ প্রাণ ছিল, পতাকার মান রেখেছিল সে। গুলি চলছে... লোক মরছে। অগ্রগতি বন্ধ হচ্ছে না কিন্তু...এগিয়ে চলেছে জনতা...

সর্বাঙ্গে গুলি লেগেছে, রক্তে ভেসে যাচ্ছে চতুর্দিক, গিরগিটির মত হামাগুড়ি দিয়ে বুকের ভরে এগিয়ে চলেছে একজন। দুটো পা-ই জখম হয়েছে, দাঁড়াবার শক্তি নেই। কিন্তু তবু সে যাবে, মরবার আগে থানায় সে পৌঁছবেই। পণ সে রক্ষা করবেই...

এসেছি, এসেছি এই দেখ, তোমরাও এস...

থানার বারান্দায় উঠে হাসিমুখে বলে উঠল সে। রগের উপর একটা গুলি বিঁধল এসে। মুখ থুবড়ে পড়ল। মুখে হাসি।

আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে নিস্পন্দ অংশুমান ছবির পর ছবি দেখছে শুধু, হঠাৎ জজ সাহেবের মুখটা চোখে পড়ল। দেশী জজ। যা শুনছে তাই লিখে যাচ্ছে, যে যা বলছে তাই টুকে যাচ্ছে। নির্বিকার। একটা গল্প মনে পড়ে গেল; গল্প নয়, ইতিহাস। ট্রট্স্কির লেখা রাশিয়ান বিদ্রোহের ইতিহাসে আছে—চতুর্দিকে বিদ্রোহ যখন আসন্ন, অত্যাচারে অবিচারে ষড়যন্ত্রে রাজকর্মচারীরা পর্যন্ত যখন ব্যতিব্যস্ত, ঘরে বাইরে কোথাও স্বস্তির চিহ্নমাত্র নেই, প্রলয়ের ঢেউ প্রাসাদের সিংহদ্বারে যখন ভেঙ্গে পড়ছে, তখন জার নিকোলাস নাকি নিরতিশয় উদাসীন ছিলেন। প্রমাণ তাঁর তখনকার রোজনামচা। অনেকক্ষণ বেড়ালাম, দুটো কাক মারলাম, দিনের আলোয় বসে চা খাওয়া গেল, পাতলা কামিজ গায়ে দিয়ে বেরিয়েছি আজ, নৌকো বাইলাম, একটু পড়েছি—রোজনামচায় এইসব লেখা খালি। আসন্ন বিদ্রোহ সম্বন্ধে একটি কথা নেই, স্বাভাবিক ছন্দে জীবন বয়ে চলেছে যেন। সামান্যতম উদ্বেগের চিহ্নমাত্র নেই। রুশ-জাপান যুদ্ধে জাপানীরা পোর্ট আর্থার দখল করেছিলেন যখন, তখনও তিনি নাকি এমনই নির্বিকার ছিলেন। তাঁর পারিষদরা তাঁর অদ্ভুত আত্মসংযম দেখে অবাক হয়ে যেতেন, অনেকে বলতেন, এ ঔদাসীন্য আভিজাত্যের লক্ষণ। ট্রটস্কি বলেছেন, এর আসল কারণ আধ্যাত্মিক দৈন্য। উদ্বিগ্ন বা উত্তেজিত হতে হলে যে মানসিক শক্তির প্রয়োজন, নিকোলাসের তা ছিল না। তিনি ছিলেন জন্ম-অসাড়। এ লোকটাও তাই নাকি।...অংশুমান আর একবার জজ-সাহেবের মুখের দিকে চাইলে। জীবনের কোন লক্ষণ নেই। যে জাল ছিন্ন করবার জন্যে দেশসুদ্ধ লোক বিদ্রোহ করেছে, সে জালে উনিও যে আবদ্ধ তার কোন বোধ ওঁর চোখে মুখে পরিস্ফুট নয়। মানুষ নয়, একটা মুখোশ-পরা যন্ত্র বসে আছে কোট প্যাণ্ট পরে, যে যা বলছে টুকে যাচ্ছে...

মেঘ করে আসছে। জানলা দিয়ে দেখা যাচ্ছে আকাশের খানিকটা। পুঞ্জ পুঞ্জ ঘন নীল মেঘে ছেয়ে ফেলেছে চারিদিক। তাদের বাড়ির পাশে যে কদমগাছটা আছে, তার পুষ্পকেশরে কি রোমাঞ্চ জেগেছে। চারিদিক কি স্নিগ্ধ সুন্দর হয়ে আসছে। কি নিবিড়। সন্তপ্তানাং ত্বমসি শরণং তৎ পয়োদ প্রিয়ায়াঃ...হঠাৎ মেঘদূত মনে পড়ে গেল। ত্বমারূঢ়ং পবন পদবীমুদ্গৃহীতালকান্তাঃ

প্রেক্ষিষ্যন্তে পথিকবনিতাঃ প্রত্যয়াদাশ্বস্যত...আজও কি পথিকবনিতারা বিশ্বাসে আশ্বস্ত হয়ে অলকদাম উত্তোলন করে পবনপথারূঢ় আষাঢ়ের মেঘের দিকে চেয়ে থাকে...দেশের কি সে অবস্থা আছে এখন আর? অন্তরা কোথায় এখন কি করছে, কি ভাবছে, ডেপুটির গৃহিণী হয়ে সুখে আছে কি সে, তার মত মেয়ের পক্ষে থাকা সম্ভব কি, জড়োয়া গয়নার কথা তার স্বামী কি টের পেয়েছে?...

দপ্ করে ইলেক্‌ট্রিক আলো জ্বলে উঠল। "যাচ্ছি, যাচ্ছি, তোমারই কাছে যাচ্ছি, নানা বাধা-বিঘ্ন বহু জটিল পথ অতিক্রম করতে হচ্ছে, কিন্তু তোমার কাছে গিয়ে পৌঁছবই..."

অপরা-তড়িত পরা-তড়িতের কাছে যেতে যায়, তাই তো আলো জ্বলে, পাখা ঘোরে, এরোপ্লেন ওড়ে, রেডিও বাজে। তার এ আগ্রহ না থাকলে থেমে যেত সব। অংশুমানের মনে হল, এমনই এক-একটা আগ্রহের টানেই তো গড়ে উঠেছে এক-একটা সভ্যতা। স্বর্গের টানে বৈদিক, ব্রহ্মের টানে ঔপনিষদিক, নির্বাণের টানে বৌদ্ধ, প্রেমের টানে বৈষ্ণব, অপরা-তড়িতের টানেও তেমনই গড়ে উঠেছে বৈজ্ঞানিক সভ্যতা। অন্তরার টানে সেও হয়তো বড় কিছু একটা করবে। কিন্তু তখনই মনে হল, কতটুকু ক্ষমতা তার, কি করতে পারে সে!

"...যখন দাদোজীর সঙ্গে শিখরে দাঁড়িয়ে ভগবানের সমক্ষে আমি শপথ করেছিলাম যে, ভারতে হিন্দুরাজ্য স্থাপনের জন্য আমি প্রাণপণ করব, তখন আমার ক্ষমতা কতটুকু ছিল! তখন আমার বয়স আঠারো বছর মাত্র..."

সপ্তদশ শতাব্দীর স্তব্ধতা ভেদ করে ভেসে এল শিবাজীর কণ্ঠস্বর।

তুমি নয়, আমি নয়, জয়ী হয় ধর্ম। ধর্মের ধ্বজাবাহক আমরা, তাই আমাদের একমাত্র ভরসা। ধর্মই আমাদের একমাত্র শক্তি...

রাজদম্পতির প্রকাণ্ড যে তৈলচিত্রটা টাঙানো ছিল সামনে, তা অবলুপ্ত করে ফুটে উঠল ছত্রপতি শিবাজির ছবি, অশ্বারোহণে ছুটে চলেছেন শত্রুজয় করতে।

আর্তের কণ্ঠস্বর ভেসে আসছে।

শত্রুর কবলে মরণাপন্ন আমরা নিজেরই ঘরে বন্দী হয়ে আছি, শত্রুর প্রহরী পাহারা দিচ্ছে দ্বারে। অন্ন নেই, পানীয় নেই, কোথায় তুমি ত্রাণকর্তা, ছুটে এস...

ছুটে চলেছে মারহাট্টা বীর হাম্বীর রাও।

প্রচণ্ড শব্দে বজ্রপাত হল একটা...চমকে উঠল আদালত।

যাবই আমি।—কে যেন বজ্রকণ্ঠে বললে, অংশুমানের মনে হল।

আবেগ যদি প্রবল হয়, দুস্তর বাধাও চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায় নিমেষে।

অংশুমানের সমস্ত অন্তর পরিপূর্ণ হয়ে উঠল সহসা। অন্তরা, অন্তরা, কোথায় তুমি...? পরক্ষণেই লজ্জিত হয়ে পড়ল সে। পরস্ত্রীর সম্বন্ধে এ কি চিন্তা। এ কি ভাবছে সর্বদা, ছি ছি! কেন এ দুর্বলতা, কেন, কেন, কেন? এই দুর্বল চরিত্র নিয়ে কোন্ সাহসে এই কঠিন সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছি! এতটুকু মনের জোর নেই, যুঝব কি করে শেষ পর্যন্ত? এমন দুর্বল চরিত্র নিয়ে যুঝতে কি পেরেছে কেউ কখনও? সহসা শম্ভুজীর ছবিটা চোখের সামনে ফুটে উঠল—চরিত্রহীন মদ্যপ শম্ভুজী। ঔরঙ্গজেবের বন্দী শম্ভুজী। ইসলাম ধর্ম গ্রহণ না করলে মৃত্যু। রাজী হল না শম্ভুজী। ইসলাম নয়, মৃত্যুকেই বরণ করবে সে। একে একে চোখ উপড়ে নেওয়া হল, তপ্ত লোহার সাঁড়াশি দিয়ে টুকরো টুকরো করে ফেলা হল জিব। চরিত্রহীন মদ্যপটা বিচলিত হল না

তবু। শিবাজীর অযোগ্য পুত্র ছিল যে সারাজীবন মৃত্যুর সম্মুখীন হয়ে যোগ্যতা অর্জন করলে সে। অন্ধ শম্ভুজী যেন চেয়ে আছে তার দিকে, ঠোঁট দুটো নড়ে উঠল,... যেন বললে, তুমিও পারবে।

আপনি কি দেখেছিলেন?

ডেপুটি সাহেবকে মোটর থেকে জোর করে নামাচ্ছেন উনি।

আর কে ছিল?

অনেক লোক ছিল। আমিও ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে ছিলাম। দেখলাম, অংশুমানবাবু এগিয়ে গিয়ে ডেপুটি সাহেবের হাতটা চেপে ধরলেন।

সাক্ষীর পর সাক্ষী আসছে, যাচ্ছে।

সকলেরই মুখে এক কথা—স্বচক্ষে দেখেছি।

...আবার সেই নির্জন কারাগার।

সমস্ত মন অসাড় হয়ে গেছে। মনে হচ্ছে, সমস্ত জমে গেছে যেন ভিতরে। খটাৎ করে শব্দটা হতেই চমকে উঠল সে। জগদ্দল পাথরের মত অনড় অচল ভাষাহীন যে বোধটা নিদারুণ চাপে নিপীড়িত করছিলাম যাকে, সজাগভাবে যার স্বরূপ বিশ্লেষণ করবার উৎসাহ সে পায়নি এতক্ষণ, তালা-বন্ধ হওয়ার শব্দে ভেঙ্গে পড়ল সেটা যেন খানখান হয়ে, ছড়িয়ে পড়ল টুকরোগুলো প্রত্যক্ষ চেতনার সামনে। তার স্বরূপ অগোচর রইল না আর। সব দেশী লোক! জজ দেশী, দারোগা দেশী, পুলিশ দেশী, জেলার দেশী, দলে দলে তার নামে যারা মিথ্যে সাক্ষী দিয়ে গেল সব দেশী! সে নির্দোষ নয় তা ঠিক, কিন্তু এরা যা বলে গেল তা সব বানানো—একটা কথাও সত্য নয়। কিসের লোভে মিথ্যে কথা বললে এরা?

তুমিও তো সত্য কথা বলনি। তুমিও মিথ্যা কথা বলে চলেছ ক্রমাগত....

অদৃশ্য বিবেকের তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর শোনা গেল হঠাৎ। চমকে উঠল অংশুমান। নিক্তি ধরে এ লোকটা বসে আছে তো ঠিক, এত বিপর্যয়েও বিপর্যস্ত হয়নি একটুও। অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল ক্ষণিকের জন্যে। কিন্তু তা ক্ষণিকের জন্যেই। পর-মুহূর্তেই বলে উঠল, শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ। আমি মিছে কথা বলেছি বৃহৎ আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে, দুষ্টকে দমন করবার জন্যে, স্বদেশের স্বাধীনতা কামনায়। যুধিষ্ঠির থেকে আরম্ভ করে পৃথিবীর অনেক মহাপুরুষের জীবনেই এ রকম প্রবঞ্চনার উদাহরণ পাওয়া যাবে। নির্জন অন্ধকারে কথাগুলো অদ্ভুত শোনাল। জোরে বলার কোন দরকার ছিল না তো! পোড়া ডেপুটির মুখখানা চোখের উপর ভেসে উঠল আবার। দাম্ভিক, বর্বর, পাষণ্ড। কামুকও। শুধু যে কর্তব্যকর্মের অনুরোধে বাধ্য হয়ে নারীধর্ষণের হুকুম দিয়েছিল তা নয়, সেটা উপভোগও করেছিল। বহুবার-ধর্ষিতা একটি মেয়ের চেহারা মনে পড়ল। কি অসহায় করুণ দৃষ্টি তার চোখে! মুখে কথা নেই, দাঁড়াতে পারছে না ভালো করে। থরথর করে কাঁপছে, উত্তর দিচ্ছে না কারও কথার...শুনতে পাচ্ছে না বোধ হয়, চেয়ে আছে শুধু। মনে হল, শুধু একজন নয়, সারা দেশ জুড়ে সহস্র সহস্র নারী যেন চেয়ে আছে তার দিকে। এই সব অসহায় মূক-বধিরদের মুখে ভাষা দেবে কে? অসংখ্য রক্তকণা তাণ্ডব নৃত্য শুরু করছে সারা

দেহে...অগ্নির ঝড় বইছে মাথার ভিতর। ন্যায়পরায়ণ বিবেক কোথায় উড়ে গেল সেই ঝঞ্ঝায়! আচ্ছন্নের মত পড়ে রইল অংশুমান। সমস্ত চেতনা জুড়ে একটি কথাই স্পন্দিত হতে লাগল বারম্বার—এই সব অসহায় মূক-বধিরদের মুখে ভাষা দেবে কে?... আমি কি পারব?

না পারবার কি আছে।

হাস্যপ্রদীপ্ত একখানি মুখ ফুটে উঠল চোখের সামনে। অন্ধকার স্বচ্ছ হয়ে গেল। প্রদীপ্ত চোখদুটি থেকে জ্যোতি বিচ্ছুরিত হচ্ছে। ধপধপে সাদা দাড়ি, সাদা চুল, সাদা ভুরু। সমস্ত মুখে কিন্তু ফুটে রয়েছে যৌবনের জয়শ্রী। তারুণ্যের তিলক জ্বলজ্বল করছে প্রশস্ত ললাটের মধ্যস্থলে অদৃশ্য অগ্নিশিখার মত।

মূক-বধিরদের নিয়ে অনেক কাল কাটিয়েছি। তাদের মুখে ভাষা দেওয়া সহজ। তারা জীবন্ত, তারা কথা কইতে উৎসুক। তার চেয়েও শক্ত কাজ আমি করেছি, জড়-লোহাকে কথা কইয়েছি বিদ্যুতের স্পর্শ দিয়ে। মড়ার কান চিরে যখন দেখলাম যে, সামান্য একটা পর্দার কম্পনই শ্রুতির কারণ, তখন মনে হল, লোহার পাতলা পর্দায় সে কম্পন সঞ্চার করা অসম্ভব হবে কেন বিদ্যুতের স্পর্শ দিয়ে? লেগে গেলুম...

হাসিমুখে চেয়ে রইলেন। পর-মুহূর্তেই কিন্তু ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হয়ে উঠল।

ওই দেখ, স্বভাব না যায় মলে! এখনও মনে হচ্ছে, আমি করেছি। পড়েইছ তো, আসলে ব্যাপারটা ভূতুড়ে কাণ্ডের মত অদ্ভুত! ওয়াট্‌সনের ট্রান্‌স্‌মিটিং স্প্রিং একটা বিগড়ে গেল, সে সেটা নিয়ে টানাটানি শুরু করতেই আমি পাশের ঘরে শব্দ শুনতে পেলাম। তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে দেখি, মেক-ব্রেক পয়েন্ট দুটো জুড়ে গেছে।

ব্যাস্, টেলিফোন আবিষ্কারের খেই পেয়ে গেলাম! কি করে জুড়ল, ঠিক ওই সময় জুড়ল কেন, আমারই বা কানে গেল কেন—সেইটেই রহস্য এবং সেইটেই বোধ হয় আবিষ্কারের আসল কারণ। সে যাক, কিন্তু there's a lesson for you রহস্যটা নয়, ওয়াট্‌সনের ওই গোলমাল করে ফেলাটা—অপ্রত্যাশিতভাবে স্প্রিঙের মেক-ব্রেক পয়েন্ট দুটো জুড়ে যাওয়াটা। প্ল্যান করে বড় কিছু প্রায়ই হয় না, গোলযোগের মধ্যেই অদ্ভুত যোগাযোগ হয়ে যায়। হিমালয় বা প্রশান্ত মহাসাগর কোন ইঞ্জিনিয়ার প্ল্যান করে করতে পারত না। সুতরাং বিদ্রোহ করে দেশে বিশৃঙ্খলা এনেছে বলে তোমাদের খুব বেশি লজ্জিত হবার কারণ নেই। বহু বৈজ্ঞানিক বহু বহু বুদ্ধি খাটিয়ে যে সমুদ্রে পুল বাঁধতে পারে না, সেই সমুদ্র একদিনে শুকিয়ে যেতে পারে খামখেয়ালী ভূমিকম্পের ধাক্কায়, মানে....well, I did not like to talk, but I am talking like a parrot.....

হঠাৎ থেমে পিছনে দু'হাত দিয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন সারা ঘরময়। অস্থির যে যুবক একদা বোস্টন ইউনিভার্সিটিতে ভোকাল ফিজিওলজির অধ্যাপক ছিল, সে-ই যেন আবার মূর্ত হয়ে উঠল বৃদ্ধ গ্রেহাম বেলের মধ্যে। হঠাৎ তিনি দু'হাত দিয়ে মাথার চুল মুঠি করে ধরে ঘরের মেঝের দিকে চেয়ে রইলেন। অংশুমানের মনে হল, কি যেন খুঁজছেন তিনি।

আপনি খুঁজছেন নাকি কিছু?

হ্যাঁ, শান্তি। আলো নয়, অন্ধকার। শব্দ নয়, নৈঃশব্দ্য। জীবনের শেষে ঘর থেকে টেলিফোন দূর করে দিয়েছিলাম আমি। It is a nuisance...... এখন দেখছি, চিন্তার ডাকেও সাড়া দিতে হয়। There is no escape....

তারপর হেসে বললেন, তোমাকে আমার মত হতে বলছি না তা বলে। হতে পারবেও না। সেলেনিয়মের উপর আলো পড়লে তার রেজিস্ট্যান্স্ যেমন বদলে যায়, তোমার মনের উপরও তেমনই পড়ছে প্রেরণার আলো। নানা রকম কারেন্ট পাস করবে এখন। আমার ফোটোফোনের কথা পড়েছ তো, তার নয়—আলোর রেখা বার্তা বহন করেছিল, মনে আছে?

আছে।

তোমার মনের ওপরই তেমনই ভেঙ্গে পড়েছে অসংখ্য আলোর অসংখ্য রকম তরঙ্গ। অসহায় সোলার টুকরোর মত ভেসে বেড়াও এখন নানা তরঙ্গের শিখরে শিখরে। ডুবতে হবে, উঠতে হবে, ভাসতে হবে। ওর থেকেই কিছু একটা হয়ে উঠবে হয়তো, যদি হবার হয়। ভেবে চিন্তে প্ল্যান করে কিছু হবে না। বার্তা বহন করে যাও ক্রমাগত, ঠিক-বেঠিক যা হোক....আঃ, সিকেনিং!

সমস্ত মুখ বিরক্তিতে ভরে গিয়ে হাস্যোদ্দীপ্ত হয়ে উঠল আবার পর-মুহূর্তেই। যেন সামলে নিলেন।

এই এখন তোমার একমাত্র কাজ; মূক-বধিরদের নিয়ে মাথা ঘামাও যদি, এ ছাড়া গত্যন্তর নেই। Carry on...আমি চলি। আমাকে আর ডেকো না...please I want peace, nothing but peace, Good night.

চলে গেলেন।

অংশুমান বিস্মিত হয়ে বসে রইল।

প্ল্যান করে কিছু হবে না?...

....গ্যাল্‌ভানি, অর্‌স্টেড, বেকেরেল, রণ্ট্‌গ্যেন...সারি সারি আরও অনেকে এসে দাঁড়ালেন। সকলেরই চোখে সকৌতুক দৃষ্টি। এঁদের প্রত্যেকেরই আবিষ্কার যুগান্তকারী, কিন্তু প্রত্যেকটা আবিষ্কারই আকস্মিক। সকৌতুক দৃষ্টিতে নীরবে এই তথ্যটুকু নিবেদন করে অদৃশ্য হয়ে গেলেন সবাই আবার....

কারাগারের সূচীভেদ্য অন্ধকার গাঢ়তর হয়ে উঠল। প্ল্যান করে কিছু হবে না? আমাদের এই যে এত বছরের এত প্ল্যান, এর কি মূল্য নেই কোনও? সব বিদ্রোহের মূলেই তো প্ল্যান থাকে। রাশিয়ার ফাইভ ইয়ার্স প্ল্যান....বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার আর রাজনীতি এক নয়...গুলিয়ে ফেলছি আমি....বিজ্ঞান...

যে-কোনও বিষয়ের সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞানের নামই বিজ্ঞান।

অংশুমান ফিরে দেখলে, নির্নিমেষ এক জোড়া চোখ তার দিকে চেয়ে আছে। বিরাট শ্মশ্রুসমন্বিত গম্ভীর মুখ। অনড় নিস্পন্দ। ক্লার্ক ম্যাক্‌স্‌ওয়েল।

যে-কোনও বিষয়ের জ্ঞানের নামই বিজ্ঞান। কোনও নীতিই বিজ্ঞানের বহির্ভূত নয়, রাজনীতিও নয়। জ্ঞানমাত্রেই নিয়মের অধীন, পৃথিবীতে অনিয়ম বলে কিছু নেই। যা অনিয়ম বলে মনে হয়, আসলে তা জ্ঞানের অভাব, পর্যবেক্ষণ-শক্তির অপটুতা। নেপচুনকে দেখবার ঢের আগে অ্যাডাম্‌স্ তার অস্তিত্বের সন্ধান পেয়েছিলেন, হ্যালি ভবিষ্যবাণী করেছিলেন ধূমকেতুর পুনরার্বিভাবের, অনেক ধাতু আবিষ্কৃত হবার পূর্বেই তাদের অস্তিত্ব নির্দেশ করতে পেরেছেন বৈজ্ঞানিক মলিকিউলার ওয়েট থেকে। কি করে সম্ভব হল এসব? অঙ্ক কষে। সমস্ত বিশ্বব্যাপার

নিয়ন্ত্রিত বলেই অঙ্ক কষে ইলেকট্রো-ম্যাগ্‌নেটিক ওয়েভের কথা আমি বলতে পেরেছিলাম, হারৎজ্ হাতে-কলমে সেট প্রমাণ করলেন অনেক পরে। পৃথিবীতে বিশৃঙ্খল কিছু নেই, থাকতে পারে না। মিস্টার বেলের ভূতুড়ে কাণ্ডটাও বৈজ্ঞানিক নিয়ম অনুসারেই ঘটেছিল। আমি আইনজ্ঞ উকিলের ছেলে, বে-আইনী কথা মানি না। মিস্টার বেলের কথায় দমে যাবার দরকার নেই, সহস্র উদাহরণ দিয়ে প্রমাণ করে দেওয়া যায় যে, একটা বিশেষ নিয়ম অনুসরণ করে প্ল্যান অনুযায়ী যাঁরা ঠিকমত চলতে পেরেছেন, তাঁরা অনেক বড় কাজ করতে পেরেছেন পৃথিবীতে। তার পর একটু ভেবে বললেন, এই ধর না যেমন আল্‌ভা এডিসন। ওই বেলের টেলিফোনেরই কত উন্নতি করেছেন তিনি, গ্রামোফোন বানিয়েছেন, ইলেক্‌ট্রিক বাল্‌ব্ তৈরি করেছেন, আরও কত কি করেছেন.....

কি বলছ আমার নামে?

আল্‌ভা এডিসন এসে দাঁড়ালেন। গোঁফ-দাড়ি নেই, ভারী মুখ, চোখের দৃষ্টিতে সপ্রশ্ন কৌতুক, বলিষ্ঠ নাকটা নীরবে যেন লোকটার ব্যক্তিত্ব ঘোষণা করছে। এডিসনের আবির্ভাবে ম্যাক্‌স্‌ওয়েলের চোখে মুখে প্রাণ সঞ্চার হল যেন। এতক্ষণ তাঁকে মূর্তিমান নিয়ম বলে মনে হচ্ছিল। একটু সসম্ভ্রমে তিনি বললেন, মিস্টার বেল এই ছেলেটিকে একটু দ্বিধাগ্রস্ত করে গেছেন। বলে গেছেন যে, প্ল্যান-ট্‌ল্যান করে কিছু হবে না, ঘটনার ঘূর্ণাবর্তে একটা কিছু আপনিই ঘটে উঠবে। আমি তাই একে বলেছিলাম যে, ঘূর্ণাবর্তও বিশৃঙ্খল ব্যাপার নয়, তাও বিশেষ বিশেষ বাঁধা-ধরা নিয়মের অধীন। সেই নিয়মগুলো আগে থাকতে জেনে নিয়ে যদি ঘূর্ণাবর্ত সৃষ্টি করা যায়, তা হলে সুবিধাই হয়, ফলাফল আগে থাকতে আন্দাজ করা যায়। এবং সেটা সম্ভব। সেই সূত্রেই আপনার কথা উঠেছিল। আমার মনে হয়, আপনার প্রত্যেকটি কাজ আপনি বেশ প্ল্যান করে করেছেন। আপনার বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির সঙ্গে কল্পনার এমন জুসই যোগাযোগ দেখলে মনে হয় যে, অনেক ভেবেচিন্তে করেছেন সব। তাই এত করা সম্ভবও হয়েছে আপনার পক্ষে—নয়?

ম্যাক্‌স্‌ওয়েলের কণ্ঠস্বর শ্রদ্ধায় গদগদ হয়ে উঠল।

এডিসন হেসে বললেন, আমার কি মনে হয় জান, গার্ডের হাতের চড় খেয়ে সেই যে আমি কালা হয়ে গেলাম, তাই আমার উন্নতির কারণ। তার পর যতদিন বেঁচে ছিলাম, বাইরের কিছু শুনতে পেতাম না, একাগ্র হওয়ার সুযোগ পেয়েছিলাম.....

দেখা গেল, ম্যাক্‌স্‌ওয়েল এডিসনের জীবনের এ ঘটনাটা জানতেন না। চড় মেরেছিল? আপনাকে? কোন্ গার্ড? কেন?...

রেলের গার্ড। ও, তুমি জান না বুঝি? গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রেলে আমি একটা খবরের কাগজ ছেপে বিক্রি করতাম। অবসর-সময়ে সেই ট্রেনেই সময় কাটাতাম কেমিস্ট্রির এক্‌স্‌পেরিমেণ্ট করে। একদিন একটা ফস্‌ফরাসের জার পড়ে গিয়ে ট্রেনে লেগে গেল আগুন। গার্ড ট্রেন থামিয়ে কানের উপর প্রচণ্ড একটি চপেটাঘাত করে দূর করে দিলে আমায়। কানের ড্রামটি ফেটে কালা হয়ে গেলাম জন্মের মত। এখন অবশ্য শুনতে পাই, কারণ সে দেহটা তো এখন আর নেই। একটু হাসলেন, তার পর বললেন, এটা অবশ্য ঠিক যে, সত্যের প্রতি একাগ্র না হলে সে ধরা দেয় না কিছুতে। বধির হয়েছিলাম বলেই একাগ্রতা বেড়েছিল, অন্যমনস্ক হবার সুযোগ ছিল না। আমার বধিরতার কারণ গার্ডের চপেটাঘাত, তার কারণ ফস্‌ফরাসের জার পড়ে যাওয়া,

তার কারণ বোধ হয় ট্রেনের ঝাঁকানি এবং আমার অসাবধানতা—কোন্‌টা যে আসল কারণ তা কি করে বলি, বল?—দুষ্টুমি-ভরা হাসিতে চোখ দুটি প্রদীপ্ত হয়ে উঠল।

আসল কারণ অবসর-সময়ে আপনার কেমিষ্ট্রি অধ্যয়নের আগ্রহ।—সসম্ভ্রমে বললেন ক্লার্ক ম্যাক্‌স্‌ওয়েল।

এডিসন চুপ করে রইলেন স্মিতমুখে। তার পর বললেন, হ্যাঁ, সত্যকে জানবার আগ্রহটাই আসল জিনিস। সেই আগ্রহই নানা জনকে নানা নিয়মে নিয়ন্ত্রিত করে...

এডিসনের মুখে ''নিয়ন্ত্রিত'' কথাটা শুনে ম্যাক্‌স্‌ওয়েল পুলকিত হয়ে উঠলেন। অংশুমানের দিকে চেয়ে বললেন, শুনলে? নিয়ন্ত্রিত না হয়ে উপায় নেই। নিয়মই সত্য, সত্যই নিয়ম। এ কথা মনে রাখলে মনে জোর পাবে। অনিয়ম সত্য নয়, বিশৃঙ্খলা শৃঙ্খলারই মিথ্যা রূপ। সত্য নিয়মের পরাধীনতাই সত্য স্বাধীনতা। সত্যকেই আঁকড়ে থাক এবং কি করে তা পারবে তার উপায় চিন্তা কর প্রতি মুহূর্তে। এরই নাম প্ল্যান....

হঠাৎ জেলের প্যাগলা ঘণ্টাটা বেজে উঠল। সাড়া পড়ে গেল চতুর্দিকে।

মারো—মারো—মারো....

ওপর-ওলার হুকুমে কংগ্রেসী কয়েদীদের মারা হচ্ছে ঘরে ঢুকে ঢুকে। আর্তনাদ উঠতে লাগল অন্ধকার ভেদ করে। অংশুমানের ঘরের কপাটটা খুলে গেল। ব্যাটন হাতে ঢুকল পুলিস।

।। তেরো ।।

নিজের বৈঠকখানায় লাহিড়ী মশাই চিন্তিত মুখে তামাক টানছিলেন। ছেলের চাকরির জন্য যে দরখাস্তটি করেছিলেন, তা নামঞ্জুর হয়েছে। অনেক তদ্বির করেছিলেন, তবু হল না। আপিসের বড়বাবু তাঁর বন্ধু, তাঁরই মাধ্যমে চেষ্টা করেছিলেন। একটু আগে বড়বাবু নিজে এসে বলে গেলেন—না হওয়ার আসল কারণ, সায়েব টের পেয়েছে অংশুমানের সঙ্গে ছেলের বন্ধুত্ব ছিল। ছিল, অস্বীকার করবার উপায় নেই। হতভাগা ছোঁড়াটা পাড়াসুদ্ধ সবাইকে মজিয়ে গেছে। আঃ! চাকরি তো হলই না, এখন পুলিসে না ধরলে বাঁচি। পেন্‌শনটি সম্বল, সেটা বন্ধ করে দিলেই—ব্যস্‌। হুঁকোর ঘন ঘন টান দিতে লাগলেন, ধূমাচ্ছন্ন হয়ে গেল চারিপাশ, রগের শিরগুলো ফুলে উঠল, চোখ দুটো মনে হল ঠিকরে বেরিয়ে আসবে এখুনি। বন্ধু পীতাম্বর প্রবেশ করলেন। গেঁটে-বাতওলা পাকা বুড়ো।

ওহে, খবর শুনেছ?

কিসের খবর?

রামতারণের মেয়ের বিয়ের সম্বন্ধ প্রায় পাকা করে এনেছিলাম, কিন্তু হল না।

কেন?

রামতারণের মেয়েই বেঁকে দাঁড়িয়েছে। বলছে, পুলিসের দারোগাকে বিয়ে করব না।

অ্যাঁ, বল কি?

হ্যাঁ হে। অতি ভয়ঙ্কর কাল এসে পড়ল, বোয়েছ?

খোঁড়াচ্ছ কেন?

হাঁটুর ব্যথাটা বেড়েছে। কদিন থেকে সমানে পূবে হাওয়া যা চালিয়েছে! ভাবলাম, বসে বসে কি আর করি, লাহিড়ীর সঙ্গে একদান পাশা খেলে আসা যাক। তামাক রাখ, পাশাটা পাড়।

লাহিড়ী পাশা পাড়লেন। গোমড়া মুখ করে দুজনে পাশা খেলতে লাগলেন। বাড়ির সামনে একটা গাছে অজস্র জবাফুল ফুটে ছিল, তারাই হাসতে লাগল কেবল।

।। চৌদ্দ।।

একটা মাসিক-পত্র টেবিলের উপর পড়ে ছিল। মলাটের উপরই প্রকাণ্ড একটা সাবানের বিজ্ঞাপন। একটি নারী তার প্রস্ফুটিত যৌবনকে লীলায়িত করে আবক্র ভঙ্গীতে বসে আছে। নীচে রবীন্দ্রনাথের দু লাইন কবিতা। অন্তরা কাগজটা হাতে করে ছবিটার দিকে চেয়ে বসে ছিল চুপ করে। চেয়ে বসে ছিল, দেখছিল না। যখন দেখল, তখন সারা মন বিরক্তিতে ভরে উঠল। নারীদেহের এই মাংসপিণ্ডগুলোকে যে-কোন অজুহাতে যখন-তখন সকলের চোখের সামনে তুলে ধরতে লজ্জাও করে না! পুরুষদের হয়তো করে না, তারা ওই হয়তো লুব্ধ-দৃষ্টিতে দেখতে চায়; কিন্তু মেয়েদেরও কি করে না? করে না বোধ হয়। কই, এ বিষয়ে কোনও নারীর প্রতিবাদ তো চোখে পড়েনি আজ পর্যন্ত! তারা বোধ হয় এর সমর্থনই করে। করাই স্বাভাবিক, ব্যবসাদার যেমন তার মাল বিজ্ঞাপিত করতে চায়...ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হয়ে উঠল অন্তরার। তাড়াতাড়ি মাসিক-পত্রিকার পাতাগুলো গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত উলটে গেল একবার। আবার শেষ থেকে গোড়া পর্যন্ত। তারপর বিতৃষ্ণাভরে সরিয়ে রেখে দিলে সেটা। সদ্য-আসা মাসিক পত্রের মোড়কটা পড়ে ছিল সামনে, সেটাকে অকারণে কুচিকুচি করলে অনেকক্ষণ ধরে। প্রত্যেকটি কুচি পাকিয়ে পাকিয়ে লুফল খানিকক্ষণ। আয়নার সামনে দাঁড়াল তার পর। চুলটা একটু ঠিক করে নিলে। হঠাৎ নজরে পড়ল, ডান কানের দুলটা এখনও বেঁকে আছে একটু...স্যাঁকরাটা ঠিকমত জুড়তে পারেনি...দুলটা কেন ছিঁড়েছিল অনিবার্যভাবে সে কথাটাও মনে পড়ল। কিন্তু সেটাকে সে আমল দিলে না কিছুতেই, জোর করে সরিয়ে দিলে মন থেকে। ও কথা নয়, সে অন্য কথা ভাবতে চায়, অন্য কিছু, যা হোক কিছু। একটা কথা মনে পড়াতে সে বেঁচে গেল।

রামধন!

আজ্ঞে?

ভৃত্য রামধন দ্বারপ্রান্তে এসে হাজির হল।

কই, বাজারের হিসেবটা দিলে না?

এই যে মা, নিন না। চার আনার আলু এনেছি, দু পয়সার সিম, আর আধ সের বেগুন তিন আনার....

পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে হিসাব নিতে লাগল অন্তরা প্রত্যেকটি জিনিসের দর করে, প্রত্যেকটি জিনিস ওজন করে। অবাক হয়ে গেল রামধন। কোনদিন তো এমন করেন না, আজ হল কি। তার আত্মসম্মান আহত হল একটু, কিন্তু কি বলবে! পুলকিতও হল, যখন হিসেবে কোন খুঁত ধরতে না পেরে বকশিশ পেলে চার আনা। মজ্জমান ব্যক্তি যেমন কাঠের টুকরোটাকে তুচ্ছ জেনেও প্রাণপণে আঁকড়ে থাকতে চায়, রামধন-প্রসঙ্গটাও তেমনই কিছুতেই শেষ হতে দিতে চাইছিল না অন্তরা।

লাক্স সাবান বড় প্যাকেট পেলে না একেবারে? বাবুর নাম করেছিলে?

বাবুর নাম করলে ছোট প্যাকেটও পাওয়া যেত না মা। কোনও 'অপসর'কে কোন জিনিস দিতে চায় নাকি সহজে আজকাল। যেটুকু দেয় কারে পড়ে। আমাদের দেখলেই সরিয়ে ফেলে সব, বলে—বিক্রি হয়ে গেছে। হরিয়াকে দিয়ে কিনিয়েছি এটা...

হরিয়া স্থানীয় শশীবাবুর চাকর। শশীবাবু মধ্যবিত্ত গৃহস্থ। সরকারী ডেপুটি নন। কথাটা বলেই রামধন অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছিল। তখনই সামলে নিয়ে বললে, আমাদের বাবুকে তবু ভালোবাসে অনেকে, তাই আমরা কিছু কিছু পাই। এস. ডি. ও সাহেবের চাপরাসীকে দেখলে তো—। রামধন ভ্রূযুগল উত্তোলন করে প্রকাশ করলে বাকিটা। এই সামান্য কথার ধাক্কায় অন্তরা ছিটকে গিয়ে পড়েছিল, যেখানে তা লক্ষ অপমানের তীক্ষ্ণ কণ্টকে সমাকীর্ণ,—বহু কাঁটা একসঙ্গে বিঁধল সর্বাঙ্গে। অন্তরার মুখের পেশী কিন্তু বিচলিত হল না একটু। অমানুষিক শক্তিবলে কণ্ঠস্বরে অনাবশ্যক আবদারের সুর ঢেলে সে বললে, একটু গরম জল কর না তা হলে লক্ষ্মীটি। সিল্কের শাড়ি একখানা কাচতে হবে। রামধন চলে গেল গরম জল করতে। নূতন একটা সমস্যা সৃষ্ট হওয়াতে খুশি হল অন্তরা। কোন্ শাড়িটা কাচতে হবে, সেটা নির্বাচন করা যাক এবার...একটাও ময়লা হয়নি তেমন...তবু বেছে বার করতে হবে একটা। সময় কাটাবে।...

...ছোট একটি ঘর। জানলা নেই। ছোট ছোট ঘুলঘুলি। তাও লোহার জাল দেওয়া। কপাট বন্ধ। লোহার গরাদে দেওয়া মজবুত কপাট...সশস্ত্র প্রহরী পাহারা দিচ্ছে...অন্ধকার ঘরে একা চুপ্ করে বসে আছে সে....মুখময় গোঁফদাড়ি, পরনে কয়েদীর পোশাক। চোখ দুটো জ্বলছে, মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা....

মাথায় ব্যাণ্ডেজ কেন?—কথাগুলো উচ্চারণ করেই অন্তরা আত্মস্থ হল। শাড়ির স্তূপ সামনে রেখে কি ছবি সে দেখছিল এতক্ষণ! হঠাৎ ব্যাণ্ডেজ বাঁধা দেখলে কেন? জেলে মারধোর করছে নাকি? কই, কোন খবর তো পাইনি! তবে? স্পষ্ট দেখতে পেলে! কেমন করে? ক্লেয়ারভয়েন্স? না, ওসব গাঁজাখুরিতে বিশ্বাস নেই তার। শাড়ির দিকে মন দিতে চেষ্টা করলে আবার। দুরন্ত বন্যা! তবু বাঁধ দিতেই হবে একটা যেমন করে হোক। ভেসে যেতে হবে তা না হলে অকূলে। ভয় করে...। সমাজের ভয় নয়, গুরুজনের ভয় নয়, কেমন একটা নামহীন ভয়! গড়ে-তোলা পারিপার্শ্বিককে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে অভ্যস্ত জীবনকে বিপর্যস্ত করে দিয়ে কোথায় যাবে সে অনিশ্চিত কোন্ পথে? ভয় বাইরে নয়, নিজের মধ্যেই। নীড়বিলাসী অন্তরাত্মা ঝঞ্ঝার আভাস পেলেই পক্ষ সঙ্কুচিত করে চোখ বুজে বসে থাকতে চায় নীড়ের মধ্যে, তা যত তুচ্ছ হোক না সে নীড়। নিশ্চিন্ত আরামই তার কাম্য। এমন কি পরাধীনতার আরামও। পরাধীনতার আরামও চায় সে? বেণী-দোলানো এক কিশোরী গ্রীবাভঙ্গী করে বলে উঠল মনের মধ্যে, কক্ষনো নয়। অনাবিল স্বাধীনতার পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বের মধ্যে যে আরাম, তাই চাই আমি। সে স্বাধীনতা কোথায়, সে মনুষ্যত্বের অর্থ কি, খুঁজে বার কর সেটা। ঝুটো জিনিসও কখনও চাইনি, কখনও নেব না...বেণী-দোলানো কিশোরীটির দিকে নিষ্পলক দৃষ্টিতে চেয়ে রইল অন্তরা। তার নিজেরই পূর্বরূপ...বয়ঃসন্ধির সেই অপরূপ ছবিটা এখনও মরেনি নাকি...এখনও বেঁচে আছে অবুঝটা। কোন্ স্বপ্নলোকে? সহসা মনে হল, ওই সত্য, স্বপ্নই সত্য। বাকি সব মিথ্যা। স্বাধীনতা কি...মনুষ্যত্ব কি?

অতীতের দিনগুলো এলোমেলোভাবে মনে পড়ল। মা-বাবা ভাই-বোন জামা-কাপড় ফ্রক-

ব্লাউজ টেপ-তেল চিরুনি-স্নো বই-খাতা স্কুলমাস্টার-মাস্টারনী বান্ধব-বান্ধবী চিঠি-প্রেম—এই সমস্তকে কেন্দ্র করে জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে তার সমস্ত সত্তা যে ছন্দে আবর্তিত হয়েছে, তা স্বাধীনতারই ছন্দ। নিজের মতে নিজের পছন্দ অনুসারে সব চেয়েছে যে। সব মানুষই তাই চায়। স্বাধীনতা মানেই মনুষ্যত্ব, মনুষ্যত্ব মানেই স্বাধীনতা। মানুষের অন্তর্নিহিত প্রবৃত্তি এটা। শৈশব থেকেই মানুষ পার হতে চায় গণ্ডি, লঙ্ঘন করতে চায় বাধা, অমান্য করতে চায় বারণ। এটা করো না, ওখানে যেও না...অনাদি কাল থেকে হিতৈষীর গুরুজনেরা বারণ করেছেন আর অনাদি কাল থেকে অবাধ্য শিশুরা তা অমান্য করেছে। দুষ্কর্ম করতেও তার প্রবৃত্তি। সে ঠেকে শেখে, ঠেকে শেখবার স্বাধীনতাই সে চায়। তারই বাধা সে চূর্ণ করেছে যুগে যুগে, বাধা হিতকর হলেও চূর্ণ করেছে, চূর্ণ করে মরেছে, তবু থামেনি। পুরাতনকে ওলটপালট করে সে আধুনিক হতে চেয়েছে বারম্বার। মানবজাতির এই ইতিহাস। প্রকৃতির নিয়মনিগড়ে বাঁধা থাকেনি সে। শীতাতপের নির্যাতন সহ্য করেনি, গৃহ নির্মাণ করেছে, অগ্নি আবিষ্কার করেছে, বিজ্ঞানকে কাজে লাগিয়েছে নিত্য নব উদ্ভাবনী শক্তির সাহায্যে। দূরত্বের বাধা, সময়ের বাধাও সরিয়েছে সে। আকাশ-যান, বেতার -বার্তা, অণুবীক্ষণ, দূরবীক্ষণ..মানবসভ্যতার প্রগতি বাধা-অপসারণের ইতিহাস। মানুষ এও আবিষ্কার করেছে যে, আসল বন্ধন বাইরে নয়, কঠিনতম বন্ধন নিজেরই মধ্যে,—ষড় রিপুর বন্ধন। তাও ছিন্ন করে মানুষ মুক্ত হতে চেয়েছে কঠোর কৃচ্ছ্র সাধন করে। সে মুক্তি চায়, স্বাধীনতা চায়,—স্বাধীনতাই মনুষ্যত্বের লক্ষণ।...মাথায় ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা কেন দেখলাম...স্বাধীনতা-চিন্তার স্রোতকে ব্যাহত করে প্রশ্নটা মনে জাগল আবার...

মা গরম জল হয়ে গেছে।

খুব বেশি গরম করনি তো? চল, দেখি।

সাড়ম্বরে শাড়িটা সাবান দিয়ে ভিজিয়ে দিতে লাগল।

...ভয় করে...হ্যাঁ, ভয় করে সত্যিই! কিন্তু ভয়ের সঙ্গে কৌতূহলও কি নেই? অতল গহ্বরটার দিকে চকিতে একবার চেয়ে দেখলে....

...ঘূর্ণিপাকের তাণ্ডব চলেছে ওর তলায়...সমুদ্র-মন্থন...ওর মাঝখানে ঝাঁপিয়ে পড়তে কৌতূহল হয় বইকি...আত্মঘাতী কৌতূহল....

পিপারমেণ্ট আছে আপনার কাছে?

মুন্সেফবাবুর দশ বছরের মেয়ে রেখা এসেছে। ছিমছাম পোশাক-পরা মেয়েটি। মাথার চুল বব করা। এর মধ্যেই চোখের দৃষ্টিতে বয়সের ছাপ লেগেছে। সরলতা নেই। কথায় কথায় চোখ নিচু করে....

পিপারমেণ্ট? আছে বোধ হয়। দাঁড়াও, দেখি।

সময় কাটাবার আর একটা অজুহাত পেয়ে বেঁচে গেল। তন্নতন্ন করে আলমারিটা খুঁজলে নিপুণভাবে, তার পর এ-কৌটো সে-কৌটো, এ-তাক সে-তাক....অনেকক্ষণ পরে পাওয়া গেল শেষকালে।

বেশি নয়, একটুখানি আছে।

ওমা, তুমি এক জায়গায় দাঁড়িয়েই আছ সেই থেকে?

মেয়েটি কিছু না বলে চোখ দুটি নিচু করলে শুধু।

কি হবে পিপারমেন্ট?

মা পান দিয়ে খাবে।

মৃদুস্বরে কথা কটি বলে পিপারমেন্ট নিয়ে চলে গেল মেয়েটি।

অন্তরা আর একবার বসল টেবিলে। আর একবার মাসিক-পত্রখানা ওলটালে। গল্প পড়বার চেষ্টা করলে একটা। বিস্বাদ। কবিতা আরও বিস্বাদ।....উঠে দাঁড়াল। জানলার শার্সির একটা ফাটা কাচ জোড়া হয়েছিল পুরানো চিঠি দিয়ে। সেইটে পড়ল খানিকক্ষণ ঘাড় বেঁকিয়ে।.....দূর-সম্পর্কের এক আত্মীয়ার চিঠি....বিধবা...চেহারাটা মনে পড়ল..... গোলগাল ফরসা বেঁটে হাসিখুশি মানুষটি। নিজের দুর্ভাগ্যকে অতি সহজভাবে মেনে নিয়ে ঠেলে সরিয়ে রেখেছেন সেটাকে, তা দিয়ে জীবনের স্রোতকে অবরুদ্ধ করেননি...আনন্দের ধারা বইছে অবারিতভাবে, চোখে মুখে কথায় হাসি উপচে পড়ছে তার, অথচ কোনও আতিশয্য নেই, সহজ সুন্দর আনন্দ। ''জীবন'' বলতে পাশ্চাত্য ধরনে আমরা যে পশুজীবন বুঝি, তার কোন আস্ফালন নেই। সেটা প্রায় নিশ্চিহ্ন। এক বেলা আহার, পরনে থান, কখন ঘুমোন কখন জাগেন—কেউ জানতে পারে না, মৈথুনের সঙ্গে সম্পর্ক চুকেই গেছে, ও-কথা ভাবেনও না বোধ হয়। আধুনিক অর্থে শিক্ষা বলতে যা বোঝায় তা মোটেই নেই, একেবারে নিরক্ষর। আধুনিক মাপকাঠিতে এত ছোট যে মানুষটি, সে কিন্তু যেখানে থাকে সেখানটা পরিপূর্ণ করে রাখে, সুরভিত হয়ে ওঠে চারিদিক। আধুনিকমনা অন্তরা দূর-সম্পর্কের এই দুর্গাদিদির সঙ্গ পাবার জন্যে লোলুপ হয়ে উঠল মনে মনে। দুর্গাদিদিকে কাছে পেলে সব কথা খুলে বলা যেত হয়তো, তিনি হয়তো বুঝতেন তার কথা। কোথায় আছেন এখন.....অনেক দিন আগে এসেছিলেন একবার...ফিরে গিয়ে দীর্ঘ চিঠি লিখেছিলেন, মানে লিখিয়েছিলেন পাড়ার একটি ছেলেকে দিয়ে...উত্তর দেওয়া হয়নি। ...কাটা কাচের সবটা জোড়া যায়নি কাগজ দিয়ে....চিড়-খাওয়া খানিকটা অংশে সূর্যালোকে রঙ ধরেছে... গৈরিক রেখার পাশে অতিসরু রক্তের আভাস কাঁপছে থরথর করে....বাইরে নিস্তব্ধ দ্বিপ্রহর....

ভারতবর্ষের নির্ভীক আত্মার সত্য-রূপটি ওরই মধ্যে পরিস্ফুট হয়েছে। তর্কের বিষয় নয়, জানি। অনুভব করছি। হ্যাট-কোট-প্যান্ট-নেকটাই-পরা বিদেশী-বুলি-মুখস্থ-করা চাকরের দল ভারতে জন্মেছে বলেই কি ভারতীয় ওরা? তিলক-ফোঁটা কেটে টিকিনামাবলী উড়িয়ে সংস্কৃত মুখস্থ বুলি আওড়াচ্ছে যে আর এক-জাতীয় তোতাপাখির দল, তারাই কি ভারতীয়? জাতীয়তার অভিনয় করে বিজাতীয় বুলি আওড়াচ্ছে যারা, তারাই কি? কিছুই করছে না যারা—অন্ধ মূঢ় জনতার দল, যাদের দুঃখে আমরা অহরহ অভিভূত হয়ে বক্তৃতা-বিলাসের মাত্রা বাড়িয়েই চলেছি ক্রমাগত, ওই যে শতকরা নিরেনব্বই জন, যারা জন্মাচ্ছে আর মরছে ক্ষুধায় হাহাকার করে লোভে লালায়িত হয়ে রোগে ভুগে-ভুগে, যে-কোন বক্তার বক্তৃতায় উত্তেজিত হচ্ছে, পুলিসের হুমকিতে পালাচ্ছে, কাবুলীর কাছে ধার করছে, তাড়িখানায় হল্লা করছে, তারা সংখ্যাতে বেশি বলেই কি ভারতীয় নামের যোগ্য? না। আর্য বৌদ্ধ মুসলমান ক্রিশ্চান সভ্যতার বহুবিধ বিপর্যয়েও বিভ্রান্ত হয়নি যে ভারতীয় আত্মা, তার স্বরূপ কেবল ওরই মধ্যে ফুটেছে, অন্তরার মনে হল। ওই চিড়-খাওয়া কাচের মধ্যে সূর্যালোকের মত, ভেঙেছে কিন্তু মরেনি, রূপান্তরিত হয়েছে ইন্দ্রধনুতে। পুলিসের ব্যাটনে মাথা ফাটতে পারে, কিন্তু সেই ফাটল বেয়ে যা বেরুবে তা রক্ত নয়—লাভা-স্রোত, বহু শতাব্দীর সঞ্চিত নিরুদ্ধ উত্তাপ....চিড়-খাওয়া কাচের ফাটলে ওই

ক্ষীণ রক্তের আভাসে ভেসে ভেসে এসেছে, যেমন আসে জ্বলন্ত সূর্যের বার্তা কোটি মাইল দূর থেকে।

গাড়িটা এসে কাছারিতে যখন দাঁড়াল, তখন অন্তরা যেন সম্বিৎ ফিরে পেল। আদালতের বিবিধ বৈচিত্র্য হঠাৎ যেন একটি ব্যক্তিত্বে রূপান্তরিত হল সহসা, তার মুখের দিকে চেয়ে রইল সবিস্ময়ে নির্নিমেষে। নীরব প্রশ্নও একটা মূর্ত হয়ে উঠল সে দৃষ্টিতে—তুমি এখানে হঠাৎ? আস না তো কোনদিন!

চাকরকে দিয়ে গাড়ি ডাকিয়ে সে যখন তাতে চড়ে বসেছিল, তখন সে যেন অন্য লোকে ছিল, এ অদ্ভুত আচরণের অস্বাভাবিকতা তখন চোখে পড়েনি তার। গাড়ি ডাকিয়ে অবিলম্বে আদালত অভিমুখে রওনা হয়ে পড়াটাই বরং সঙ্গত মনে হয়েছিল তখন। ওই অঞ্চল ছাড়া অন্য কোথাও তো খবর পাওয়া সম্ভব নয়। এখন সহসা সে উপলব্ধি করলে, জবাবদিহি করতে হবে একটা। জবাবদিহি না করলে... কিন্তু কি বলবে?...মাথায় কিছু এল না; অসহায়ভাবে জনতার দিকে চেয়ে বসে রইল সে। যে ঘরটায় তার স্বামীর আদালত, তার সামনে খুব ভিড়....

"রামু মণ্ডল হাজির হো—"

চিৎকার করে উঠল আরদালী।

বিচার হচ্ছে। তার স্বামী বিচারক।

তার সমস্ত মুখ নীরব হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল ধীরে ধীরে। বহু দূরের বহু যুগ পরের অনাগত ভবিষ্যতের একটা স্বপ্ন......সেখানে তার বিচারক স্বামী নেই। অংশুমান? কই, সেও সেখানে নেই। জনতার মধ্যে নেই, নির্বাচিত সুধীদের মধ্যেও নেই। কোথায় সে?.....বিরাট বিশাল দিগন্ত-বিস্তৃত সমুদ্র একটা, কুচকুচে কালো জল, তার মধ্যে একটা লাল দ্বীপ..... প্রবাল নয়, জমাট রক্ত.....বহু যুগের প্রচুর রক্ত জমে কঠিন হয়ে গেছে, কিন্তু কালো হয়নি, টকটকে লাল আছে এখনও । সেই দ্বীপে ঘুরে বেড়াচ্ছে অংশুমান একা....মৃত রক্তকণিকাদের জাগাতে চেষ্টা করছে, ভাবছে, তারা না জাগলে তো সবই বৃথা.....

এ কি, বউদি, আপনি এখানে?

নবীন উকিল একটি। ভাব হয়েছে ছেলেটির সঙ্গে কিছুদিন থেকে তার স্বামীর। কমিউনিজমে আস্থাবান, ভালো ব্রিজখেলোয়াড়, মিহি খোশামোদও করতে পারে।

বাজারে যাচ্ছি।

এত ঘুরে?

বীণাদের বাড়িও যাব।

ঠিক সময়ে মিথ্যে কথাটা মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়াতে সে নিজেই আশ্চর্য হয়ে গেল। একটু আগেও মনে পড়েনি যে, বীণাদের বাড়িটা কাছারির সামনেই। বীণারা সেদিন এসেছিল, গেলেও বেমানান হবে না। কিন্তু সে যাবে না। অজুহাতটা খাড়া করতে পেরে স্বস্তি অনুভব করলে একটু।

বীণারা আজ কলকাতা গেছে সকালের ট্রেনে—

ও, তাই নাকি?

একটু ঝুঁকে গাড়োয়ানকে বললে, তবে বাজারে চল।

গাড়ি যখন চলতে আরম্ভ করেছে, তখন দরজা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে হঠাৎ অনিবার্য প্রশ্নটা সে করে বসল, আচ্ছা, জেলে নাকি মারধোর করছে?

আপনি কোথা থেকে শুনলেন?

কে যেন বলছিল।

খবর তা হলে রটে গেছে! ওসব খবর কি চাপা থাকে কখনও?

সত্যি তাহলে?

উকিল মানুষ, কথায় কিছু বললেন না, কিন্তু মুচকি হাসিতে যা প্রকাশ করলেন তা কথার চেয়েও স্পষ্টতর। বন্দী হৃদপিণ্ডটা অনেকক্ষণ থেকেই পঞ্জরকারায় মাথা কুটছিল, হঠাৎ সেটা স্তব্ধ হয়ে গেল ক্ষণিকের জন্য।

মফস্বল শহরের বন্ধুর পথে ধুলো উড়িয়ে চলেছে ছ্যাকড়া গাড়িটা। অসাড় অবসন্ন দেহে বসে আছে অন্তরা। মন কিন্তু উড়ে চলেছে ঝড়ো হাওয়ার মুখে হালকা মেঘের টুকরোর মত....অদৃষ্ট অতীত থেকে অদৃশ্য ভবিষ্যতের দিকে...

অনেকক্ষণ পরে সামনে এলোমেলো নানা জিনিসের স্তূপ দেখে বিস্মিত হল সে একটু। এগুলো....তখনই মনে পড়ল, নিজেই সে কিনেছে এগুলো বাজারে ঘুরে ঘুরে। ফিতে, চিরুনি, তেল, সাবান, টফি, চায়ের পেয়ালা। খদ্দরের টুকরোটাও চোখে পড়ল। এ বাড়ির কেউ পরবে না জেনেও এটা সে কিনেছে। ওই খদ্দরটুকুকেই বার বার তুলে সযত্নে পাট করতে লাগল সে। ওই খদ্দরের টুকরোর মধ্যেই তার স্পর্শ যেন সে খুঁজতে লাগল। ধরবার মত হাতের কাছে আর তো কিছু নেই....

অপরাহ্ন। পড়ন্ত রোদের একফালি এসে ঢুকেছে জানলার ভিতর দিয়ে। পড়েছে তার কোলের উপর। জানলার ধারে চুপ করে বসে আছে অন্তরা বাইরের দিকে চেয়ে। বড় একা মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে, চিরকালই একা। জীবনে ভিড় জুটেছে, সঙ্গী জোটেনি কখনও। বিশাল সমুদ্রে তৈলকণিকার মত তরঙ্গের ঘূর্ণাবর্তে আবর্তিত হচ্ছে সে কেবল, মিশ খায়নি। সারা জীবন তবু ভান করতে হচ্ছে। নিজের কাছেও। আশেপাশে কেউ নেই। দূর থেকে লোকে দেখে, একটি তারার ঠিক পাশেই আর একটি তারা।....কিন্তু দুটি তারার মাঝে কোটি কোটি যোজনের ব্যবধান। ঠিক পাশে কেউ নেই—শুধু শূন্যতা....

।। পনেরো।।

নীহার সেন ডেপুটি হয়েছে বলেই যে মত বদলেছে, তা নয়। এখনও সে মনে প্রাণে কমিউনিস্টই আছে। ক্যাপিটালিস্টদের অধীনে চাকরি নিতে হয়েছে বাধ্য হয়ে। পেটের দায়ে, সংসারের চাপে। পারিপার্শ্বিককে তো উড়িয়ে দেওয়া যায় না, পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেওয়ার কৌশলই তো জীবনযাপনের বিজ্ঞান এবং আর্ট। জীবনটা যখন যুদ্ধ, তখন কখনও আক্রমণ, কখনও সন্ধি, কখনও আপোস, কখনও বিরোধ—এ তো হবেই। উদ্দেশ্য ঠিক থাকলেই হল। উদ্দেশ্য তার ঠিক আছে। তা ছাড়া এখন...ঠিক এই মুহূর্তে ব্রিটিশ গভর্মেন্টের

সঙ্গে বিরোধিতার কোন হেতু নেই। ক্যাপিটালিস্ট ব্রিটিশ এখন অ্যান্টি-ফ্যাসিস্ট.....চার্চিলকে হাত মেলাতে হয়েছে স্ট্যালিনের সঙ্গে। হাত মিলিয়েছে যখন, তখন ঝগড়া নেই আর আপাতত। চাকরি নেওয়ারও কোন বাধা নেই। শুধু তাই নয়, ঠিক এই মুহূর্তে ব্রিটিশ শাসন-বিভাগে চাকরি নেওয়াটা প্রয়োজনও। আগস্ট-ডিস্টার্‌বেন্সের অর্থ তো পরিষ্কার। ফ্যাসিস্ট জাপানকে আমন্ত্রণ। সেটা যে মারাত্মক। এ মূঢ়তাকে প্রতিরোধ করতেই হবে সুতরাং যেমন করে হোক। আপাতদৃষ্টিতে যতই রূঢ় হোক তার আচরণ, যতই কঠোর হোক সমালোচনা (তথাকথিত অর্ধ শিক্ষিত সংকীর্ণদৃষ্টি স্বদেশভক্তদের ফেনায়িত উচ্ছ্বাসের ধার ধারে না সে), দেশের মঙ্গলের জন্যই এসব দৃষ্টিকটু ব্যাপারে লিপ্ত থাকতে হবে এখন...রোগীর মঙ্গলের জন্য যেমন তার ফোড়াটায় ছুরি চালাতে হয়, তেমনিই জনতার উপর গুলি চালানোই দরকার এখন জনতার মঙ্গলের জন্যে। লোকে যাই বলুক, দেশের এ অবস্থায় স্যাবটেজ মারাত্মক, যেমন করেই হোক দমন করতেই হবে।

নীহারবাবু বাইরের ঘরে একা বসে ফাইল ক্লিয়ার করতে করতে চিন্তা করছিলেন। আজকাল যখনই একা থাকেন, এই তর্ক তাঁকে পেয়ে বসে। প্রতিপক্ষ কেউ নেই, তবু মনে মনে তর্ক করতে হয়। একা পেলেই চিন্তাটা চুপিচুপি চোরের মত এসে মনের মধ্যে ঢোকে, তর্ক জুড়ে দেয়,......কিছুতেই এড়াতে পারেন না।

দমন করতেই হবে যেমন করে হোক।—আর একবার মনে মনে আওড়ালেন নীহার সেন। আউড়েই ভ্রূকুঞ্চিত করলেন। দ্বিজেন চক্রবর্তীকে দেখা গেল দ্বারপ্রান্তে।.....লোকটা কতক্ষণ বকবক করবে কে জানে! পুলিস-ইন্‌স্পেক্টর, তা ছাড়া একসঙ্গে পড়েও ছিলেন কলেজে। সুতরাং তাড়িয়ে দেওয়া যাবে না সহজে।

কি হচ্ছে? ফাইল ক্লিয়ার? তোমরা খাসা আছ! আমাদের যে কি দুর্দশা....

কি রকম? একটু কৌতূহল প্রকাশ করতেই হল নীহার সেনকে।

পরশু দিনকার ঘটনাটাই ধর না। একটা নতুন থানায় বদলি হয়েছি, চার্জ নিতে না নিতেই ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের জরুরী হুকুম—ওই এলাকায় মিলিটারি নিয়ে গিয়ে একটা গ্রাম খানাতল্লাসী করতে হবে। যারা রেল-লাইন উপড়েছিল, তারা নাকি সেখানে লুকিয়ে আছে। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের হুকুম অমান্য করবার উপায় নেই। স্টেশনে গেলাম। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব আমাকে কম্যাণ্ডিং অফিসারের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন। সমস্ত ট্রেনখানাই মিলিটারি, মায় ড্রাইভার পর্যন্ত। কম্যাণ্ডিং অফিসারই তার মালিক, কোথায় কখন থামাতে হবে তা ড্রাইভারকে বলা আছে আগে থাকতে। তাদের সঙ্গে গাড়িতে উঠতে হল। বি. এ. পাস করেছি তো, ইংরেজিতে নেহাত কাঁচাও ছিলাম না, কিন্তু ভাই, তাদের একটি কথাও বুঝতে পারি না প্রথমে। ঘুচখাচ করে কি যে বলে, বোঝাই যায় না কিছু। কথা বলে আর মাঝে মাঝে দাঁত খিঁচোয়। মুচকি হেসে ঘাড় নাড়ি শুধু। কি আর করব? একটু পরে বুঝতে পারলাম, গাল দিচ্ছে—আমাদের দেশের লোককে গাল দিচ্ছে। অকথ্য ভাষায়। সন অব এ বিচ, সন অব এ গান, নিগার্‌স্, বাস্টার্ড্‌স্—এই সব হল মৃদুতম। এই চলল খানিকক্ষণ। অনবরত সিগারেট টানছে, মদ মারছে, বিস্কুট চিবুচ্ছে আর আমাদের গাল দিয়ে যাচ্ছে। বুঝতে পারবার পরও মুচকি হেসে ঘাড় নেড়ে যাই। উপায় কি? কোথায় ট্রেন থামাবে তা আমাকে বলবে না। যদিও আমি পুলিস তাদের সপক্ষে

আছি, কিন্তু আমি কালা আদমী যে, আমাকে বিশ্বাস করবে কি করে? একটা ম্যাপ খুলে নিজেই ঠিক করছে সব। কিছুক্ষণ পরে ট্রেনটা থেমে গেল মাঠের মাঝখানে। মুখ বাড়িয়ে দেখলাম, দু'দিকে মাঠ। সায়েব বললে, এইখানে নামতে হবে। বললাম, এখানে? এখানে নেবে কি হবে, এখানে রাস্তা কোথা? সায়েব বললে মাঠ ভেঙেই যাবে তারা। সার্‌প্রাইজ অ্যাটাক করতে হবে। ম্যাপ দেখে বললে, মাইল খানেক গেলেই নাকি সেই গ্রামে পৌঁছানো যায়। আমি ঠিক তার আগের দিন চার্জ নিয়েছি, কিচ্ছু চিনি না, কারও সঙ্গে পরিচয় পর্যন্ত হয়নি। আমার ঈষৎ ইতস্তত ভাব দেখে সায়েব রূঢ়কণ্ঠে বলে উঠলেন, গেট ডাউন, গেট ডাউন প্লীজ অ্যাণ্ড লীড আস্‌। নামলাম, মানে নামতে হল। ভাগ্যে কাছে একটা টর্চ ছিল। তারই সাহায্যে কোন রকমে হেঁছড়ে-মেচড়ে তার টপকে মাঠে গিয়ে পড়লাম। আল ধরে ধরে আরও খানিকটা এগিয়ে দেখি, নালা রয়েছে একটা। সোল্‌জারগুলো গাড়ি থেকে নেমে সারবন্দী হয়ে দাঁড়াচ্ছে ততক্ষণ। আমি নালার একটা সরু অংশ দেখে লাফিয়ে পার হয়ে গেলাম, তার পর চেঁচিয়ে বললাম, কাম অন দেন। মাঠের মধ্যে নামল সবাই, বেয়নেট উঁচিয়ে আল ভেঙেই ছুটতে লাগল ব্যাটারা। কিন্তু টর্চ ছিল না ব্যাটাদের, নালাটা দেখতে পায়নি, হুড়মুড় করে পড়ল এসে তার মধ্যে। কিন্তু কিছু কি গ্রাহ্য করে ব্যাটারা! জল কাদা ভেঙে দেখতে দেখতে এপারে এসে উঠল সব। আমি ততক্ষণ ভেবে-চিন্তে উপায় বার করে ফেলেছিলাম একটা, বুঝলে....

এতক্ষণে থামলেন দ্বিজেন চক্র। একবার কথা বলতে আরম্ভ করলে থামেন না তিনি সহজে। এখনও থামতেন না, কিন্তু সিগারেট ধরাবার প্রয়োজন হয়েছিল। ঈষৎ ভ্রূ-কুঞ্চন করা ছাড়া আর কোন উপায়ে বিরক্তি প্রকাশ করা নীহার সেনেরও সাধ্যাতীত, মার্জিতরুচি ভদ্রলোক তিনি। তাঁর কুঞ্চিত-ভ্রূ দ্বিজেনবাবু লক্ষ্যও করলেন না বোধ হয়। সিগারেট ধরিয়ে এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে আবার শুরু করলেন তিনি—

উপায় একটা বার করে ফেলেছিলাম, বুঝলে। কাছেই একটা বাগান ছিল, সম্ভবত আমবাগানই। সাহেবকে বললাম, তুমি তোমার সৈন্যদের নিয়ে এই বাগানে একটু অপেক্ষা কর, আমি দু-একজন লোক যোগাড় করে নিয়ে আসি। আমি কালই এখানে বদলি হয়েছি, পথঘাট ভালো চিনি না, তা ছাড়া ভিতরের খবরটা প্রথমে একটু জানলে সুবিধেই হবে। তোমরা একটু দাঁড়াও, আমি লোক যোগাড় করে আনি। সাহেব সার্‌প্রাইজ অ্যাটাক করতে ব্যস্ত, তার এ সন্দেহও হয়তো হল যে, আমি বোধহয় আসামীদের সর্তক করাতে যাচ্ছি। অনেক কষ্টে তাকে বোঝালাম যে, আমরা সার্‌প্রাইজ অ্যাটাকই করব, কিন্তু এলোপাতাড়ি অ্যাটাক করলে অনর্থক একটা প্যানিক হবে, কাজ হবে না। বিভীষণ একটা যোগাড় করতে যদি পারি সুবিধে হবে। অনেক কষ্টে রাজী হল লোকটা। আমি তাদের সেখানে রেখে বিভীষণ যোগাড় করতে বেরুলাম। সোজা খানিকক্ষণ হাঁটবার পর রাস্তায় একটা লোকের সঙ্গে দেখা হল। তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, থানা কোন্‌ দিকে? থানার রাস্তাই জানা ছিল না আমার। সে একটা রাস্তা বাতলে দিয়েই সরে পড়ল, খাকী পোশাক দেখে সে আর বেশিক্ষণ কাছে থাকা নিরাপদ মনে করল না। প্রায় মাইল দেড়েক হেঁটে থানায় পৌঁছলাম। আমি ঠিক তার আগের দিন চার্জ নিয়েছি। যিনি আমার জায়গায় ছিলেন, তাঁর সেই দিনই সন্ধ্যের ট্রেনে চলে যাবার কথা। গিয়ে দেখি, সবাই স্টেশনে গেছে, তাঁকে সি-অফ করতে। থানা ভোঁ-ভোঁ। একটি লোক নেই। আমি ভেবেছিলাম, থানার কন্‌স্টেব্‌লদের সাহায্যে যা হোক কিছু একটা ব্যবস্থা করব। কিন্তু গিয়ে

দেখি, জনপ্রাণী নেই। অনেক হাঁকাহাঁকির পর চৌকিদার বেরুল একটা। তাকেই সঙ্গে নিয়ে সেই গ্রামটার নাম করে বললাম, চল্ ওই গ্রামেই 'রোঁদ' দেব আজ। তুই সঙ্গে থাক্ আমার। তাকে সঙ্গে নিয়ে বেরুলাম। আবার মাইল দুই হণ্টন। গ্রামে পৌঁছে দেখি, একেবারে নিষুতি। কেউ জেগে নেই, এক কুকুরগুলো ছাড়া। তারাই ঘেউঘেউ করে সম্বর্ধনা করলে এবং সর্বক্ষণ পিছনে লেগে রইল। চৌকিদারকে বললাম, ডেকে তোল্ একজন কাউকে। কাকে হুজুর? যাকে হোক। একটা কুঁড়েঘরের সামনে অনেক সোরগোল করে একটা জীর্ণশীর্ণ লোককে টেনে তুললে সে। স্বয়ং দারোগা সাহেব দ্বারদেশে সমুপস্থিত শুনে লোকটা তাড়াতাড়ি বেরুতে গিয়ে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল, তার পর উঠেই সেলাম করে ফেললে একটা—

দ্বিজেন চক্রবর্তী হা-হা করে হেসে উঠতেই নীহার সেন বুঝতে পারলেন, দ্বিজেন মদ খেয়েছেন। ভ্রূ আর একটু কুঞ্চিত হল। দ্বিজেনের কিন্তু ভ্রূক্ষেপ নেই সেদিকে। নীহার ভাবতে লাগলেন, আগে তো খেত না, ধরলে কবে?

সিগারেটটা ফেলে দিয়ে আবার শুরু করলেন, দ্বিজেনবাবু, সেলাম করে লোকটা আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল ফ্যালফ্যাল করে। তার পর বার দুই ঢোঁক গিলে সসঙ্কোচে বললে, হুজুর ডেকেছেন আমাকে? আমি বললাম, হ্যাঁ, চল্ আমার সঙ্গে। চৌকিদারকে বললাম, তুমি থানায় যাও, আমি আসছি একটু পরে। চৌকিদার থানার দিকে চলে গেল, আমি চলতে লাগলাম সেই আমবাগানের উদ্দেশে। এবার পলাশীর আমবাগান নয়, জাফরগঞ্জের আমবাগান। হা—হা—হা—

নেশাটা জমে এসেছিল দ্বিজেন চক্রবর্তীর। আবার একটা সিগারেট ধরালেন তিনি।

হনহন করে চলতে লাগলাম। লোকটা কুকুরের মত পিছনে পিছনে ছুটতে লাগল। এত রাত্রে কোথায় কি উদ্দেশ্যে নিয়ে চলেছি তাকে, তা জিজ্ঞেস করবার সাহস পর্যন্ত হল না লোকটার। ভাগ্যে হয়নি....

সিগারেটে লম্বা একটা টান দিয়ে আপন মনেই হাসলেন একটু মুখ নিচু করে।

বাগানের অন্ধকারে বীর ব্রিটিশ সৈন্যরা বেয়নট উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল সারি সারি আমার প্রতীক্ষায়। সেখানে ঢুকে টর্চটা জ্বাললাম দপ করে, বেয়নেটগুলো চকচক করে উঠল। ক্যাপ্টেন সাহেব এগিয়ে এলেন। তাকে চুপি চুপি বললাম, লোক পেয়েছি একজন। তার পর সেই লোকটার দিকে তাকিয়ে বললাম, তুমি বাঁচতে চাও? ভয়ে কথা সরছিল না তার মুখে, হাত জোড় করে থর থর করে কাঁপছিল শুধু সে। ঠিক তার দুদিন আগে পার্শ্ববর্তী গ্রামে মিলিটারি রেড্ হয়ে গেছে। লোক মারা গেছে, ঘর পুড়েছে, নারীধর্ষণ হয়েছে। যারা পালাবার পালিয়েছে। নিতান্ত অপরাগ যারা, তারাই আছে এখনও। এ লোকটা পরে শুনলাম, কালাজ্বররোগী। একে ফেলে পালিয়েছে সবাই। এর ছেলে কোথায় চাকরি করে, তার আশায় ভিটে আঁকড়ে পড়ে আছে ও। আমার ''বাঁচতে চাও' প্রশ্নের উত্তরে অস্ফুটকণ্ঠে সে শুধু বললেন, হুজুর মা-বাপ। আমি বললাম, দেখ বাপু, ওসব বলে কিছু লাভ নেই। যারা রেল-লাইন উপড়েছে, তাদের ঘর দেখিয়ে দিতে হবে—যদি দাও বাঁচবে, তা না হলে মৃত্যু। গুলি করে এরা মেরে ফেলবে তোমাকে, কারও কথা শুনবে না। আমি কিছুই জানি না।—করুণকণ্ঠে বললে লোকটা। তাহলে মর। লোকটা চুপ করে রইল। অশিক্ষিত বোকা লোক কিনা, মৃত্যু সুনিশ্চিত জেনেও চুপ করে

রইল। আমি শিক্ষিত এবং চালাক, বুদ্ধি বাতলে দিলাম। বললাম, ওরে ব্যাটা, যে-কোনও ঘর দেখিয়ে দে না, তা হলেই হবে, কেন বেঘোরে প্রাণটা হারাবি? ক্যাপ্টেন সাহেব অধীর হয়ে উঠছিলেন, আমাদের কথা একবর্ণ বুঝতে পারছিলেন না, গজরাচ্ছিলেন আর হাতঘড়ি দেখছিলেন। হঠাৎ তিনি হিরোয়িক কাণ্ড করে বসলেন একটা। আচমকা লোকটার গালে ঠাস্ করে একটা চড় বসিয়ে দিলেন 'ব্লাডি,স্কেয়াইন' বলে। লোকটা পড়ে গেল। তার পর উঠেই দৌড়। অন্ধকারে কোথায় সে সরে পড়ল খুঁজে পেলাম না আর। টমিগুলোও অনেক খোঁজাখুঁজি করলে, কিন্তু পাওয়া গেল না তাকে। ক্যাপ্টেন সাহেব ক্ষেপে উঠল, মনে হল আমাকেই মেরে বসে বুঝি! বললাম, সাহেব, ঘাবড়াচ্ছ কেন? খবর যোগাড় করে এনেছি, চল আমার সঙ্গে, এস। নিয়ে গেলাম। গিয়ে কিন্তু অপ্রস্তুত হয়ে পড়তে হল। কয়েকটি বুড়ী আর রুগী ছাড়া গ্রামে আর কেউ নেই, সব পালিয়েছে। সশস্ত্র ব্রিটিশবাহিনী নিরস্ত হল না তবু। রুগীগুলোকেই ঠ্যাঙাতে লাগল। মারের চোটে একটা ছোঁড়া রক্ত-বমি করতে শুরু করলে; শুনলাম, থাইসিস। একটা টমি একটা বুড়ীরই কেশাকর্ষণ করছে দেখলাম। অনেক কষ্টে থামাই তাদের, শেষকালে তারা প্রত্যেকের ঘরে ঢুকে জিনিসপত্র ফেলে ছড়িয়ে সোনাদানা যা পেলে পকেটে পুরে ব্রিটিশ-প্রতাপের মর্যাদা রক্ষা করলে কতকটা। আর—

সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে গুম হয়ে বসে রইলেন কিছুক্ষণ দ্বিজেনবাবু।

নীহার সেনের কুঞ্চিত ভ্রূ মসৃণ হয়নি। মুখে ফুটেছিল মৃদু হাস্যরেখা। দ্বিজেনের সব কথা শুনছিলেন তিনি, কিন্তু বিচলিত হয়েছেন মনে হচ্ছিল না। স্থির জলাশয়ের জল যেন। ঊর্মির চাঞ্চল্যও নেই। সূর্যের আলো, মেঘের ছায়া, উড়ন্ত পাখির প্রতিবিম্ব, নক্ষত্রের দীপালী, জ্যোৎস্নার সমারোহ সবই জলে প্রতিফলিত হয়, কিন্তু জলের জলত্ব নাশ করতে পারে না। ঝঞ্ঝায় বিক্ষুব্ধ হবার পরও জল জলই থাকে। নীহারের প্রসারিত চেতনার উপর তেমনই দ্বিজেন চক্রবর্তীর বর্ণনাটা পরিস্ফুট হল, কিন্তু রেখাপাত করল না। অনুরূপ একটা ছবি পাশাপাশি ফুটে উঠল বরং। তিনি নিজে সে ঘটনার নায়ক। একটা গ্রামে পিউনিটিভ ট্যাক্স আদায় করতে গিয়েছিলেন। সে গ্রামে পোস্ট-অফিস থানা স্টেশন সব পুড়েছিল। ঘাটে একটা মালবোঝাই ফ্ল্যাট ছিল, সবাই লুট করেছিল সেটা। সুতরাং দশ হাজার টাকা জরিমানা ধার্য করা অন্যায় হয়নি কিছু। দ্বিজেনের কথা শুনতে শুনতে সেই সম্পর্কে কয়েকটা মুখচ্ছবি পর পর ফুটে উঠল মনে। প্রায়ই ফুটে ওঠে। ভদ্রলোক সব। ডাক্তার জমিদার ব্যবসাদার সম্ভ্রান্ত গৃহস্থ বেয়নেট-ধারী মিলিটারী পরিবৃত হয়ে সারিবদ্ধ বসে আছে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে। ভীত, অসহায়। লুটপাট তারা করেনি তা ঠিক, কিন্তু টাকা তাদের দিতে হবে। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে দিতে হবে। না দিলে সম্পত্তি নিলাম করে নেওয়া হবে। গ্রাম্য ডাক্তারের দৃষ্টিটা মনে পড়ল, জ্বলছিল যেন। জমিদারের ম্যানেজারটা সেলাম করে খোশামোদ করবার চেষ্টা করছিল। চতুর ব্যবসাদার ঘুষ দেবার প্রস্তাব করছিল আকারে ইঙ্গিতে। বৃদ্ধ গৃহস্থ বেচারা কাঁদছিল। নীহার সেন কিন্তু টলেননি। পাই পয়সা পর্যন্ত আদায় করে এনেছিলেন। এসব ব্যাপারে টললে চলে না। শেষ লক্ষ্য যদি মহৎ হয়, তাহলে সে লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্য ছোটখাটো এমন অনেক কাজ করতে হয়, যা আপাতদৃষ্টিতে অমহৎ, কিন্তু শেষ লক্ষ্যের মাপকাঠিতে যাচাই করলে ইতিহাসের বিরাট পটভূমিকায় যা অকিঞ্চিৎকর হয়ে যায় অবশেষে। লেনিন মানব-প্রেমিক ছিলেন, মনে মনে তিনি যে সমাজের কল্পনা করেছিলেন,

তা প্রেমের উপর প্রতিষ্ঠিত; কিন্তু সেই সমাজকে বাস্তবে মূর্ত করতে গিয়ে নরহত্যায় পশ্চাৎপদ হননি তিনি। হলে চলে না। লক্ষ্যে পৌঁছনো যায় না। সাধারণ মানুষের সঙ্গে অসাধারণ মানুষের ওইখানেই তফাত।...দ্বিজেন চক্রবর্তীর কথা শুনতে শুনতে এই সব মনে হচ্ছিল নীহার সেনের। বিচলিত হননি তিনি, বিচলিত হননি মোটেই, বিচলিত হতে চান না।...সহসা সবিস্ময়ে আবিষ্কার করলেন, মনে মনে চিৎকার করছেন তিনি। তাঁর নিজেরই সত্তাটা যেন দু ভাগ হয়ে গেছে, এক ভাগ আর এক ভাগের সঙ্গে তর্ক করছে চিৎকার করে। চমকে উঠে একটু অপস্তুত হয়ে পড়লেন। তার পর দ্বিজেনের মুখের দিকে চাইলেন একবার আড়চোখে। মনে হল, কিছু বলা উচিত।

কর্তব্য অনেক সময় কঠোর হয়ই, কি আর করা যাবে....

কর্তব্য? তাই নাকি! তোমার তো কর্তব্যপরায়ণ বলে নাম রটেছে খুব, তুমিও অনুভব করছ তা হলে! ভালো।

দ্বিজেনের মুখখানা হাস্যোদ্দীপ্ত হয়ে উঠল।

এইবার চুটিয়ে কর্তব্য করব ব্রাদার, বুঝলে। এতদিন ডালে ডালে ছিলাম, এবার পাতায় পাতায় বেড়াব। ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া—কোথায় পড়েছিলাম বল তো? মরুক গে। মোট কথা, চুটিয়ে কর্তব্য করব এবার। প্রোমোশন হয়েছে, শুধু তাই নয়, আই. বি. তে বদলি হয়েছি। সেই সুখবরটাই দিতে এসেছিলাম। উঠি এবার, ফাইল ক্লিয়ার কর তুমি। এক কাপ চা-ও তো অফার করলে না! মিসেস এখানেই তো? গান-টান শোনা যাচ্ছে না যে বড়?

মুচকি হেসে বেড়িয়ে গেলেন দ্বিজেন চক্রবর্তী।

দ্বিজেনের কথায় নীহারের নূতন করে আবার মনে পড়ল, সত্যি, অন্তরা আজকাল বড় বেশি রকম নীরব হয়ে গেছে। কিছুদিন আগে পর্যন্ত গানে হাসিতে পূর্ণ করে রাখত সে বাড়িটা। আজকাল সাড়াশব্দই পাওয়া যায় না। বাড়ির কোন্ কোণে পড়ে থাকে, বোঝাই যায় না যেন। নিয়মমত কর্তব্য সমাপন করে যায় নিক্তির ওজনে নিখুঁতভাবে। মনে হয়, ভেতরের মানুষটা কোথায় চলে গেছে। পড়ে আছে শুধু দেহ-যন্ত্রটা। যে অন্তরা একদিন তাঁর প্রেমে পড়েছিল, সে অন্তরা কোথায়? সে যে অন্তর্হিত...এ কথা নীহারের অন্তর্যামী যে বুঝতে পারেনি, তা নয়। কিন্তু অন্তর্যামী ছাড়াও মানুষের মনে আর একজন থাকে, যে অন্তর্যামীর কথা বিশ্বাস করতে চায় না, প্রমাণ চায়। নীহারের মনের এই দ্বিতীয় সত্তাটি প্রমাণ সংগ্রহ করতেও ব্যগ্র নয়। অন্তর্যামী-আহরিত নিগূঢ় সত্যটি তিনি কেবল অবিশ্বাস করতে চান। অন্তরা তাঁকে আর ভালবাসে না--এ কথা কিছুতেই মানতে চান না তিনি। ইদানিং কিছুদিন থেকে যদিও তিনি বুঝতে পেরেছেন যে, অন্তরার সবটা তিনি পাননি, অন্তরার চরিত্রের মধ্যে এমন একটা কি আছে যা তাঁর আয়ত্তাতীত, যা কিছুতেই তাঁর নিজের নাগালের মধ্যে, তাঁর বিশেষ অধিকারের মধ্যে ধরা দেয় না, ইচ্ছে করে যে লুকিয়ে রেখেছে তা নয়, অন্তরা সম্পূর্ণরূপেই নিজেকে দিয়েছে (নীহার এই বিশ্বাসটাকেই আঁকড়ে আছেন প্রাণপণে), তিনিই---নীহারই তাকে সম্পূর্ণরূপে অধিকার করতে পারেননি। সূর্যের কিরণ যেন। তাঁরই বাতায়ন-পথে এসে তাঁরই ঘর আলোকিত করেছে, তবু তাঁর নয়। বেলা শেষ হলেই চলে যাবে, রাখা যাবে না কিছুতে। আকাশ যেমন দিগন্তরেখায় পৃথিবীকে স্পর্শ করে আছে মনে হয়, অথচ কত দূরে...গাছের ফুলকে ছিঁড়ে এনে ফুলদানিতে,

এমন কি 'বাট্‌ন্‌হোলে' গুঁজে রাখলেও ফুলের অন্তরতম সত্তায় প্রবেশ করা যায় না যেমন কিছুতে, অন্তরা সম্বন্ধে এই ধরনের একটা বোধ তাঁর হৃদয়কে আকুল করে তোলে; যদিও ইদানিং কিন্তু অন্তরা তাঁকে আর ভালোবাসে না—এ কথা স্পষ্টভাবে কিছুতেই স্বীকার করতে চান না তিনি। অন্তর্যামীর মুচকি হাসির উত্তরে নিজের অজ্ঞাতসারেই তিনি জবাব দেন—আমি ওকে সম্পূর্ণরূপে পাচ্ছি না, সেটা আমার নিজেরই অক্ষমতা, ও তো নিজেকে উজাড় করেই দিয়েছে।—এই সিদ্ধান্তে এসে শান্তি পেলেন নীহার সেন আবার। তাঁর অন্তরের সুনিভৃত অন্ধকার গুহায় বুভুক্ষু হিংস্র একটা পশুর দুই চক্ষে লেলিহান যে শিখাটা ধকধক করে জ্বলছিল তা যে আরও প্রখর হয়ে উঠল, নীহার সেন টের পেলেন না সেটা। পাবার কথাও নয়। গুহাটার সামনে মার্জিত চিন্তাধারার ঠাসবুনোনি পরদাখানা ঝুলছিল। সেটা তুলে ধরে আত্মবিশ্লেষণ করবার উৎসাহ ছিল না নবীন ডেপুটি নীহার সেনের। সময়ও ছিল না। সামনে স্তূপাকার ফাইল। ছুটির দিন, তবু ছুটি নেই। নীহার সেন ফাইলে মন দিলেন।

পাশের ঘরে অন্তরা শুয়ে ছিল। ঘুমুচ্ছিল না, চোখ বুঁজে পড়ে ছিল। তার আপাত-স্থৈর্যের অন্তরালে যে তুমুল আলোড়ন চলছিল, তার ঠিক স্বরূপটা নিজেও সে ঠিক করতে পারছিল না। ভয়, কৌতূহল, স্বাধীনতা-স্পৃহা, চক্ষুলজ্জা, বিদ্রোহ, সামাজিক কর্তব্য, নীহারের প্রতি মমতা এবং বিতৃষ্ণা—বহু বিচিত্র পরস্পরবিরোধী মনোভাব প্রবল হৃদয়াবেগের ঘূর্ণিপাকে তার মনে যে আবর্ত সৃষ্টি করেছিল, তার মধ্যে এমন কিছুই সে খুঁজে পাচ্ছিল না যা নির্ভরযোগ্য, যাকে অবলম্বন করে সে দাঁড়াতে পারে সমস্ত বিরুদ্ধ শক্তির বিরুদ্ধে। তুমুল ঝঞ্ঝার মাঝখানে অন্ধকারে সে ছুটে চলেছিল একটা সত্য আশ্রয়ের আশায়, যেখানে তার মন নির্ভয় হবে। যে ভিত্তির উপর সে তার স্বপ্ন-সৌধ নির্মাণ করেছিল, তা নড়ে উঠেছে। স্বপ্ন-সৌধ ভেঙে পড়েছে। তাকেই আঁকড়ে থাকতে হবে তবু? নিজেকে বারম্বার এই একই প্রশ্ন করে করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল সে, কিন্তু থামতে পারছিল না। মনের ভিতর থেকে ক্ষীণকণ্ঠে একটা উত্তরও আসছিল, ঠিক উত্তর নয়, পালটা প্রশ্ন আর একটা—ত্যাগ করবে কোন্ অজুহাতে, ত্যাগ করে যাবেই বা কোথায়? এ প্রশ্ন কিন্তু তার প্রথম প্রশ্নকে নিরস্ত করতে পারছিল না কিছুতে। সঙ্গে সঙ্গে এও সে ভাবছিল, যা সে আপাতদৃষ্টিতে দেখছে, তাই কি নির্ভরযোগ্য? কিছুদিন আগে যে বিচার-বুদ্ধির সাহায্যে সে নীহারের মধ্যেই জীবনের সঙ্গীকে আবিষ্কার করেছিল, সেই বিচার-বুদ্ধিটাই কি নির্ভরযোগ্য? স্বামীর কর্তব্যে নীহারের তো এতটুকু অবহেলা নেই, তাকে বিয়ে করে বরং নিজের আত্মীয়সমাজে সকলের বিরাগভাজন হয়েছেন তিনি। কমিউনিস্ট হয়ে ক্যাপিটালিস্ট গভর্মেন্টের অধীনে কেন তিনি চাকরি করছেন তার সপক্ষে নীহারের যুক্তির অভাব নেই, যুদ্ধের সময় প্রয়োজন হলে শত্রুর সঙ্গেও আপোস করতে হয়। ক্যাপিটালিজ্‌মের সঙ্গে কমিউনিজ্‌মের পৃথিবীব্যাপী যে যুদ্ধ অহরহ চলেছে, এটা তার অংশমাত্র। বৃহত্তর উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য স্থির রেখেই অধুনা ক্যাপিটালিজ্‌মের মিত্রের ভূমিকায় অবতরণ করতে হয়েছে কমিউনিস্টদের। এসব কথা নীহার বহু বার বলেছেন, সে বহু বার শুনেছে। এর যৌক্তিকতাও সে অস্বীকার করতে পারেনি—বস্তুত এ নিয়ে তর্কই করেনি সে, নীহার স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে বার বার নিজের যুক্তিটা আস্ফালন করেছেন তার কাছে কারণে-অকারণে। যুক্তির দিক দিয়ে এসব কথা অকাট্য হলেও অন্তরের অন্তস্তলে অযৌক্তিক কি যেন একটা বাষ্পাকারে উঠে আচ্ছন্ন করে দিচ্ছে যুক্তির

স্পষ্টতাকে। মনে হচ্ছে যুক্তিই কি জীবনের সব, জীবনযুদ্ধের কৌশল আয়ত্ত করাটাই মানব-জীবনের শেষ কথা, আর কিছু নেই? সামান্যতম পশুর আর বৃহত্তম মানুষের জীবন-দর্শনে কোন তফাত থাকবে না? এক-একবার এও মনে হচ্ছে, দাম্পত্যজীবনে রাজনীতিকে এত বড় স্থান দেওয়ার প্রয়োজন কি?... রাজনৈতিক মতবাদ থাকুক না বৈঠকখানার সুসজ্জিত সোফায় বসে তর্কাতর্কি চলুক না সেখানে, তার আলোড়ন অন্তঃপুরের শান্তিকে বিঘ্নিত করবে কেন? তখনই আবার ভাবছে, আমার এ দাম্পত্যজীবন যে ওই সূক্ষ্ম মতবাদের উপরই প্রতিষ্ঠিত! সমাজের অন্তঃপুর আর এর অন্তঃপুরে আকাশ-পাতাল তফাত যে! এর সবটাই অন্তঃপুর, বৈঠকখানা নেই। সমাজ এ জীবনে আমার ঘাড়ে জোর করে চাপিয়ে দেয়নি, আমি নিজে জেনে এ জীবনকে বরণ করেছি। যে আদর্শ স্বপ্ন-জীবনকে মূর্ত করতে চেয়েছিলাম এত সাধ করে, বাস্তবের এক আঘাতে সেই স্বপ্নটাই যদি চুরমার হয়ে গেল, তাহলে আর বাকি রইল কি? আদর্শ...স্বপ্ন...এই তো জীবনে চেয়েছি। কৌশল নয়, বিদ্যা নয়, বুদ্ধি নয়, রূপ নয়, অর্থ নয়, চেয়েছি মহত্ত্ব, বীরত্ব, আত্মত্যাগ। ডেপুটি-গৃহিণী হয়ে সকলের উপহাসের খোরাক যোগানোই যদি এর পরিণতি হয়, তাহলে লক্ষপতি ধনীর দুলাল বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চডিগ্রীধারী যে নাদুস-নুদুস ব্যক্তিটির সঙ্গে তার বাবা প্রথমে সম্বন্ধে করেছিলেন, তার গলায় মালা দিলেই তো হত। জীবন-যুদ্ধের আইন অনুসারে বেশি সঙ্গত কাজই হত। কিন্তু তা না করে সে রূপকথালোকের রাজপুত্রকে বরণ করেছিল...মিনুকে রাগের মাথায় অন্য কথা লিখলেও নীহার তার চক্ষে রূপকথালোকের রাজপুত্রই ছিল সেদিন, যে রাজপুত্র অসাধ্যসাধন করবে, ঘুমন্তপুরীকে জাগিয়ে তুলবে সোনার কাঠির স্পর্শ দিয়ে। জীবন-যুদ্ধের কৌশলে সেই রাজপুত্র সহসা রূপান্তরিত হয়ে গেল উপহাসাস্পদ কেরানীতে। হতে পারে না... কিছুতে হতে পারে না...

নীহার সেন তন্ময় হয়ে রায় লিখছিলেন। অসহায় কয়েকটা মুখ চোখের উপর ভাসছিল। অভাব—হ্যাঁ, অভাবই আসল কারণ, শুধু অর্থাভাব নয়, শিক্ষারও অভাব। লোকগুলোর চোখে পশুর দৃষ্টি, মানুষের নয়—ক্যাপিটালিস্ট সমাজের দুর্বল মানুষ-পশু। সুস্থ জীবন যাপন করবার সুযোগ পায়নি, চুরি করতে হয়েছে...তা ছাড়া...ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত হল নীহার সেনের। সত্যি লোকগুলো চুরি করেছে কি? ...একের পর এক এতগুলো লোক একবাক্যে যে কথা বলে গেল, উকিলের জেরায় টলল না, সে কথা বিশ্বাস করলে চুরি করেছে স্বীকার করতে হয়। এতগুলো লোকের কথা অবিশ্বাস করবার কোন হেতু নেই! কিন্তু মকদ্দমা দাঁড় করাবার জন্যে পুলিস যে মিথ্যে সাক্ষী সৃষ্টি করে, এ তো জানা কথা। সেদিন একজন পুলিস-অফিসার বলছিলেন, নিছক সত্যের উপর নির্ভর করতে গেলে কোন দোষীকে সাজা দেওয়া যায় না। আইনের এমনই গড়ন যে, দোষীকে সাজা দিতে হলেও সত্যের খানিকটা অপলাপ করতেই হবে। এই আইনের সহায়তা করেছেন তিনি! সাক্ষীর উপর যেখানে সব নির্ভর করছে, এবং সে সাক্ষী পুলিস যখন নিজের খুশিমত তৈরী করতে পারে তখন....অসহায় লোকগুলোর নিষ্প্রাণ দুর্বল দৃষ্টি আবার মনে পড়ল তাঁর....ওই দুর্বল দৃষ্টির অন্তরালে প্রচ্ছন্ন প্রতিহিংসারও কিছু আভাস ছিল। ....সুযোগ পেলে ওরা প্রতিশোধ নিতে ছাড়বে না....হয়তো ওরা নির্দোষ। কিন্তু 'হয়তো'র উপর নির্ভর করতে গেলে কাজ চলে না। পৃথিবীতে সব আইনে ফাঁক আছে, সব নিয়মের ব্যতিক্রম আছে। ট্রেনে কলিশন হয় জেনেও আমরা ট্রেনে চড়ি। বিবেকের তীক্ষ্ণ চঞ্চু ঠোকর মেরে মনে যে

ক্ষতটা করেছিল, এ কথা মনে হওয়াতে তাতে একটা স্নিগ্ধ প্রলেপ পড়ল যেন। না, এতগুলো সাক্ষীকে অবিশ্বাস করবার কোন হেতু নেই। ওদের পক্ষের উকিল তো কম জেরা করেনি। কলম চলতে লাগল নীহার সেনের। সব কটার সশ্রম কারাদণ্ড দিয়ে দিলেন। হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ল, যে ডেপুটি যত বেশি সাজা দিতে পারে, চাকরিতে তার নাকি তত বেশি উন্নতি হয়! দু-চারটে উদাহরণও মনে পড়ল। পিওন চিঠি দিয়ে গেল। বাই জোভ, গুজব নয় তাহলে, সত্যিই সে রায় সাহেব হয়েছে। হঠাৎ ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের প্রতি মনটা শ্রদ্ধাগদগদ হয়ে উঠল....পর-মুহূর্তেই লজ্জা হল, তখনই বিদ্রোহের সুর জাগল আবার...অনুপস্থিত প্রতিপক্ষকে লক্ষ্য করে মনে মনে আবৃত্তি করলেন—তুমি পাওনি, ঠাট্টা করছ তাই.....আঙুর আর শিয়ালের গল্পটা মনে পড়ছে। এতে লজ্জারই বা কি আছে, আমি তো চাইনি, আমার যোগ্যতার জন্য যেচে ওরা দিয়েছে। ক্লাসে যেমন ফার্স্ট প্রাইজ পেতাম। আর একটা সুখবরও ছিল চিঠিতে। সদরে বদলি হয়েছেন তিনি। অন্তরা খুশী হবে বোধ হয়। এই মফস্বলের বুনো আবহাওয়ায় হাঁপিয়ে উঠেছে বেচারা। তাই বোধ হয় অত মুষড়ে পড়েছে। আমি কাজকর্ম নিয়ে থাকি, ওর সঙ্গে গল্প করার পর্যন্ত সময় পাই না—ও বেচারার সময় কাটে কি করে। একটা রেডিও সেট কিনতে হবে এবার। এখনই উঠে গিয়ে অন্তরাকে সুসংবাদটা দিয়ে আসবেন কি না ভাবছিলেন, এমন সময় দরজাটা খুলে অন্তরা নিজেই এসে দাঁড়াল। চোখে অদ্ভুতরকম একটা উন্মুখ দৃষ্টি।

আমার একটা কথা রাখবে?

কি?

চাকরিটা ছেড়ে দাও তুমি। দেবে?

মজ্জমান লোক যে আগ্রহভরে ভাসমান কাঠের টুকরোটাকে অপলকা জেনেও আঁকড়ে ধরতে যায়, সেই আগ্রহ ফুটে উঠল অন্তরার চোখের দৃষ্টিতে। আবেগভরে ঠোঁট দুটো কাঁপতে লাগল।

নীহার সেন অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন।

।। ষোল।।

মাথায় ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা অংশুমান চুপ করে শুনছিল।

হার্‌ৎজ্‌ বলছিলেন, ব্যাটনের আঘাতটা তোমার মাথায় লেগেছে, তুমি কষ্টও পেয়েছ খুব—এ কথা আমি মানছি। আমি শুধু তোমাকে সেই পুরাতন সত্যটা আবার নতুন করে উপলব্ধি করতে বলছি যে আমাদের অনুভূতির সীমানা বড় সংকীর্ণ। আমরা যতটা অনুভব করতে পারি, তার বাইরেও ঢের জিনিস আছে যা আমাদের ইন্দ্রিয়াতীত।

একটু চুপ করে থেকে আবার বললেন, যা আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর, তারও রূপ ক্ষণে ক্ষণে বদলে যায়। সাধারণ আলো রূপান্তরিত হয় ইন্দ্রধনুর সপ্তবর্ণ মহিমায় সামান্য একটা পরকলার ভিতর দিয়ে দেখলে। সুতরাং অনুভূতির বিশেষ একটা রূপকে আঁকড়ে ধরে কষ্ট পাওয়ার কোন অর্থ হয় না।

কষ্ট পাচ্ছি যে। যা পাচ্ছি তা মানতেই হবে।

আনন্দও পেতে পার, যদি তোমার অনুভূতির তরঙ্গগুলোকে বিশেষ একটা পরকলার ভিতর দিয়ে চালিত করতে পার।

কোথায় পাব সে রকম পরকলা?

তোমার মনের ভিতরেই আছে। খুঁজে দেখ। পরকলা শুধু কাচেরই হয় না, মানসিকতারও হতে পারে। একটা বিশেষ ধরনের মনস্তত্ত্বের ভিতর দিয়ে গেলে যন্ত্রণাও যে আনন্দদায়ক হতে পারে, তার প্রমাণ স্যাডিজ্‌মে। বিকৃত মনোভাব হিসেবে ওটা অনেকের কাছে ধিক্কৃত, বিজ্ঞানের কাছে কিন্তু কোন কিছুই ধিক্কৃত নয়। তা ছাড়া ইতিহাসে যাঁরা মার্টার বলে পুজো পান, তাঁরা কোনও অলৌকিক শক্তিবলে শারীরিক বেদনাকে মানসিক বিলাসের পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারেন হয়তো। তোমাদের দেশেই সেকালে রাজপুত-রমণীরা জহরব্রত করতেন, এখনও চড়কপুজোয় অনেকে পিঠের চামড়ায় লোহার বড়শী বিঁধিয়ে বাঁশের ডগায় ঝোলেন শুনেছি। এঁরা নিশ্চয়ই কোন উপায়ে যন্ত্রণাকে মাধুর্যে রূপান্তরিত করতে পারেন, তা না পারলে—

হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন হার্ৎজ্।

দেখ, স্নায়ুতন্ত্রীগুলো আঘাতের তরঙ্গগুলোকে বহন করে নিয়ে গিয়ে মস্তিষ্কে বেদনা-বোধের কেন্দ্রে আলোড়ন তোলে, তাই না আমরা বেদনা বোধ করি। সেগুলো আনন্দ-বোধের কেন্দ্রে গিয়ে আলোড়ন তুললেই আমরা আনন্দ বোধ করব। যোগাযোগ ঘটানো অসম্ভব কি?—ঘনসন্নিবিষ্ট চাপদাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে চিন্তামগ্ন হয়ে পড়লেন তিনি। ক্ষণপরই আলো চকমক করে উঠল চোখের দৃষ্টিতে।

দেখ, ফ্যারাডের স্বপ্নকে ক্লার্ক ম্যাক্স্ওয়েল ভাষা দিয়েছিলেন। তিনি অঙ্ক কষে দেখিয়েছিলেন যে আলো আর বিদ্যুৎতরঙ্গ একই জাতের জিনিস, একই ইলেক্‌ট্রো-ম্যাগ্‌নেটিজমের বিভিন্ন রূপ—ইলেক্‌ট্রিকাল লাইন্স্ অব ফোর্স একটি মিডিয়মে মাত্র চলে, তার নাম ঈথর—যা সর্বব্যাপী, যা প্রত্যেক জিনিসের অণু-পরমাণুর অন্তরে অনুপ্রবিষ্ট, অনেকটা তোমাদের উপনিষদের ব্রহ্মের মত এই ঈথর প্রত্যেক জিনিসকে প্রত্যেকের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত করে রেখেছে—এক স্থান থেকে অন্য স্থানে তরঙ্গ বহন করে এই ঈথরই। আমি হাতে-কলমে প্রমাণ করেছিলাম সেটা। এখন আমাদের অনুভূতির তরঙ্গগুলোকে যদি ইলেক্‌ট্রো-ম্যাগ্‌নেটিক ওয়েভ বলে মনে কর—খুব সম্ভব তাই ওরা—তাহলে তাদের বহন করবার জন্যে স্নায়ুতন্ত্রীর প্রয়োজন নাও হতে পারে। সর্বব্যাপী ঈথর আছে। সুতরাং তার সাহায্যে বেদনার কম্পনগুলোকে আনন্দ-বোধের কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া অসম্ভব নয়। সেই চেষ্টা কর তুমি। তোমাকে এই এক্স্পেরিমেন্টটা করতে বলেছি এই জন্যে যে, আঘাত পেলেই তুমি যদি কাবু হয়ে পড়, তাহলে যে পথ তুমি বেছে নিয়েছ সে পথে অগ্রসর হতে পারবে না; কারণ যে পথেই তুমি চল না কেন, আনন্দই হল প্রধান পাথেয়। তোমার সশস্ত্র শত্রু অজস্র আঘাত করবে—ওই ওদের একমাত্র শক্তি—ওদের আঘাতকে তুমি যদি আনন্দে রূপান্তরিত করতে পার, তা হলেই তোমার জয়। পারবে না কেন?—Theoretically it is quite possible। আকাশের ইলেক্‌ট্রো-ম্যাগ্‌নেটিক তরঙ্গ রেডিও সেটে ঢুকে শব্দতরঙ্গে রূপান্তরিত হচ্ছে, বেদনার অনুভূতিই বা আনন্দের অনুভূতিতে রূপান্তরিত হবে না কেন মস্তিষ্কের মত অমন একটা বিস্ময়কর যন্ত্রে প্রবেশ করে? চেষ্টা কর, হবে ঠিক।

হার্ৎজ্ চলে গেলেন।

অংশুমান অন্ধকারে চুপ করে বিমূঢ়ের মত বসে রইল। অকারণে আচমকা মার খাওয়ার পর থেকে তার সমস্ত মন কেমন যেন অসাড় হয়ে গেছে। একটা হিংস্র পশুকে বন্দী করেও লোকে তাকে এমন অকারণে মারে না। জেলে নাকি বিদ্রোহের সূচনা হয়েছিল! কয়েকজন কয়েদী নাকি জেলারকে তাড়া করে। ইলেক্‌ট্রিকের তার কেটে দিয়েছে! কর্তৃপক্ষের সন্দেহ, রাজনৈতিক বন্দীরাও সংশ্লিষ্ট আছে এতে। তাই এই শাসন।

একটা তপ্ত লৌহ-শলাকা কে যেন মাথার ভিতর ঢুকিয়ে ঘোরাচ্ছে ক্রমাগত। ঘুরিয়েই চলেছে—একদণ্ড বিরাম নেই—অসহায় পশুর মত সহ্য করতে হচ্ছে—উপায় নেই কোনও।

আনন্দে রূপান্তরিত করতে হবে। অসম্ভব যে নয় তা সে নিজেই জানে, কিন্তু নিজেকেও সে জানে যে! আঘাতের বদলে প্রতিঘাত করতে হয়—এই তার শিক্ষা। অপমানে জর্জরিত হয়ে দিগ্বিদিক্‌জ্ঞানশূন্য হয়ে প্রতিঘাত করবে বলেই সে একদা যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল, প্রবল বিরুদ্ধ-শক্তির নিষ্ঠুর চাপে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাবার সম্ভাবনা জেনেও! এই প্রত্যাশিত চাপে আর্তনাদ করছে কেন তবে? নির্বিকারে থাকতে পারছে না কেন? নির্বিকারই থাকতে পারছে না যখন, আনন্দে রূপান্তরিত করবে কি করে তাকে? হার্ৎজের এ উপদেশ পালন করবে কি করে সে? পারলে যুদ্ধজয় সুনিশ্চিত, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইল সে। অনেকক্ষণ। অনেকক্ষণ পরে যখন সচেতন হল, তখন নিজের ক্ষুদ্রতায় সে সঙ্কুচিত। অযোগ্য, অনুপযুক্ত। সামান্য পশু ছাড়া আর কিছু নয়। আঘাতের বদলে প্রতিঘাত দেবার অতিপরিমিত সামান্য শক্তি ছাড়া আর কোন শক্তি তার নেই, তাই হাহাকার করে মরছে সারাক্ষণ। মত্ত মাতঙ্গের পদতলে নিষ্পিষ্ট কীটের মতই মরতে হবে, কীটের মতই মরতে হবে এবার। কীটের মতই মনোভাব, কীটের মতই দুর্বল, কীটের মতই মরতে হবে। আত্মিক শক্তি—মহাত্মা গান্ধী যে শক্তির উপর আস্থাবান, হার্ৎজ্ যে শক্তির কথা বলে গেলেন, সে শক্তির চর্চা তো সে করেনি কোনদিন। তার সন্ধানও জানে না। যে আত্মিক শক্তির বলে মানুষ পশুত্বের স্তর ছাড়িয়ে ঊর্ধ্বলোকে উঠে গেছে...হঠাৎ দধীচির কথা মনে পড়ল— নিজের অস্থি দান করে বজ্র নির্মাণ করেছিলেন....এটা কিসের রূপক?.... অনেকক্ষণ এই কথাই ভাবলে সে। রূপকের মর্মোদ্ধার হল না, সমস্ত অন্তর জুড়ে ঘনিয়ে উঠল একটা ক্ষোভ। যে ভারতবর্ষে তার জন্ম, সে ভারতবর্ষের উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছে সে। পাশবিক শক্তির তুচ্ছ আস্ফালনে মুগ্ধ হয়ে মনুষ্যত্বের উপর আস্থা হারিয়ে ফেলেছে। পশু ছাড়া আর কিছু হয়নি সে। তাও অতিশয় হীন পশু...অতিশয় ছোট।

ছোট জিনিস তুচ্ছ নয়। আমি অদৃশ্য বিদ্যুৎতরঙ্গ ধরেছিলাম অতি ছোট একটি যন্ত্রের সাহায্যে। গ্যালিনার উপর সরু একটি তার....

আচার্য জগদীশচন্দ্রকে সম্মুখে দণ্ডায়মান দেখে প্রথমটা অবাক হয়ে গেল, তার পর সাহস হল যেন। ঘোর অরণ্যে পথ হারিয়ে ফেলেছিল অন্ধকারে, নির্ভরযোগ্য আত্মীয়ের দেখা পেয়ে শুধু যে উৎফুল্ল হয়ে উঠল তা নয়, ম্লানায়মান আত্মবিশ্বাসের জ্যোতিটাও উজ্জ্বল হয়ে উঠল সহসা অন্তরে। মনে হল, পারব।

জগদীশচন্দ্রও বললেন, ভারতবাসী তুমি, নিজেকে হীন ভাবছ কেন এতটা? তুমি হীন নও। অমৃতের পুত্র তুমি। আদিত্যবর্ণ পুরুষকে প্রত্যক্ষ করবার পূর্বে উপনিষদের ঋষিকেও তমসার

সম্মুখীন হতে হয়েছিল। ভয় কি, অন্ধকার থাকবে না, আলো দেখা দেবে, সত্যকে আশ্রয় করে থাক শুধু।

সত্যকে?—সাগ্রহে বলে উঠল অংশুমান, কোন্‌টা সত্য বলে দিন আমাকে। কাকে আমি আশ্রয় করব, আমি আশ্রয় খুঁজছি!

সত্য কি, তা কেউ কাউকে বলে বোঝাতে পারে না। নিজে সেটা উপলব্ধি করতে হয়। যেটা মিথ্যা বলে মনে হচ্ছে, সেইটে পরিহার করে চল শুধু। সত্য-সন্ধানের সেই একমাত্র উপায়। অনেকে মিথ্যা সত্যের মুখোশ পরে থাকে, তাদের চিনতে দেরি হয়, কিন্তু সন্ধানী বেশীদিন প্রতারিত হয় না। রূপে রূপে বহু রূপে যিনি বিচিত্র, জীবনে ও মরণে যিনি নিত্য, সেই স্বয়ম্প্রভ স্বতন্ত্র সত্যের নির্লিপ্ত রূপ দেখতে পাবেই, যদি তোমার নিষ্ঠা আর আকুলতা থাকে।

আমি যে-পথের পথিক, সে পথেও কি এই আধ্যাত্মিক সত্যের প্রয়োজন? আমি চাই ক্ষমতা, শত্রুকে শাসন করবার শক্তি—

সত্যের কোন জাতিভেদ নেই। সত্যই শক্তি। আলোকে ভাসমান ধূলিকণা, পৃথিবীর অগণিত প্রাণী, আকাশের অসংখ্য প্রদীপ্ত সূর্য, শিকারের উপর ঝম্পনোন্মুখ শার্দূল, লজ্জাবতীর সঙ্কোচ, কুমুদিনীর নিশি-জাগরণ, বনচাঁড়ালের নৃত্য, উদ্ভিদের হৃৎস্পন্দন, চতুর্দিকে পরিব্যাপ্ত যা কিছু, তা শক্তির বিকাশ এবং তার মূলে আছে সত্য—একমেবাদ্বিতীয়ম্। তুমি যে পথ বেছে নিয়েছ, তাও এরই মধ্যে নিবদ্ধ। কোন পথই এর বাইরে নেই। যম নচিকেতাকে বলেছিলেন—তং দেবাঃ সর্বে অর্পিতাস্তদু নাত্যেতি কশ্চন....সকল দেবতা এঁর মধ্যেই প্রবিষ্ট—এঁকে কেউ অতিক্রম করতে পারে না। জড়, জীব, উদ্ভিদ, প্রাণী, বিদ্যুৎ, আলো—সমস্ত অনুশীলন করে সকলের মধ্যে যে বিরাট ঐক্য আমি প্রত্যক্ষ করেছি, তাতে বুঝেছি যে, আপাতদৃষ্টিতে পরিবর্তনশীল বলে মনে হলেও অন্তর্নিহিত সত্য এক এবং অভিন্ন। এবং এ উপলব্ধি যাঁর হয়েছে, তিনি অজেয়।—

বলতে বলতে ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হয়ে গেলেন।

ধীরে ধীরে গুঞ্জন উঠল, যাচ্ছি যাচ্ছি, তোমারই কাছে, সত্যপথে অনিবার্য গতিতে—

তার পরদিন সকালেই অংশুমান খবর পাঠালে যে, সে দোষ স্বীকার করবে। তার স্বীকারোক্তি শুনতে এলেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট নীহার সেন। ঠিক আগের দিন তিনি সদরে বদলি হয়ে এসেছিলেন।

।। সতেরো।।

শেষরাত্রি।

ঘন কুয়াশায় চতুর্দিক সমাচ্ছন্ন। কিছুক্ষণ পূর্বেও যে পরিচিত ছিল, তা অবলুপ্ত হয়েছে। কুহেলিকা নয়, যেন প্রহেলিকা। জীবনের কোন লক্ষণ কোথাও নেই, বৈচিত্র্যহীন, সব একাকার। বিরাট একটা সাদা চাদর দিয়ে মৃতদেহকে মুড়ে রেখেছে যেন কে—চাদরটা ছাড়া আর কিছু দেখা যাচ্ছে না। অস্তমান শশীর পাণ্ডুর জ্যোৎস্নায় হাসি নেই, আছে সকরুণ আক্ষেপ। নীরব ভাষায় যেন বলছে, তোমরা যখন জাগবে তখন আমি থাকব না, আমার সময় ফুরিয়েছে, আমি চললাম। একটা সবেদন সান্ত্বনাও যেন ক্ষরিত হচ্ছে ম্লানায়মান সেই আলো থেকে। চন্দ্র অস্ত

গেল। ধার-করা আলোর জ্যোতিটুকুও নির্বাপিত হল। নিবিড় অন্ধকার। মনে হচ্ছে, সর্বগ্রাসী..... কালের প্রবাহও থেমে গেছে.....নিস্পন্দ অসাড় সব....বিরাট একটা অন্ধ জঠর গ্রাস করে জীর্ণ করছে যেন চরাচর নিখিল বিশ্ব। আশার লেশমাত্রও আর অবশিষ্ট নেই বলে মনে হচ্ছে যখন, তখন অদ্ভুত কাণ্ড হল একটা। তীক্ষ্ণ তীব্র সুরে বাঁশি বেজে উঠল অন্তরীক্ষে। সু-উচ্চ দেবদারুশাখাসীন শকুন্ত আলোকের অরুণাভাস দেখতে পেয়েছে পূর্বদিগন্তের চক্রবালরেখায়। এসেছে, সে এসেছে। নিস্পন্দ স্পন্দিত হল, অসাড়ের সাড়া জাগল। নিষ্প্রাণ ঘুমন্ত পুরীতে লাগল যেন সোনার কাঠির স্পর্শ। সহস্রকিরণের সহস্র স্বর্ণশরজালে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল কুয়াশার মোহআবরণ । স্বচ্ছ হতে স্বচ্ছতর হতে লাগল চতুর্দিক। পাহাড়ের চূড়া জাগল, দেখা দিল বনস্পতির শীর্ষদেশ, মন্দিরের ললাটে পড়ল আলোকের তিলক, কলরব করে উঠল পক্ষীকুল বন থেকে বনান্তরে। ফুল ফুটল, হাওয়া বইল, অনুরূপ বর্ণবিচ্ছুরিত শোভাযাত্রায় প্রবেশ করল আলোকের বিজয়- রথ। প্রভাত হল।

।। আঠারো।।

মোটরের চারটে টায়ারই ফেটেছে।

পথের অনেকখানি জুড়ে ঘন ঘন লোহার পেরেক পোঁতা। আশেপাশে কোন গ্রাম নেই, চারিদিকে ধূ-ধূ করছে মাঠ। আমরা যে এই পথ দিয়ে যাব, তা কি করে জানলে ওরা, কে ওদের খবর দিলে?—ভ্রূকুঞ্চিত করে একটু বিস্মিত হবার চেষ্টা করলেন নীহার সেন। ড্রাইভার টায়ার মেরামত করছিল, একটু ঝুঁকে সেটাতে মনোযোগ দেবার চেষ্টা করলেন, পট করে হাফপ্যান্টের বোতাম ছিঁড়ে গেল একটা। সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ালেন। পকেট থেকে রুমাল বার করে ঘাড় কপাল মুছলেন ভাল করে। হাতঘড়িটা দেখলেন একবার। আর একটু ভ্রূকুঞ্চিত করলেন। সহসা চোখের উপর হাতটা একবার বুলোলেন, বুলিয়েই ভুলটা বুঝতে পারলেন। ছবিটা চোখের সামনে নেই, মনের ভিতর আঁকা হয়ে গেছে। কতকগুলো পা, মোটর-লরি থেকে ঝুলছে—মড়ার পা। মিলিটারির গুলিতে মরেছে। মোটর-লরিতে বোঝাই করে এই কিছুক্ষণ আগে সেগুলোকে ফেলে আসা হল ওই নদীতে। প্রকাণ্ড মাঠটার ওপর দিয়ে বয়ে গেছে নদীটা। সেই দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন নীহার সেন। যদিও নদীটা দেখা যাচ্ছিল না, দেখা যাবার কোন সম্ভাবনা ছিল না, তবু চেয়ে রইলেন। পাগুলো ঝুলছিল----দশ-বারোটা পা। হঠাৎ রাগ হল—অনির্দিষ্ট ধরনের রাগ। তার পর সেটাকে নির্দিষ্ট করবার চেষ্টা করলেন। কর্তৃপক্ষ তাঁকেই কেন এ অপ্রীতিকর কাজটা দিলেন এত লোক থাকতে? তাঁকে বদলি করে আনার কি দরকার ছিল মফস্বল থেকে? ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব বলছিলেন, তিনি বেশি কার্যদক্ষ—ক্রাইসিসের সময় 'এফিশেণ্ট' অফিসার দরকার। কিন্তু কার্যত দেখা যাচ্ছে, মিলিটারিদের গুলি চালাবার হুকুম দেওয়া ছাড়া দক্ষতা দেখাবার আর কোন উপায় নেই। সত্যিই নেই, সবাই কেমন যেন উন্মত্ত হয়ে উঠেছে—জেলের কয়েদীরা পর্যন্ত। দু-দুজন জেলের অফিসারকে খুন করে পুড়িয়ে ফেলেছে, ফায়ার করবার অর্ডার না দিলে কি রক্ষা ছিল কারও? সমস্ত জেলখানাটা পুড়িয়ে ফেলত। জন চল্লিশ মরেছে—বেশ হয়েছে—ক্রিমিনাল গুণ্ডা যত। আর একটু রাগবার চেষ্টা

করলেন; কিন্তু পাগুলো আবার ভেসে উঠল চোখের সামনে—দ্রুত ধাবমান লরির পেছন থেকে ঝুলছে। রাগটা একটু ফিকে হয়ে গেল। মনে হল, কই, এতদিন তো ওরা বিদ্রোহ করেনি, নিশ্চয় রাজনৈতিক বন্দীদের ষড়যন্ত্র আছে এর মধ্যে। অংশুমানের মুখটা মনে পড়ল। অদ্ভুত ছেলে! চোখের দৃষ্টিতে কোন উদ্বেগ নেই, ভয় নেই, উত্তেজনা নেই। পরিপূর্ণ শান্তিতে স্নিগ্ধ সে দৃষ্টি। নির্বিকার চিত্তে স্বীকার করলে যে, ডেপুটির অমানুষিক অত্যাচারে বিচলিত হয়ে সে তাকে পুড়িয়ে মারবার ষড়যন্ত্র করেছিল প্রতিশোধ নেবার জন্যে। এর জন্যে সে একটুও অনুতপ্ত নয়, এতদিন মিথ্যে কথা বলে নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টা করেছে বলেই সে অনুতপ্ত । তার মৃত্যুর জন্যে সে-ই সম্পূর্ণ দায়ী, আর কাউকে জড়াতে সে চায় না। অকম্পিত কণ্ঠে স্বীকার করলে যে, সে একাই দায়ী, অকম্পিত হস্তে সই করে দিলে স্বীকার-পত্রে। মুখের ভাব শান্ত, স্নিগ্ধ। বাইরে থেকে কিছু বোঝবার উপায় নেই এদের। আগেও অনেকবার দেখেছিলেন একে তিনি, কতবার তাঁর বাড়িতেই এসেছে। মুখচোরা ভালোমানুষ বলে মনে হত। ভাবতেই পারা যায়নি তখন যে এই লোক আগস্ট-ডিস্টার্‌বেন্সের পাণ্ডা হয়ে জলজ্যান্ত একটা লোককে পুড়িয়ে ফেলতে পারে। এতদিন ধরে ক্রমাগত দোষ অস্বীকার করে এসেছে—হিমসিম খেয়ে গেছে এতগুলো ঝানু দারোগা। সবাই হার মানল যখন, তখন হঠাৎ নিজে যেচে দোষ স্বীকার করছে। অদ্ভুত! ভয় পেয়ে করছে যে, চোখের দৃষ্টি থেকে তা মনে হয় না। মিলিটারি ফায়ারিং হবার আগেই স্বীকার করেছে। না ভয় নয়—আসলে ওরা....আর একটু ভ্রূকুঞ্চিত করে চিন্তা করতে লাগলেন, এই ধরনের লোককে ঠিক কোন্ শ্রেণীতে ফেললে তাদের প্রতি অবিচার করা হবে না। কারও প্রতি অবিচার করতে চান না নীহার সেন, প্রত্যেক জিনিসকে ঠিক প্রপার পার্‌স্‌পেক্‌টিভে ফেলে বিচার করাই তাঁর রীতি—একটু ভেবে তাই ঠিক করলেন, না, ঠিক ক্রিমিনাল ওরা নয়, বাহাদুরি করবার জন্যেও এসব করেনি, আসলে ওদের মনের সমতা নেই, আন্‌ব্যাল্যান্‌স্‌ড্ মাইণ্ড—এরাই বোধ হয় পাগল হয় শেষ পর্যন্ত। একটু দুঃখ হল—ছেলেটা পড়াশুনায় ভালো ছিল নাকি....

আর কত দেরি হে?

এখনও বহুত দেরি হুজুর। চার-চারটে টায়ার—। হাসিমুখে জবাব দিলে ড্রাইভার।

আকাশে বেশ মেঘ করেছে। ঘন-নীল পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ। ছেলেবেলার একটা কথা মনে পড়ে একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন। তাঁদের একটা ময়ূর ছিল। মেঘ দেখলে ময়ূরটা পেখম তুলে নাচত, আর নাচত তাঁর ছোট বোন মালতী। গানও গাইত একটা হাত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে—আয় বৃষ্টি হেনে, ছাগল দেব মেনে। ময়ূরটা উড়ে পালিয়ে গেল একদিন। মালতীও মারা গেছে। হঠাৎ মনে হল, বৃষ্টি হবে নাকি? আকাশের দিকে চাইলেন একবার। শঙ্কা ঘনিয়ে এল চোখের দৃষ্টিতে। অসহায়ভাবে চারদিকে চাইলেন—ধূ-ধূ করছে ফাঁকা মাঠ— কোথাও আশ্রয় নেই—মনে হল, আশ্রয় থাকলেও কেউ কি অভ্যর্থনা করত তাঁকে? মোটরে উঠে বসলেন।

আকাশে বহু বিচিত্র মেঘ থাকলে আকাশটা যেমন চোখে পড়ে না, তেমনই নানা চিন্তার ভিড়ে আসল চিন্তাটা আড়ালে পড়ে ছিল এতক্ষণে। হঠাৎ সেটা স্পষ্ট হয়ে উঠল। অন্তরা চলে গেছে। কোথায়, কেন, কিছুই বলে যায়নি। ভ্রূকুঞ্চিত করে অপটুভাবে শিস দেবার চেষ্টা করলেন। হু-হু করে ঠাণ্ডা বাতাস উঠল একটা।

।। উনিশ।।

চাকরি ছাড়ার প্রস্তাবটাকে লঘু-হাস্যভরে উড়িয়ে দিলেন যখন নীহার সেন, তখন অন্তরার দাম্পত্য-নীড়ের শেষ খড়টুকুও যেন উড়ে গেল। যে ডালে সে নীড় ছিল, সেই ডালটাকে আঁকড়ে থাকবার আর কোন অজুহাত সে আবিষ্কার করতে পারলে না। সেটা ভদ্রভাবে ত্যাগ করে যাওয়াই স্বাভাবিক বলে মনে হল তার। আদর্শকেই সে বরণ করেছিল, নীহার সেনকে নয়। নীহারের চেয়ে দেশই তার কাছে বড়। কোন ইজ্‌মের খাতিরে সে দেশদ্রোহী হতে পারবে না। প্রথমে যৌবনে কমিউনিজ্‌মের যে স্বপ্ন তার কল্পলোকে মূর্ত হয়ে ছিল, তা আজও অম্লান আছে—সে কমিউনিজ্‌মের ভিত্তি দেশ—দেশেরই দরিদ্র জনসাধারণ। তাদের উপর গুলি চালাবার, তাদের অবলা নারীদের ধর্ষণ করবার যে যুক্তি নীহারকে মুগ্ধ করেছে, সে যুক্তি নিয়ে নিজের মতে নিজের পথে সে একাই চলুক। প্রত্যহের কুশাঙ্কুর সহ্য করে সে ও-পথে সঙ্গী হতে পারবে না।....

একটা ছোট স্যুটকেসে নিজের প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো সে গুছিয়ে নিলে। স্যুটকেসটা পরে ফেরত দিলেই হবে। কিছু টাকাও নিয়ে যাচ্ছে, সেটাও ফেরত দিতে হবে। চিঠিও লিখতে হবে একটা পরে। নীহার নিজের পথে স্বাধীনভাবে এগিয়ে যাক, আমি সরে দাঁড়ালাম তার স্বাধীনতায় বাধা দিতে চাই না বলে—এই সব লিখতে হবে।—আরও অনেক কথা লিখতে হবে।....

রাস্তায় বেরিয়ে কিন্তু নীহারের কথাই মনে হতে লাগল বার বার। বিদ্বান বুদ্ধিমান তর্কপটু রাজনৈতিক নীহারকে নয়। সেই অসহায় পুরুষটাকে, যার অন্তরা না থাকলে একদণ্ড চলে না; তাকে, যে দাড়ি কামিয়ে বুরুশটা ধুতে ভুলে যায়, হাতঘড়িটা হারায় ক্ষণে ক্ষণে, আপিসের কাগজ কোথায় রাখে ঠিক থাকে না। মনে পড়ছিল, মায়া হচ্ছিল; কিন্তু আর ফিরবে না সে। মা-বাবাকেও সে কম ভালোবাসত না, কিন্তু নীহারের জন্য তাদেরও ছেড়ে এসেছিল একদিন। আদর্শের জন্যেই নীহারকেও ত্যাগ করতে হল। কষ্ট হচ্ছে—কিন্তু সে আর ফিরবে না। স্টেশনের দিকেই চলেছিল সে হাঁটাপথে। কোথায় যাবে ঠিক ছিল না। কলকাতায়ই যাওয়া যাক আপাতত। হঠাৎ মনে হল, তার আর্দশকে রূপ দেবে কে? অংশুমান? সে তো নাগালের বাইরে, জীবনে আর হয়তো দেখাই হবে না। হঠাৎ বুকের ভিতরটা মুচড়ে উঠল। গতিবেগ বাড়িয়ে দিলে সে—দ্রুতবেগে চলতে লাগল অসমতল কঙ্করাকীর্ণ পথে। সমস্ত দেহ-মন একাগ্র হয়ে উঠল যেন। কেন, কিসের উদ্দেশ্যে, তা সে বুঝতে পারলে না। চলতে লাগল শুধু, দ্রুতবেগে চলাটাই একমাত্র করণীয় বলে মনে হল। যেতে হবে—কোথায় সে আদর্শলোক জানা নেই—তবু যেতে হবে। চলতে লাগল। অনির্দিষ্ট নামহীন একটা আকর্ষণ দুর্নিবার বেগে টেনে নিয়ে চলল তাকে।

মনের প্রত্যন্ত প্রদেশে কিন্তু যে হাহাকারটা প্রচ্ছন্ন ছিল, তা স্পষ্ট হয়ে উঠল। সে স্পষ্টভাবে অনুভব করতে লাগল, জীবনে সে কাউকে ভালবাসতে পারেনি, এক নিজেকে ছাড়া। সে ভালোবাসা চেয়েছে, ভালোবাসা পেয়েছে বলে ভান করেছে, মাঝে মাঝে উতলা হয়েছে, স্বপ্নের ঘোরে স্বপ্নকে জড়িয়ে ধরতে গেছে—কিন্তু আসলে পায়নি কিছু। সত্যি যদি ভালোবাসা পেত, তাহলে কেরানী স্বামী নিয়েও সুখী হত সে। ভালোবাসার স্পর্শে দাসত্বও মহনীয় হয়ে উঠত। হৃদয়সিংহাসন শূন্যই আছে, কোনও মহারাজার স্পর্শে ধন্য হয়নি তা এখনও। কোথায় সে

মহারাজা, কবে আসবে, কোন্ গুণে চেনা যাবে তাকে? একটি গুণই তো সে চেয়েছে সারা প্রাণ দিয়ে, সারাজীবন শ্রদ্ধেয় হবে সে—যার পায়ে সমস্ত দেহ মন উজার করে দেবে, তার মহত্ত্ব যেন মেকি না হয়—দু'দিন যেতে না যেতেই তার গিলটি ধরা না পড়ে! বিদ্বান নয়, বুদ্ধিমান নয়, রূপবান নয়, সে চেয়েছে শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিকে—যার মহত্ত্বের ঔজ্জ্বল্যে মরচে পড়বে না কখনও। তখনই মনে হল, তার নিজের কি এমন গুণ আছে, যে এমন খাঁটি সোনার দাবি সে করতে পারে অসঙ্কোচে? কি মূল্য দেবে সে—এর যোগ্য মূল্যই বা কি? মনের ভিতর থেকে উত্তর এল, আত্মত্যাগ। আত্মত্যাগ করতে প্রস্তুত আছে সে। কিন্তু কোথায়—কি ভাবে?....

আরে, রোকো রোকো.....

গর্জন করে দাঁড়িয়ে পড়ল মোটরটা।

মিসেস সেন? কোথায় চলেছেন? আপনার কাছেই যাচ্ছিলাম যে আমি।

মোটর থেকে নামলেন ইন্‌স্পেক্টর দ্বিজেন চক্রবর্তী।

এক মুখ হেসে প্রশ্ন করলেন, কোথায় চলেছেন?

এই ট্রেনে কলকাতা যাব।

ও, তাহলে তো আরও সুবিধে হল। আমিও যাচ্ছি কলকাতা। ট্রেনের এখনও দেরি আছে আধ-ঘণ্টাটাক। স্টেশনে যাবার আগে আপনার সঙ্গে দেখাটা সেরে যাব ভাবছিলাম। আপনিও কলকাতা যাচ্ছেন, ভালোই হল। আসুন তা হলে, উঠুন। স্টেশনেই যাওয়া যাক সোজা—

আমার সঙ্গে কি দরকার আপনার?—সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলে অন্তরা। তার বুকের ভিতরটা কেঁপে উঠল একটু।

রাদার ইণ্টারেস্টিং—ধীরে সুস্থে বলব এখন। সঙ্গেই তো যাচ্ছেন! উঠুন। আপনার জিনিসপত্র কই?

এই ব্যাগটা ছাড়া আর কিছু নেই।

আসুন। মিস্টার সেন সদরে জয়েন করেছেন গিয়ে?

হ্যাঁ।

আপনি যাচ্ছেন কবে?

আমার কলকাতায় একটু দরকার আছে। সেটা সেরে তার পর যাব।

আই সি। আসুন।

ট্রেন ছুটে চলেছে অন্ধকার ভেদ করে। ঠিক আগের স্টেশনে কামরাটা খালি হয়ে গেছে। ইন্‌স্পেক্টর দ্বিজেন চক্রবর্তী ও অন্তরা ছাড়া কামরায় আর কেউ নেই। একটা কপাট খারাপ, ভালো করে বন্ধ হয় না। দ্বিজেনবাবু সেটাকে ভালো করে খুলে দিয়ে তার সামনেই বসেছেন নিজের ট্রাঙ্কের ওপর, ভালোভাবে হাওয়া পাবেন বলে। তাঁর মনে হল, এইবার কথাবার্তা শুরু করা যাক, পরের স্টেশনে আবার লোক উঠবে হয়তো।

একটা কথা জানতে চাই আপনার কাছ থেকে মিসেস সেন। আই হোপ, ইউ উইল স্পিক দি ট্রুথ—অংশুমান বাবুকে আপনি কি সাহায্য করেছিলেন কিছু?

অন্তরার চোখের দৃষ্টি প্রখর হয়ে উঠল।

সাহায্য? কি রকম সাহায্য?

আর্থিক।

না।

ক্ষণকাল নীরব থেকে দ্বিজেন চক্রবর্তী বললেন, আমরা কিন্তু একটা বাড়ি সার্চ করে এব সেট জড়োয়া গয়না পেয়েছি, তার প্রত্যেকটাতে নাম খোদাই করা আছে—অন্তরা সেন।

অন্তরার মুখ শুকিয়ে গেল। তবু সে সপ্রতিভ হাসি হেসে বললে, আমি ছাড়া পৃথিবীতে অন্য অন্তরা সেন থাকাও সম্ভব।

কোয়াইট, খুবই সম্ভব। আমিও প্রথমে তাই ভেবেছিলাম। কিন্তু যে দোকান গয়নাগুলো বিক্রি করেছে, গয়নার গায়ে দোকানের নামও ছিল, সেখানে খোঁজ নিয়ে দেখলাম যে, এক আপনি ছাড়া অন্য কোন অন্তরা সেনকে গয়না বিক্রি করেনি তারা।

আমার সে গয়নার সুট চুরি হয়ে গেছে।

কবে?

ঠিক মনে নেই।

পুলিসে খবর দিয়েছিলেন?

না।

দেননি কেন?

পুলিসের ওপর আস্থা নেই বলে।

আপনার স্বামী কি এই চুরির কথা জানতেন?

তিনি রাগারাগি করবেন—এই ভয়ে তাঁকেও জানাইনি।

দ্বিজেন চক্রবর্তীর মুখ হাস্য-প্রদীপ্ত হয়ে উঠল। চোখের দৃষ্টি থেকে উঁকি দিতে লাগল প্রচ্ছন্ন কৌতুক। পর-মুহূর্তেই গম্ভীর হয়ে গেলেন তিনি। আড়চোখে চেয়ে দেখলেন, অন্তরার দৃষ্টিতে আগুন জ্বলছে। এক ঝলক হেসে বললেন, কিন্তু আপনার বান্ধবী কমরেড মিনা দত্তকে এসব কথা লেখেননি তো—সে চিঠিখানাও দেখেছি আমি।

অন্তরার চোখ দুটো দপ্ করে জ্বলে উঠল।

দ্বিজেনবাবু বললেন, আই অ্যাম সরি, কিন্তু আপনাকে অ্যারেস্ট করতে হল। কর্তব্যের খাতিরে, বিলিভ মি। মিস্টার সেন, আই হোপ, উইল অ্যাপ্রিসিয়েট মাই লাভ ফর ডিউটি।

একটা ক্রূর হাসি ফুটে উঠল চোখ দুটোতে। অন্ধকার ভেদ করে ট্রেন ছুটতে লাগল।

।। কুড়ি ।।

অন্ধকারে একা ভাবছিল অংশুমান।

....ওরা ছাড়বে না, প্রতিশোধ নেবে। বার বার নিয়েছে, এবারও ছাড়বে না। ছাড়বে না, কারণ ওরাও ভীত। ভীত বন্য বরাহ যেমন দুরন্ত বেগে তেড়ে আসে, নখদন্ত বিস্তার করে বাঘ যেমন সগর্জনে ঝাঁপিয়ে পড়ে আততায়ীর বুকে, সাপ যেমন ফণা তোলে. এরাও তেমনই নিষ্ঠুরভাবে নির্মূল করবে আমাদের। ভয় পেয়েছে বলেই অস্ত্র চালাবে, চোর যেমন ছোরা চালায়। না, ছাড়বে না। কখনও ছাড়েনি। ইতিহাসে তার প্রমাণ আছে।—

...গাছের ডালে ডালে মড়া ঝুলছে। ফাঁসি দেওয়া হয়েছে।

...হাত-পা বাঁধা সারিবদ্ধ সিপাহী। একের পর এক গুলি করা হচ্ছে। মড়ার স্তূপ। দুটো কূপ পরিপূর্ণ হয়ে গেল।

....প্রকাণ্ড একটা কামান দাগা হল। আওয়াজটা হল চাপা গোছের, সঙ্গে সঙ্গে ছিটকে পড়ল চতুর্দিকে মাংসের টুকরো, কাটা আঙুল, রক্তাক্ত হাত-পা, ঝলসানো থ্যাত্‌লানো মাথা। কামানের ভিতর মানুষ পুরে কামান দাগা হয়েছে।

....একটা পোড়া দুর্গন্ধ উঠছে চতুর্দিকে। একটা জীবন্ত লোককে হাত-পা বেঁধে মন্দ আঁচে ধীরে ধীরে পুড়ানো হচ্ছে। তার আগে তাকে প্রহার করা হয়েছে প্রচুর। বেয়নেটের খোঁচায় সর্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত।

....একটা লম্বা ঘরে সারি সারি শোয়ানো আছে হাত-পা বাঁধা অপরাধীরা। সকলেই সম্পূর্ণ উলঙ্গ। তপ্ত লোহা দিয়ে আপাদমস্তক দেগে দেওয়া হচ্ছে সকলের একে একে। চড়চড় করে শব্দ হচ্ছে—তপ্ত লোহায় কাঁচা মাংস পুড়ছে। নিদারুণ যন্ত্রণায় আর্তনাদ করছে সকলে। আর্তনাদ যখন বিরক্তি উৎপাদন করতে লাগল, তখন গুলি চালিয়ে নীরব করে দেওয়া হল তাদের।

.....মুসলমানের মুখে জোর করে মাখানো হচ্ছে শূকরের চর্বি, শূকরের চামড়ায় পুরে সেলাই করা হচ্ছে তাদের, তার পর হত্যা করা হচ্ছে নির্মমভাবে। ফাঁসি দিয়ে, গুলি করে, কামানের ভিতর পুরে, পুড়িয়ে, ঠেঙিয়ে—যেমন খুশি। হিন্দুর বেলাতেও ঠিক অনুরূপ আচরণ। আগে ধর্ম নষ্ট, তার পর অপমান, তার পর হত্যা।

দিল্লী শ্মশান হয়ে গেছে। একটিও পুরুষ নেই। সব মরেছে। হাজার হাজার গৃহহীন স্ত্রীলোক আর শিশু ঘুরে বেড়াচ্ছে পথে পথে। সৈন্যরা ঘরে ঘরে ঢুকে লুঠ করেছে.....

সিপাহী-বিদ্রোহের সময় ইংরেজ রাজপুরুষেরা যেভাবে বিদ্রোহ দমন করেছিলেন, তার এই সব বর্ণনা ইংরেজ ঐতিহাসিকেরাই* নিপুণভাবে লিপিবদ্ধ করে গেছেন। ভয়াবহ বর্ণনা। অনেকদিন আগে পড়েছিল। প্রতিটি বর্ণনা মূর্ত হয়ে উঠতে লাগল চোখের সামনে। এ দেশের লোককে লাথি মেরে, চাবকে, জেলে পুরে, গুলি করে, ফাঁসি দিয়ে, আগুনে পুড়িয়েও তৃপ্তি হয়নি এদের। একজন লিখেছেন—আমার যদি আইনত ক্ষমতা থাকত, জীবন্ত অবস্থায় এদের চামড়া ছাড়িয়ে নিতাম। তার পর দ্বিতীয় আফগান যুদ্ধ, কাবুল বিদ্রোহ। সে বিদ্রোহও দমন করেছিল এরা গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে, হাজার হাজার লোক হত্যা করে। শক্তিমান জাতি, প্রতিশোধ নিতে এরা ছাড়ে না। জালিয়ানওয়ালাবাগ, চট্টগ্রাম, মেদিনীপুর—ভারতবর্ষের প্রত্যেক জেলের সেলে সেলে...। সহসা চিৎকার করে বলে উঠল অংশুমান, তবু ভয় খাব না, তবু অন্যায় সহ্য করব না, আমাদের ন্যায্য প্রাপ্য আমরা নেবই। বলে অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল—কোথাও কেউ নেই। চুপ করে বসে রইল অনেকক্ষণ। অন্ধকার—কেবল অন্ধকার। এত অন্ধকার কেন? একটু আলো, এতটুকু আলো পেলে যে বেঁচে যায় সে। কোথাও আলো নেই। চোখের সামনে অন্তরের নিবিড় গহনে কেবল অন্ধকার। ঘন গাঢ় পুঞ্জীভূত তমিস্রা। মৃত্যুর আঁধার এখনই নামল নাকি?

* *The Other Side of the Medal* by Edward Thompson.

শান্তি স্তব্ধ হয়ে চোখ বুজে বসে ছিল অংশুমান। চোখের সম্মুখে প্রসারিত তিমির-যবনিকা সামান্য একটু কাঁপল যেন, ক্ষীণ একটু আলোর আভাস দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেল।—আবার অন্ধকার—একটু পরেই আবার সেই আলোর আভাস, এবার যেন একটু বেশিক্ষণ স্থায়ী—আবার মিলিয়ে গেল তাও। একাগ্র আগ্রহে স্তব্ধ নিমীলিত নেত্রে বসে রইল অংশুমান। প্রদীপের শিখার মত ওই যে—স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠল ক্রমশ—কম্পিত শিখা স্থির হল। সহসা সে শিখা থেকে আবির্ভূত হলেন এক জ্যোতির্ময় পুরুষ। বললেন, ভয় কি, আমি আছি। অন্ধকার মিথ্যা।

কে আপনি?

আমি অনির্বাণ অগ্নি। তোমার মধ্যে চিরকাল আছি এবং থাকব। ভয় আমাকে আবৃত করে, কিন্তু ধ্বংস করতে পারে না। ভয় অপসারিত কর, আমাকে দেখতে পাবে। ভয়ই অন্ধকার।

ধীরে ধীরে শিখার মধ্যে অন্তর্হিত হয়ে গেলেন আবার।

অংশুমানের কানে কানে কে যেন বলতে লাগল, আমি দাবানল, আমিই বাড়বানল, আমিই আবার কৃশানু। মৃন্ময় প্রদীপের ভীরু কম্পিত শিখায়, বিদ্যুতের উজ্জ্বল প্রকাশে, ইন্দ্রের বজ্রে, মদনের কুসুমশরে, নক্ষত্রের কিরণে, খদ্যোতের দীপ্তিতে, তপস্বীর তপস্যায়, প্রেমিকের প্রেমে, কবির প্রেরণায়, বীরের বীরত্বে, বৃক্ষে লতায় জড়ে চেতনে অণুতে পরমাণুতে সর্বত্রই আমার প্রকাশ। ইলেক্‌ট্রনের যে রূপে তোমরা বিস্মিত, তা আমারই রূপ। নেগেটিভ ইলেক্‌ট্রন চিরকালই পজিটিভের দিকে ধাবিত। আমারই এক অংশ আর এক অংশের সঙ্গে মিলিত হয়ে সম্পূর্ণ হতে চায়। স্বাহা আজও আমার অনুগামিনী, তাই পৃথিবী অজর অমর অক্ষয় শাশ্বত।

নিস্তব্ধ হয়ে গেল সব।

ধীরে ধীরে গুঞ্জন উঠল—যাচ্ছি—যাচ্ছি—তোমারই কাছে অনিবার্য গতিতে—সত্য পথে—

।। একুশ ।।

তিন মাস কেটে গেছে।

সব রকম চেষ্টাই নিষ্ফল হয়েছে। অংশুমানকে পাগল প্রতিপন্ন করা যায়নি। হাইকোর্টের বিচারেও তার প্রাণদণ্ড বাহাল আছে। প্রাণভিক্ষা চেয়ে একটা দরখাস্ত করবার পরামর্শ দিয়েছিলেন হিতৈষীরা। অংশুমান তাতে সই করেনি। অংশুমানের বাবা পুত্রের জীবন ভিক্ষা চেয়েছিলেন রাজদরবারে। মঞ্জুর হয়নি। কাল ভোরে অংশুমানের ফাঁসি হবে। জেলারবাবু এসে প্রবেশ করলেন।

আপনার শেষ ইচ্ছা যদি কিছু থাকে বলুন, তা আমরা সম্ভব হলে পূর্ণ করতে চেষ্টা করব। মানে, যদি কারও সঙ্গে দেখা-টেখা করতে চান—

কার সঙ্গে দেখা করবে সে? মা বাবা? কি হবে তাঁদের সঙ্গে দেখা করে? তাঁরা তো খালি কাঁদবেন! অজানা পথে অশ্রুর পাথেয় নিয়ে কি করবে সে? হঠাৎ মনে হল যদি—

একজনের দেখা পেলে সুখী হতাম, কিন্তু তা কি সম্ভব হবে এখন?

কার সঙ্গে বলুন, চেষ্টা করতে পারি।

ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট নীহার সেনের স্ত্রী অন্তরা দেবীর সঙ্গে।

তিনিও তো আপনার সঙ্গেই যাচ্ছেন।

মানে?

সবিস্ময়ে চেয়ে রইল অংশুমান।

কাল তাঁরও ফাঁসি হবে।

কেন, কি করেছিল সে?

একজন পুলিস অফিসারকে ট্রেন থেকে ঠেলে ফেলে দিয়ে খুন করেছিলেন। তাঁর সঙ্গে দেখা করবেন? দেখি—

জেলারবাবু বেরিয়ে গেলেন।

।। বাইশ ।।

সেদিন পূর্ণিমা। শেষ রাত্রি। সামনেই ফাঁসির মঞ্চ। অন্তরা পাশেই দাঁড়িয়ে আছে। অংশুমান মৃত্যুর কথা ভাবছিল না। মুগ্ধদৃষ্টিতে চেয়ে ছিল সে। অনাবিল জ্যোৎস্নায় মহাকাশ পরিপ্লাবিত। পৃথিবীর ধূলিতে লেগেছে আকাশের স্পর্শ, জেগেছে অনাগতলোকের স্বপ্ন। রূপসাগরের কানায় কানায় অপরূপ সৌন্দর্যসুধা যেন টলমল করছে। আনন্দে আত্মহারা হয়ে উড়ে যেতে চাইছে যেন পৃথিবীর দৃষ্টির ওপারে চক্রবালরেখা ছাড়িয়ে। ওটা মেঘ নয়— নৌকার পাল...ভারতের স্বর্গীয় অমরবৃন্দ বোধ হয় যাত্রা করেছেন আজ মর্ত্যের দিকে...ক্ষুদিরাম-কানাইলালের দল...ওটা তাদেরই পাল-তোলা নৌকো—পালে লেগেছে পারিজাতগন্ধী হাওয়া—দুলছে তাতে নন্দনবনের মন্দারমঞ্জরী....

নঞ-তৎপুরুষ

"বনফুল"

বেঙ্গল পাবলিশার্স
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ—পৌষ, ১৩৬৩
প্রকাশক—শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
বেঙ্গল পাবলিশার্স
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট
মুদ্রাকর—অনিল কুমার বিশ্বাস
উৎপল প্রেস
১১৩/১, আমহার্স্ট ষ্ট্রীট
কলিকাতা
প্রচ্ছদপট পরিকল্পনা—আশু বন্দ্যোপাধ্যায়
ব্লক ও প্রচ্ছদপট মুদ্রণ
ভারত ফোটোটাইপ ষ্টুডিও
বাঁধাই—বেঙ্গল বাইণ্ডার্স
তিন টাকা

এই উপন্যাসটি বিশ্রুত ডস্টয়েভস্কির 'দি ইটার্নাল হাজব্যাণ্ড' অবলম্বনে লেখা]

শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

করকমলেষু—

১

গ্রীষ্মকাল এসে পড়ল কিন্তু পুরন্দরবাবু কার্য্যগতিকে কোলকাতা ছাড়তে পারলেন না। দার্জিলিং যাবেন ঠিক ছিল কিন্তু সমস্ত পণ্ড হয়ে গেল। হাইকোর্টে মকোর্দ্দমাটার কোন কূলকিনারাই দেখতে পাচ্ছেন না তিনি। জমিদারি সংক্রান্ত এই মকোর্দ্দমাটা ক্রমশই জটিল হয়ে উঠছে যেন। বেশ ভালর দিকেই যাচ্ছিল কিন্তু হঠাৎ কেমন বিগড়ে গেল। হু হু করে' টাকা খরচ হচ্ছে, নামজাদা বড় বড় উকিল লাগিয়েছেন, কিন্তু কিছু হচ্ছে না। ক্রমশই অধীর হয়ে উঠছেন তিনি। কাউকে বিশ্বাস করতে পারছেন না, নিজেই নথিপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করতে সুরু করেছেন। দলিলপত্র দেখে নিজে যে এজাহারটা লিখেছিলেন তাঁর উকিল নাকচ করে' দিলে সেটাকে। তিনি ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছেন, সাক্ষী জোগাড় করছেন, একে বলছেন, তাকে ধরছেন—এবং সম্ভবত কাজের চেয়ে অকাজই করছেন বেশী। তাঁর উকিল অন্তত সেই কথাই বলছে। সে তাঁকে দার্জিলিং পাঠাতে পারলে বাঁচে, কিন্তু পুরন্দরবাবু কিছুতেই যেতে পারছেন না। কোলকাতা শহরের ধুলো, ধোঁয়া, গরম, কলের তেল, পচা মাছ, শ্যামবাজারে তাঁর বাড়ির পাশের ড্রেনটা সব হার মেনেছে। পুরন্দরবাবুকে কিছুতেই কোলকাতা থেকে তাড়ান যাচ্ছে না। "কিচ্ছু হচ্ছে না, সব গেল" বারম্বার তিনি মনে মনে আবৃত্তি করছেন, স্নায়বিক বিকার বেড়ে যাচ্ছে রোজ, কিন্তু কিছুতেই কোলকাতা ছাড়তে পারছেন না।

একদা পরিপূর্ণ এবং বিচিত্র জীবন ছিল পুরন্দর রায় চৌধুরীর। যদিও বয়সের হিসাবে তিনি যৌবন-সীমা পার হয়েছেন—এখন আটত্রিশ বছর বয়স তাঁর—কিন্তু বুড়ো হবার বয়স হয়নি এখনও। কিন্তু তাঁর মনে হচ্ছে

বার্দ্ধক্য এসে গেছে এবং অতিশয় অপ্রত্যাশিতভাবে এসে গেছে। বয়সের হিসাবে নয় অন্তরের মানদণ্ডে, বাইরে থেকে নয় ভিতর থেকে অনুভব করছেন তিনি এবং যতই সেটা অনুভব করছেন ততই যেন জীর্ণ হয়ে যাচ্ছেন আরও। বাইরে থেকে এখনও তাঁকে বেশ শক্ত সমর্থ দেখায়। দীর্ঘকায় বলিষ্ঠ ব্যক্তি তিনি, একমাথা কালো কোঁকড়ান চুল—একটি পাকেনি এখনও। যদিও খুব হিরছায় নন, কিন্তু একটু নজর করে' দেখলেই বোঝা যায় যে অভিজাত বংশের ছেলে তিনি। বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষা পেয়েছিলেন। কথায় ব্যবহারে বনেদি ঘরের চিহ্ন সুস্পষ্ট এখনও। ইদানিং অবশ্য চরিত্রে একটু শৈথিল্য এসেছে, মেজাজও খিটখিটে হয়েছে—তবু কিন্তু অভিজাতসুলভ সহজ সহৃদয়তা অবলুপ্ত হয় নি এখনও চরিত্র থেকে। এ ছাড়া তাঁর এমন একটা গভীর আত্মপ্রত্যয় আছে—যা প্রায় অহঙ্কারেরই সম-গোত্র। বুদ্ধি বিদ্যা সংস্কৃতি, এমন কি কিঞ্চিৎ প্রতিভা সত্বেও এই দাম্ভিকতার ঊর্দ্ধে উঠতে পারেন নি তিনি কিছুতেই। তাঁর চোখে মুখে ফুটে বেরুত তা। চোখে মুখে একটা সরলতাও ছিল। পুরাকালে তাঁর টকটকে লাল মুখখানাতে এমন একটা নারীসুলভ কমনীয়তা ছিল যা সকলকে মুগ্ধ করত, বিশেষ করে' নারীদেরই। এখনও অনেকে তাঁকে দেখে বলে—"বাঃ কি চমৎকার রং, কি সুন্দর স্বাস্থ্য ভদ্রলোকের!" কিন্তু তিনি যে ভিতরে ভিতরে স্নায়বিক বিকারে জীর্ণ হয়ে যাচ্ছেন—তা কেউ বুঝতে পারত না। বড় বড় টানাটানা চোখ ছিল তাঁর—দশ বছর আগে এই চোখই মোহ বিস্তার করত অনেকের মনে—এমন প্রদীপ্ত, এমন প্রাণবন্ত ছিল যে লোকে মুগ্ধ না হয়ে পারত না। এখন প্রৌঢ়ত্বের সীমায় এসে সে চোখের দীপ্তি নিবে গেছে, চোখের কোণে বলি রেখা স্পষ্ট হয়ে উঠছে ক্রমশ, আশায় আনন্দে ঝলমল করত একদিন যে চোখের দৃষ্টি, এখন তাতে ফুটে উঠছে নীতিচ্যুত বিপর্য্যস্ত ছন্নছাড়া জীবনের ভণ্ডামি, সন্দেহ ও অবিশ্বাস—কিঞ্চিৎ ব্যথা এবং হতাশা। কেমন যেন একটা নাম-হীন ব্যথা এবং অনির্দ্দিষ্ট

হতাশা। যখন একা থাকতেন তখন এই হতাশাটা আরও যেন প্রবল হয়ে উঠত। আশ্চর্য্যের বিষয় যিনি মাত্র দু'বছর আগে হাসা হৈ হৈ নিয়ে থাকতে ভালবাসতেন, হাসতেন হাসাতেন, চমৎকার গল্প বলতে পারতেন তিনি এখন একা থাকতে পেলে আর কিছু চান না। এই কারণে, তিনি বহু লোকের সঙ্গে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করেছেন যাঁদের সঙ্গে এখনও (মানে, আর্থিক অসচ্ছলতা সত্বেও) সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন না করলেও চলত। অবশ্য দাম্ভিকতা একটা কারণ। তা ছাড়া কোন কিছুর উপরই আস্থা ছিল না আর। কিছু আর ভাল লাগত না, কারও সঙ্গ আর সহ্য করতে পারতেন না। কিন্তু ক্রমশ একা থেকে থেকে তাঁর এই দাম্ভিকতারও রূপ বদলে গেল। একটুও কমল না, বরং ঠিক উল্টো। কিন্তু তা এক বিশেষ রকম অভিনব দাম্ভিকতায় পরিণত হল, নানা বিভিন্ন অদ্ভুত কারণে তিনি ক্ষুণ্ণ হয়ে পড়তেন—যেন তাঁর আত্মসম্মানে আঘাত লাগত। কারণগুলো অদ্ভুত—পূর্ব্বে একথা ভাবাও অসম্ভব ছিল তাঁর পক্ষে। সেগুলো ঠিক আধিভৌতিক নয়, যেন আধ্যাত্মিক। "আধ্যাত্মিক কারণে আরও আত্মসম্মান ক্ষুণ্ণ হওয়া সম্ভব না কি"—নিজেই মনে মনে বলতেন, কিন্তু কিছুতেই উড়িয়ে দিতে পারতেন না।

না, কিছুতেই উড়িয়ে দিতে পারতেন না। একটা 'আধ্যাত্মিক' ব্যাপার সর্ব্বদাই চিত্তকে আকুল করে' রাখত। পূর্ব্বে এমন কখনও হয় নি—এ সব নিয়ে মাথাই ঘামান নি কখনও ইতিপূর্ব্বে। তিনি সেই সব ধারণাকেই আধ্যাত্মিক বলতেন যা কিছুতেই হেসে উড়িয়ে দেওয়া যায় না—আশ্চর্য্যের বিষয়, কিছুতেই যায় না! নিজের অন্তরে অন্তরে তা মানতেই হয়। লোক সমাজে পাঁচজনের সামনে অবশ্য হেসে উড়িয়ে দেওয়া যায়—লোক-সমাজের কথাই স্বতন্ত্র! প্রয়োজন হলে কালই তিনি পাঁচজনের সামনে আধ্যাত্মিকতা নিয়ে রসিকতা করবেন হয় তো। বিবেকের কথা, বিশ্বাসের কথা তখন মনেই থাকবে না। আর প্রকৃতই তাই হচ্ছে। তথাকথিত 'স্বাধীন চিন্তা'

'স্বাধীন মতবাদ' প্রকৃতির কবলে' পড়ে এই সেদিন পর্য্যন্ত তিনি এই করেছেন। বিনিদ্র নয়নে সারারাত যা ভাবেন সকালে লজ্জা পান তার জন্য। আজকাল রাত্রে ঘুমও হচ্ছে না। কিছুদিন থেকে এ-ও লক্ষ্য করছেন যে আজকাল মনটাও বড় সহজে অভিভূত হয়ে পড়ে—কারণ ক্ষুদ্র বৃহৎ না-ই হোক। সুতরাং মনের উপর নির্ভর করতে ভরসা হয় না তাঁর। কিন্তু কতকগুলো ব্যাপার তো উড়িয়ে দেওয়া যায় না। ইদানিং এক অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে। রাত্রে তিনি যা ভাবেন, যা সত্য বলে' অনুভব করেন সকালে ঠিক তা ভাবতে পারেন না, সকালে তা সত্য বলে' স্বীকার করতে দ্বিধা হয়। রাত্রিতে সমস্ত রূপান্তরিত হয়ে যায় যেন। একজন বিশেষজ্ঞ ডাক্তারকে বলেছিলেন ব্যাপারটা। ডাক্তারটি অবশ্য বন্ধুলোক—রহস্যভরেই বলেছিলেন তাকে কথাটা। ডাক্তারবাবু বললেন যে ওরকম হয়। বিশেষত যারা ভাবুক প্রকৃতির তাদের মনে একাধিক বিভিন্ন চিন্তাধারার অস্তিত্ব অসম্ভব নয়। বিনিদ্র রজনীরও এমন একটা অদ্ভুত প্রভাব আছে যে, সমস্ত জীবনের সংস্কার রাতারাতি বদলে যেতে পারে। সব সময়ে হয় না অবশ্য। কেউ যদি তার এই দ্বিবিধ সত্তার সম্বন্ধে খুব বেশী সচেতন হয়ে কষ্ট পায় তাহলে অবশ্য সেটা রোগেরই সূচনা বলে' ধরতে হবে এবং তার চিকিৎসা করা উচিত। সব চেয়ে ভাল হচ্ছে দৈনন্দিন জীবন যাত্রার সুরটাই বদলে ফেলা। আহার, বিহার, পারিপার্শ্বিক সমস্ত আমূল পরিবর্ত্তন করা। সব ছেড়ে ছুড়ে দিনকতকের জন্য কোথাও বেরিয়ে পড়া মন্দ নয়…ওষুধ অবশ্য আছে…কিন্তু…

পুরন্দরবাবু আর শুনছিলেন না—তিনি যা জানতে চাইছিলেন তা জেনে গেছেন। এটা একটা অসুখেরই সূচনা তাহলে।

"অসুখ? এই সব আধ্যাত্মিক ধারণা অসুখ ছাড়া কিছু নয় তাহলে।" মন'কিন্তু কিছুতেই মানতে চাইত না এ কথা।

অনতিকাল পরে আর একটা পরিবর্ত্তন দেখা গেল। এতদিন যা রাত্রিতেই নিবদ্ধ ছিল তা সকালেও ঘটতে লাগল। তফাত রাত্রিতে মনটা

বিষাদে পরিপূর্ণ হয়ে থাকত সকালে হত রাগ। রাত্রির আবেগ সকালে রূপান্তরিত হত তিক্ত আত্মগ্লানিতে। অতীতের—এমন কি সুদূর অতীতের কতকগুলো ঘটনাও—বার বার মনে পড়ত। অদ্ভুতভাবে মনে পড়ত। কিছুতেই এড়াবার উপায় ছিল না। সত্যিই আশ্চর্য্য কাণ্ড। পুরন্দরবাবুর ধারণা হয়েছিল যে তাঁর স্মৃতিশক্তি কমে যাচ্ছে। পরিচিত লোককে চিনতে পারেন না, নাম মনে থাকে না, বই পড়বার দুই একদিন পরেই গল্পটা ভুলে যান—এ সবের জন্যে অনেকবার অপ্রস্তুতও হতে হয়েছে তাঁকে। কিন্তু স্মৃতি-ভ্রংশ হওয়া সত্ত্বেও সুদূর অতীতের এই ঘটনাগুলো—যা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়েছিলেন তিনি—এমন স্পষ্ট এমন পুঙ্খানুপুঙ্খ এমন আশ্চর্য্য রকম নিখুঁতভাবে স্মৃতিপটে ফুটে উঠছে কি করে? মনে হচ্ছে কিছুই যেন অতীত হয় নি, আবার যেন ঘটছে সব, আবার যেন সে জীবন ভোগ করছেন তিনি। অস্বাভাবিক অলৌকিক কাণ্ড বলে' মনে হচ্ছে তাঁর এটা। এমন কতকগুলো ঘটনা মনে পড়ছে যা বিস্মৃতির তলায় একেবারে তলিয়ে গিয়েছিল। শুধু তাই নয়—অতীতের অনেক কথাই অনেকের অনেক সময় মনে পড়ে যায় তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই—কিন্তু পুরন্দরবাবুর যা হচ্ছিল তা একটু বিস্ময়কর। শুধু স্মৃতি নয়, তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সমস্ত অনুভূতি যেন প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করছিলেন তিনি—মনে হচ্ছিল কেউ যেন কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে তাঁকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে সেই জীবনের ঘটনা প্রবাহের মাঝখানে। অতীত জীবনের এই ঘটনাগুলোকে হঠাৎ পাপ বলেই বা মনে হচ্ছে কেন? নিজে বিচার করে' যে সেগুলোকে পাপ বলে' ঠিক করছেন তা নয়—নিজের এই ভারাক্রান্ত, বিষণ্ণ অসুস্থ মনের উপর কিছুমাত্র আস্থা নেই তাঁর—কিন্তু আত্মগ্লানিতে সমস্ত অন্তর পরিপূর্ণ হয়ে উঠছে অকারণে, চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে পড়ছে। মাত্র দু'বছর আগেও কি তিনি ভাবতে পারতেন—কেউ কি ভাবতে পারত—যে তাঁর চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে পড়া সম্ভব!

প্রথম প্রথম যে ঘটনাগুলো তাঁর মনে পড়ছিল সেগুলো ঠিক অশ্রুজনক নয়—ক্ষোভজনক! জীবনের ব্যর্থতার কথা মনে পড়ছিল, কোথায় কবে অপমানিত হয়েছিলেন তা-ও মনে পড়ছিল। একবার একটা লোক কুৎসা রটিয়েছিল তাঁর নামে, ফলে ভদ্রসমাজে গতিবিধি বন্ধ হয়ে গেল তাঁর কিছুদিন। প্রকাশ্য সভায় একটা লোক অপমান করেছিল তাঁকে একবার কিন্তু তিনি মানহানির মকোর্দ্দমা করেন নি; আর একবার এক মহিলা মজলিসের কয়েকটি সুন্দরী সভ্যা তাঁর সম্বন্ধে যে ব্যঙ্গোক্তি করেছিল তার জবাব দিতে গিয়ে আরও হাস্যাস্পদ হয়েছিলেন তিনি; টাকা ধার করে' শোধ করেন নি এরকম কয়েকটা ঘটনাও মনে পড়ল—সামান্য সামান্য টাকা—কিন্তু শোধ করা হয় নি। শুধু তাই নয় তাদের সংস্পর্শ ত্যাগ করেছেন—নিন্দাও করেছেন তাদের নামে। খুব যখন মন খারাপ হ'ত তখন মনে পড়ত—দু' দুবার কি জঘন্য বাজে ব্যাপারে টাকা উড়িয়েছেন তিনি। এক আধটাকা নয়, প্রচুর টাকা! কিন্তু এসবের চেয়ে গুরুতর ঘটনাও মনে পড়ে যেত সঙ্গে সঙ্গেই।

হঠাৎ অপ্রাসঙ্গিকভাবে বুড়ো কেরাণীটার কথা মনে পড়ে যেতে—সেই নিরীহ পক্ককেশ লোকটাকে চোখের সামনে দেখতে পেতেন যেন, বিস্মৃতির তলায় সম্পূর্ণরূপে তলিয়ে গিয়েছিল অথচ···হঠাৎ তার কথা মনে পড়ে যেত। বহুকাল পূর্ব্বে প্রকাশ্যে লোকটাকে অসঙ্কোচে অপমান করেছিলেন তিনি। কোন কারণ ছিল না, কেবল বাহবা পাবার জন্য তীব্র ব্যঙ্গোক্তি করে' একটু আত্মশ্লাঘা অনুভব করবার জন্য অনেক লোকের মাঝখানে অপ্রস্তুত করেছিলেন লোকটাকে। এই রসিকতাটি করার জন্যে বন্ধুবান্ধবদের কাছে খাতির বেড়ে গিয়েছিল তাঁর। ঘটনাটা এত দিন আগে ঘটেছিল যে ভদ্রলোকের নামটা পর্য্যন্ত ঠিক মনে করতে পারছিলেন না তিনি···কিন্তু আর আর, সমস্ত পরিষ্কার মনে পড়ছিল···পারিপার্শ্বিক সমস্ত ছবি হুবহু যেন দেখতে পাচ্ছিলেন। বেশ

মনে পড়ছে, ভদ্রলোক তাঁর মেয়ের পক্ষ সমর্থন করছিলেন—অবিবাহিত মেয়ে—যৌবন সীমা পার হয়েছে—তাকে কেন্দ্র করে' নানারকম গুজব উঠেছিল তখন। ভদ্রলোক প্রথম প্রথম বেশ জোর গলায় তর্ক করছিলেন, পুরন্দরের বাক্যবাণে বিধ্বস্ত হয়ে হঠাৎ তিনি কেঁদে ফেললেন—সকলের সামনে। এখন হঠাৎ অপ্রাসঙ্গিকভাবে সেই ছবিটা মনে পড়ছে। ছোট ছেলের মতো কাঁদছিল লোকটা—ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে—দু'হাতে মুখ ঢেকে। হঠাৎ মনে হল এ ছবি তাঁর মনে বরাবর আঁকা আছে—কোনদিনই মুছে যায় নি। আর আশ্চর্য—তখন যা খুব কৌতুকজনক বলে' মনে হয়েছিল—যেমন ওই ছোট ছেলের মতো দুহাতে মুখ ঢেকে কাঁদাটা—এখন তা আর মোটেই কৌতুকজনক নেই। বরং ঠিক উল্টো।

আর একটা ঘটনা। একবার এক গরীব স্কুল মাষ্টারের যুবতী স্ত্রীকে নিয়ে কুৎসিৎ একটা রসিকতা করেছিলেন তিনি—কেবল নিছক রসিকতার খাতিরেই। সে কথা তার স্বামীর কানে গিয়ে উঠেছিল। ফলে কি হয়েছিল তা অবশ্য তিনি জানেন না, কারণ ঠিক তারপরই তাঁকে বাইরে চলে যেতে হয়েছিল—কিন্তু এখন তাঁর মনে হচ্ছে ও জাতীয় রসিকতার বিষময় ফল হওয়া অসম্ভব নয়—হয় তো হয়েছিল…এই নিয়ে তাঁর কল্পনা হয় তো অনেক জাল বুনতো—কিন্তু আর একটা কথা মনে পড়ে গেল হঠাৎ। এই সেদিনের কথা। সামান্য একটা চাকরাণির সঙ্গে কি কাণ্ড করলেন তিনি…তার যে প্রেমে পড়েছিলেন তা নয়…কিন্তু তাকে নিয়ে যা ঘটল তা লজ্জাকর। আর সব চেয়ে লজ্জাকর তাকে ফেলে পালানো… অসহায় শিশুটার দিকে পর্যান্ত চেয়ে দেখেন নি তিনি…অবশ্য এও ঠিক—একটা জরুরি দরকারে তাঁকে চলে' যেতে হয়েছিল সে সময়—দেখা করবার সময়ও ছিল না—তারপর এক বছর ধরে' তিনি মেয়েটাকে খুঁজেছিলেন, কিন্তু আর পান নি। এ রকম বহু ঘটনার স্মৃতি মনে জাগছে…মনে হচ্ছে আরও আছে। আত্মসম্মান সত্যিই ক্ষুণ্ণ হয়ে পড়ছে ক্রমশঃ।

আত্মসম্মানবোধের মানদণ্ডটাও তাঁর বদলে যাচ্ছিল ইদানিং। আজকাল (অবশ্য, মাঝে মাঝে) পায়ে হেঁটে বেড়াতে তাঁর আর লজ্জা হত না তত। নিজের গাড়ি নেই, রাস্তায় রাস্তায় অফিসে আদালতে টো-টো করে' ঘুরে বেড়াচ্ছেন, পরণে আড় ময়লা জামা কাপড়—আগে এ অবস্থায় পরিচিত কোন লোকের সঙ্গে দেখা হলে কুণ্ঠিত হয়ে পড়তেন—আজকাল ভ্রূক্ষেপই করেন না। শুধু তাই নয়। সত্যিই এরকম মনোভাব হচ্ছিল তাঁর আজকাল কিন্তু সব সময়ে নয়। মাঝে মাঝে এরকম হত—বিশেষ করে' যে সময়ে তাঁর মানসিক চঞ্চলতা বাড়ত, শারীরিক দুর্ব্বলতায় অবসন্ন হয়ে পড়তেন—সেই সময়ে মনে হ'ত…। কিন্তু না, আত্মসম্মানবোধের চেহারাটা বদলে ছিল সত্যিই। যে সব বাহ্যিক আড়ম্বর আত্মমর্য্যাদার জন্যে প্রয়োজনীয় মনে হত আগে, আজকাল তার অভাব বা আধিক্য মনকে আর নাড়া দেয় না তত। আজকাল সমস্ত মন একটি কথাই ভাবছে কেবল এবং দিবারাত্রি সেই দিকে উন্মুখ হয়ে আছে।

শ্লেষ-ভরে মাঝে মাঝে ভাবতেন (এবং যখনই আজকাল নিজের সম্বন্ধে ভাবতেন শ্লেষ থাকত তাতে)—"স্বর্গে হয় তো ভগবান ভদ্রলোক ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন আমার জন্যে। আমার চরিত্র সংস্কার না করা পর্য্যন্ত ঘুম হচ্ছে না তাঁর বোধ হয়। ক্রমাগত জাগিয়ে তুলছেন বীভৎস স্মৃতিগুলোকে। অনুতাপের অশ্রু! হতে পারে। কিন্তু কিছু হবে না। বন্দুক ছুঁড়লে কি হবে—টোটা একদম খালি! আমি জানি না নিজেকে? স্মৃতি অনুতাপ চোখের জল—সমস্ত সত্ত্বেও কিছু করবার উপায় নেই আমার। প্রৌঢ়ত্বের প্রজ্ঞা সত্ত্বেও আমি কিছু বদলাই নি। কালই যদি প্রলোভন আসে, কালই যদি ঘটনাচক্র এমন হয় যে একটা গুজব রটিয়ে দিলেই আমার স্বার্থসিদ্ধি হবে, কালই আমি আবার গুজব রটিয়ে দিতে পারি যে ওই স্কুলমাষ্টারের রূপসী বউ লুকিয়ে টাকা নিয়েছিল আমার কাছ থেকে। কালই পারি আবার—একটু ইতস্তত করব না। অতিশয় ঘৃণ্য জেনেও করব না। ফের যদি

আমাকে সেই পুরুতটা আবার অপমান করে···আবার জুতিয়ে মুখ ছিঁড়ে দেব তার—তার মেয়ের কান্নায় দৃকপাত করব না। সুতরাং টোটায় কিছু নেই···বন্দুক ছোঁড়া বৃথা। বুঝলেন ভগবান মশাই ? অতীতের দুষ্কৃতি স্মরণ করিয়ে, লাভ কি...নিজের হাত থেকেই যে পরিত্রাণ নেই আমার···”

যদিও স্কুল মাষ্টারের স্ত্রীর নামে গুজব রটাবার অথবা পুরোহিতের মুখে জুতো মারবার কোন সুযোগ আর উপস্থিত হল না—কিন্তু উপস্থিত হলে যে তিনি দ্বিধা করবেন না এই চিন্তাই পুরন্দরবাবুকে মগ্ন করতে লাগল। কোন মানুষই অনুতাপানলে একটানা দগ্ধ হয় না, মাঝে মাঝে ছাড়া পায় এবং সেই মুক্ত অবস্থায় জীবনকে উপভোগও করে।

পুরন্দরবাবুরও অনুতাপের অবকাশে জীবন উপভোগে আপত্তি ছিল না। অরুচিও ছিল না। কিন্তু কলিকাতা-প্রবাস মাঝে মাঝে দুঃসহ হয়ে উঠত ওঁর কাছে। জ্যৈষ্ঠমাস শেষ হতে চলল—মাঝে মাঝে ইচ্ছে করছিল মকোদ্দমা চুলোয় যাক—সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে, পিছন দিকে না চেয়ে··· সোজা কোথাও দৌড় দিতে। বনে পর্বতে যেখানে হোক। হরিদ্বারে গেলে হয়! কিন্তু ঘণ্টাখানেক পরেই সব উলটে গেল আবার। মনে হল—‘হরিদ্বারেই যাই আর যেখানেই যাই ‘কর্মফল’ তো ছাড়বে না কিছুতেই। তা ছাড়া দায়িত্ব যখন নিয়েছি—তখন ফেলে পালানোর কোন মানে হয় না। পালাবই বা কেন? এই ধুলো, এই গরম, এই বিশৃঙ্খলা—এই তো বেশ। আদালতে ওই যে শকুনের ঝাঁক বসে রয়েছে···প্রকাশ্যভাবে দিব্যি ছেঁড়াছেঁড়ি করে খাচ্ছে—সঙ্কোচ নেই, শঙ্কা নেই, ভণ্ডামি নেই। রাস্তায় জনস্রোত চলেছে, স্বার্থপর, ভীরু, লোভীর দল···তার মতো পাষণ্ডের পক্ষে এই তো স্বর্গ! সমস্তই খোলাখুলি, সমস্তই স্পষ্ট পরিষ্কার—ঢাকে ঢাক গুড় গুড় নেই। তথাকথিত ভদ্র সমাজের মুখোশ-পরা ভণ্ডামির চেয়ে এ ঢের ভাল। এ সারল্যকে বরং শ্রদ্ধা করে চলে। যাব না—এইখানেই থাকব আমি।”

২

১৫ই জ্যৈষ্ঠ। অসম্ভব রকমের গরম পড়েছে। সেদিন পুরন্দরবাবুকে ঘোরাঘুরিও করতে হয়েছে খুব, পায়ে হেঁটে গাড়ি চড়ে'—সবরকমে। কর্পোরেশনের নামধাদা মেম্বর এবং উকিল বিশম্ভরবাবুর সঙ্গে দেখা করার বিশেষ দরকার, কিন্তু কিছুতেই ধরতে পারছেন না তাঁকে। শেষে ঠিক করেছেন সন্ধ্যে বেলা—বালিগঞ্জে তাঁর বাড়ীতে গিয়ে অতর্কিতে ধরবেন। ছটার সময় একটা হোটেলে গিয়ে ঢুকলেন। রোজই ঢোকেন। রোজই প্রায় টাকা দেড়েক খরচ হয়ে যায়। আগে যখন সচ্ছল অবস্থা ছিল—দশ টাকার কম হত না। এখন দেড় টাকায় কুলিয়ে নিতে হয়। অবস্থা খারাপ হয়েছে—উপায় কি! খেতে বসে যদিও রোজ মনে হত এসব অখাদ্য খাওয়া যায় না—খেতে আরম্ভ করলে কিন্তু শেষ করে' ফেলতেন সব—কিছু পড়ে' থাকত না। বরং এমন গোগ্রাসে খেতেন যেন কতদিন উপবাসী আছেন। তৃপ্তিও যে না হত তা নয়। নিজের এই বুভুক্ষা দেখে নিজেই অবাক হয়ে যেতেন। ভাবতেন—"দুষ্টু ক্ষিদে এ। স্বাভাবিক নয়। হতেই পারে না"।

সেদিন হোটেলে যখন ঢুকলেন, তখন মনটা খিঁচড়ে আছে। চেয়ারটা সশব্দে টেনে বসলেন, টেবিলের উপরে দুই কনুএর ভর দিয়ে অন্যমনস্ক হয়ে বসে রইলেন খানিকক্ষণ। খোশমেজাজে থাকলে তিনি শিষ্টতার চরম করতে পারেন—কিন্তু এখন মনের অবস্থা এমন যে সামান্যতম কারণে চীৎকার চেঁচামেচি করে' প্রলয়কাণ্ড করে' বসাও অসম্ভব নয় কিছু। অকারণে

কণ্ঠস্বর চড়িয়ে হুকুম করলেন—এই কাটলেট্ দিয়ে যা! কাটলেট্ দিয়ে গেল…ভেঙে খেতে যাবেন…হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন—একটা অদ্ভুত কথা মনে পড়ে গেল…ভগবান জানেন কি করে'—ঠিক সেই মুহূর্তে যেন তিনি তাঁর অবসাদের মূল কারণটা আবিষ্কার করে ফেললেন। বিশেষ করে' এই ক'দিন থেকে যে অনির্দিষ্ট অসহ্য মানসিক যন্ত্রণাটা তিনি ভোগ করছিলেন—এক মুহূর্তের জন্য যা নিস্তার দেয়নি তাঁকে—হঠাৎ যেন তার কারণটা বুঝতে পারলেন তিনি। জলের মতো পরিষ্কার হয়ে গেল সমস্ত।

"সেই লোকটা !"…একটু উত্তেজনাভরেই অস্ফুট কণ্ঠে আবৃত্তি করলেন তিনি—"বেঁটে রোগা সেই লোকটা ঠিক !"

ভাবতে লাগলেন এবং যতই ভাবতে লাগলেন ততই যেন আরও ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল মনটা। অসাধারণ অদ্ভুত লোকটা! কিন্তু না, অসাধারণই বা কেন, অদ্ভুতই বা কি আছে এতে। বেঁটে রোগা লোক তো কত আছে!

প্রায় দিন পনের আগে—ঠিক মনে ছিল না তার, কিন্তু পনের দিনই হবে—কলেজ ষ্ট্রিট হ্যারিসন রোডের চৌমাথাটায় লোকটাকে প্রথম দেখেছিলেন তিনি। বেঁটে রোগা লোকটা। গট্ গট্ করে চলে যাচ্ছিল, কিন্তু তাঁকে দেখে যেন দাঁড়িয়ে পড়ল এবং খানিকক্ষণ একদৃষ্টে চেয়ে রইল তাঁর দিকে। পুরন্দরবাবুর মনে হল মুখটা যেন চেনাচেনা। কোথায় যেন দেখেছেন। তখনই আবার মনে হল 'জীবনে কত সহস্র মুখই তো দেখেছি—সব মনে রাখা সম্ভব নাকি!' এগিয়ে গেলেন এবং প্রায় ভুলেই গেলেন তাঁর কথা। কিন্তু মনের অবচেতন লোকে ছাপটা লেগেই রইল এবং ক্রমশঃ যেন একটা নাম-হীন বিরক্তিতে রূপান্তরিত হল। এখন, পনের দিন পরে সমস্তটা স্পষ্ট মনে পড়ছে আবার, এ ক'দিনের বিরক্তির কারণটা যে ওই তাও বুঝতে পারছেন এখন। আগে ধরতে পারেন নি…আজও সকালে দেখা হয়েছিল লোকটার সঙ্গে—তাই সমস্ত দিন মনটা খিঁচড়ে আছে। আগে একেবারেই এটা মাথায় ঢোকেনি তার।

বেঁটে লোকটা কিন্তু তোলবার অবসর দিলে না তাঁকে। তারপর দিনই আবার দেখা হল রাস্তায়—ওই হ্যারিসন রোড কলেজ ষ্ট্রীটের মোড়েই। ঠিক তেমনি করে থমকে দাঁড়াল, ঠিক তেমনি করে' একদৃষ্টে চেয়ে রইল তাঁর দিকে। "চুলোয় যাক্"—পুরন্দরবাবু ব্যাপারটাকে মন থেকে ঝেড়ে ফেলবার চেষ্টা করলেন। এক একটা লোককে দেখলে এমন বিতৃষ্ণা হয়!

ঘণ্টাখানেক পরে তাঁর আবার মনে হলো—"এর আগে লোকটাকে কোথাও দেখেছি,—সমস্ত সন্ধ্যেটা মেজাজ খারাপ হয়ে রইল। রাত্রে একটা দুঃস্বপ্নও দেখলেন। এর কারণও যে ওই লোকটা হতে পারে তা মনে হ'লো না তাঁর। সন্ধ্যা বেলা তো তার কথা একবারও ভাবেননি তিনি। আর তা ছাড়া ঐরকম একটা অপদার্থ লোক যে তাঁর মনকে এতটা অধিকার করে' থাকবে তাঁর মেজাজ খারাপ করে' দেবে' একথা স্বীকার করাও যে লজ্জাকর! দু'দিন পরে আবার তার সঙ্গে দেখা হয় একটা ভিড়ের মধ্যে। মনে হল লোকটা তাঁকে চিনতে পেরেছে যেন। তার দিকে এগিয়েও আসছিল, কিন্তু ভীড়ের জন্য পারলে না, নমস্কার করবার জন্য হাতও তুলেছিল। চীৎকার করে' ডাকলে নাম ধরে' মনে হল...পুরন্দরবাবু এটা অবশ্য ঠিক শুনতে পান নি। রাগ হল তাঁর—"কে লোকটা! আমাকে যদি চিনেই থাকে কাছে আসছে না কেন। এমনভাবে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াবার মানে কি?" একটা গাড়ি ডেকে তাতে চড়ে বসলেন। খানিকক্ষণ পরেই মামলা নিয়ে উকিলের সঙ্গে তর্কাতর্কিও করলেন খুব। সন্ধ্যাবেলা কিন্তু মন আবার অবসন্ন হয়ে পড়ল—অদ্ভুত রকম একটা অবসাদে সমস্ত মন আচ্ছন্ন হয়ে গেল। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলেন, "লিভারটাই খারাপ হয়েছে সম্ভবত। শরীরে জুৎ পাচ্ছি না কিছুতে..."

এই তৃতীয় সাক্ষাৎ। এর পর উপর্যুপরি আর দেখা হয় নি পাঁচদিন। তবু কিন্তু মন থেকে দূর হয়নি সে। পুরন্দরবাবু একথা আবিষ্কার করে'

চমকেই গেলেন একদিন—"লোকটার জন্যই শরীর খারাপ হচ্ছে না কি! অদ্ভুত তো! কি করছে ও কোলকাতায় এতদিন ধরে'! আমাকে চিনতে পেরেছে? কিন্তু, আমি কিছুতেই চিনতে পারছি না তো। উস্‌কো-খুস্‌কো চুল, করুণ চোখের দৃষ্টি। করুণ দৃষ্টি হবার মানে কি। কাছে গিয়ে ভাল করে দেখলে চিনতে পারব বোধহয়..."

বিস্মৃতি-সাগরে—তরঙ্গ উঠল যেন দু'একটা—মনে আসছে আসছে, কিন্তু আসছে না। অনেক সময় একটা নাম বা কথা যেমন মনে আসে কিন্তু মুখে আসে না, তেমনি—নাগাল পেয়েও যেন পাওয়া যাচ্ছে না।

"অনেক দিন আগে...ঠিক কোথায় যেন···ও···না-না চুলোয় যাক। কি একটা সামান্য বিষয় নিয়ে মাথা ঘামিয়ে মরছি..."

ভয়ঙ্কর রাগ হল। কিন্তু সন্ধ্যেবেলা হঠাৎ মনে পড়ল যে সকালে রাগ হয়েছিল। এবং 'ভয়ঙ্কর' রাগ হয়েছিল। মনে হতেই কেমন যেন অপ্রস্তুত হয়ে গেলেন।···শুধু আশ্চর্য নয়, কেমন যেন দিশাহারা হয়ে পড়লেন। কি যে ব্যাপার কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। রাগ হবার কারণ কি!

"নিশ্চয়ই হেতু আছে কোন...তা না হলে কোথাও কিছুই নেই.. আশ্চর্য্য!" এর বেশী আর ভাবনা এগোল না সেদিন।

তার পরদিন আরও বেশী রাগ হল এবং মনে হ'ল যে রাগ হবার সঙ্গত হেতুও আছে, রাগ করে' কিছুমাত্র অন্যায় করেন নি তিনি। একি কাণ্ড! চতুর্থবার দেখা হয়েছিল বেঁটে লোকটার সঙ্গে। লোকটা একবার হঠাৎ যেন আবির্ভূত হল—মাটি ফুঁড়ে বেরুল যেন। কর্পোরেশনের মেম্বার নামজাদা উকিল বিশ্বম্ভর বোসের সঙ্গে অপ্রত্যাশিতভাবে রাস্তায় দেখা হয়ে গেল... বালিগঞ্জে এঁরই বাড়িতে অতর্কিতে সন্ধ্যেবেলা যাবেন ভেবেছিলেন... ভদ্রলোকের সঙ্গে তেমন আলাপ ছিল না...কিন্তু মনোর্দ্দনার জন্য তাঁর সঙ্গে দেখা করার বিশেষ প্রয়োজন। অপরিহার্য্য ব্যক্তিটি কিন্তু ক্রমাগতই

পুরন্দরবাবুকে এড়িয়ে চলছিলেন। হঠাৎ তাঁরই সঙ্গে রাস্তায় দেখা! পুরন্দরবাবু কথা কইতে কইতে তাঁর পাশে পাশে হাঁটছিলেন এবং প্রাণপণে চেষ্টা করছিলেন তাঁকে বাগাতে। আর কিছু নয়, একটা ব্যাপারের আলোচনা-প্রসঙ্গেও ভদ্রলোক যদি দু'একটা কথা ফাঁস করে' ফেলেন—ওই দু'একটা কথা জানতে না পারলে পুরন্দরবাবুর মামলার বিশেষ ক্ষতি হবার সম্ভাবনা। কিন্তু চতুর বৃদ্ধ উকিল ঘাড় নেড়ে মুচকি হেসে আসল ব্যাপারটা এড়িয়ে যেতে লাগলেন ক্রমাগত। পুরন্দরবাবুও ছাড়বার পাত্র নন। নানা যুক্তি বিস্তার করে' তিনিও জড়াবার চেষ্টা করছিলেন ভদ্রলোককে, ঠিক এই সময় সামনের ফুটপাথে হঠাৎ বেঁটে লোকটা আবির্ভূত হল। তাদের দুজনের দিকেই নির্নিমেষে চেয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে...মনে হল তার চোখেমুখে একটা বিদ্রূপও ফুটে উঠেছে যেন।

উকিল ভদ্রলোককে তাঁর গন্তব্যস্থানে পৌঁছে দিয়ে পুরন্দরবাবু ভাবলেন—আঃ, কি পাপের ভোগ! ওই অপয়াটার জন্যই সব মাটি হয়ে গেল বোধ হয়। একটি কথাও বার করতে পারা গেল না! লোকটার উদ্দেশ্য কি? গোয়েন্দা নয় তো। মনে হচ্ছে পিছু নিয়েছে! কেউ লাগিয়ে দিয়েছে হয় তো...কিম্বা...কিন্তু না, ওর চোখ মুখে একটা ব্যঙ্গ মূর্ত হয়ে উঠেছে মনে হল যেন। কাকে ব্যঙ্গ করছে? আমাকে? চাবকে পিঠের চামড়া তুলে ফেলব ব্যাটার। আজই একটা হাণ্টার কিনতে হবে। না, এর বিহিত করা দরকার অবিলম্বে। কে লোকটা? জানতেই হবে, জানতেই হবে যেমন করে' হোক...।

এই চতুর্থ সাক্ষাতের তিন দিন পরে উপরোক্ত হোটেলে পুরন্দরবাবু সত্যই অত্যন্ত বিচলিত এবং অভিভূত হয়ে পড়লেন। নিজের প্রবল অহঙ্কার সত্ত্বেও ব্যাপারটা উড়িয়ে দিতে পারলেন না তিনি। আগাগোড়া সমস্ত পর্য্যালোচনা করে স্বীকার করতে বাধ্য হলেন যে গত পনর দিনের সমস্ত অবসাদ, সমস্ত হতাশা, সমস্ত মানসিক বিকারের একমাত্র কারণ ওই

রোগা বেঁটে লোকটা! "হয়তো আমার মাথা খারাপ হয়েছে"—তাঁর মনে হল—"হয়তো তুচ্ছ একটা জিনিষকে বড় করে দেখছি···কিন্তু 'হয় তো'র ওপর নির্ভর করে এটাকে কল্পনা-বিলাস বলে' উড়িয়ে দিয়েও তো লাভ নেই! কি সুবিধে হবে তাতে! রাস্তার যে কোন বদমাশ যদি এমনভাবে বিপর্য্যস্ত করে' ফেলতে পারে আমাকে—তাহলে তো···মানে তাহলে তো···"

এই পঞ্চম সাক্ষাৎটা—যা এত বিচলিত করেছিল পুরন্দরবাবুকে—ওই বেঁটে লোকটির দিক থেকে বিচার করলে খুব যে আপত্তিকর তা নয়। পুরন্দরবাবুই বরং অদ্ভুত ব্যবহার করেছিলেন। বেঁটে লোকটি বিশেষ কিছু করে নি। পুরন্দরবাবুর পাশ দিয়ে একটু দ্রুতবেগে সে চলে গিয়েছিল কেবল। তাঁর দিকে তাকায় নি, তাঁকে যে সে চিনতে পেরেছে এমনও কোন ভাব প্রকাশ করে নি, বরং চোখ নীচু করে' কারও দৃষ্টি আকর্ষণ না করে' যথাসম্ভব দ্রুতবেগেই চলে গিয়েছিল সে। পুরন্দরবাবুই হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন—"এই শুনছেন মশাই, পালাচ্ছেন কেন—শুনুন শুনুন—কে আপনি···"

এ রকম প্রশ্ন (বিশেষতঃ ওই চীৎকারটা) খুবই অশোভন হয়েছিল। পুরন্দরবাবু পরে সেটা হৃদয়ঙ্গমও করেছিলেন। বেঁটে লোকটা তাঁর চীৎকার শুনে একবার ঘুরে দাঁড়াল, মনে হল যেন হকচকিয়ে গেছে, তার পর হাসল একটু; পরমুহূর্ত্তেই মনে হল কি যেন বলতে চাইছে, দ্বিধাভরে দাঁড়িয়ে রইল দু'এক সেকেণ্ড, তারপর হঠাৎ ঘুরে ছুট দিল ঊর্দ্ধশ্বাসে। পুরন্দরবাবু সবিস্ময়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

ভাবলেন—"মনে হচ্ছে ও নয় আমিই যেন গায়ে পড়ে" আলাপ করতে চাইছি। আমার অদ্ভুত আচরণ থেকে তাই বোঝায় অন্ততঃ—"

হোটেলের খাওয়া সেরে বেরিয়ে পড়লেন তিনি বালিগঞ্জের উদ্দেশ্যে। কর্পোরেশনের সেই উকিল ভদ্রলোককে ধরতে হবে যেমন করে' হোক। গিয়ে দেখেন তিনি বাড়ি নেই। শুনলেন ধর্ম্মতলায় কোথায় যেন নিমন্ত্রণ

খেতে গেছেন কার জন্ম-তিথি উপলক্ষে। কখন ফিরবেন ঠিক নেই, রাত্রে মা-ও ফিরতে পারেন। ঠিকানাটা জেনে নিলেন পুরন্দরবাবু—একবার মনে করলেন ধর্মতলায় গিয়েই ধরবেন তাঁকে। কিন্তু একটু পরেই মনে হল অনিমন্ত্রিত যাওয়াটা অশোভন হবে সেখানে। রাগ হল ভয়ানক! গাড়িটা ছেড়ে দিলেন—সুরু করলেন হাঁটতে। শ্যামবাজার অনেক দূর—হোক দূর—হেঁটেই যাবেন তিনি। শরীরটা চালনা করা দরকার। যেমন করে' হোক অনিদ্রাটা দূর করতে হবে, আজ রাত্রে অন্ততঃ ভাল ঘুম হওয়া নিতান্ত দরকার···সমস্ত দেহ মন এখন উত্তেজিত হয়ে রয়েছে···ক্লান্ত না হলে ঘুম আসবে না। হাঁটতে লাগলেন। বাড়ি এসে পৌঁছলেন রাত এগারটায় এবং সত্যিই তখন অত্যন্ত ক্লান্ত তিনি।

যে বাসাটা পুরন্দরবাবু ভাড়া করেছিলেন—যদিও অহরহ তার নানারকম খুঁত তাঁর চোখে পড়ত—যদিও তিনি রোজ অন্তত পঞ্চাশ বার বলতেন যে লক্ষ্মীছাড়া মকোদ্দমাটার জন্যে তাঁকে এই হতচ্ছাড়া বাসাটায় বাধ্য হয়ে বাস করতে হচ্ছে—বাসাটা কিন্তু নিতান্ত মন্দ ছিল না। দোতলায় খান-দুই চমৎকার ঘর—বাথরুম—তা ছাড়া আর একটি ছোট ঘর। পুরন্দরবাবু এটাকে নিজের পড়ার ঘর বানিয়ে ছিলেন। অর্থাৎ সেখানে একটা টেবিল, খান কয়েক চেয়ার, টেবিলের উপর খবরের কাগজ, বইপত্র ছড়ানো থাকতো। পুরন্দরবাবু যে ঘরটায় শুতেন—সেটা বেশ বড় ঘর—ঠিক রাস্তার উপর। ঘরের কোণে একটা সোফা ছিল তাতেই শুতেন তিনি। ঘরের আসবাবপত্রগুলিও নেহাত খেলো নয়, যখন অবস্থা স্বচ্ছল ছিল তখনকার দিনের শৌখীন জিনিসও ছিল দু'চারটে। ভাল চীনেমাটির বাসন কিছু, ব্রোঞ্জের মূর্ত্তি কয়েকটা, ভাল একখানা কার্পেট, ভাল ছবি গোটা দুই···কিন্তু সবই মলিন, ধূলিধূসরিত, এলোমেলো। তাঁর চাকর রামা বাড়ি চলে যাওয়ার পর থেকে চারদিক আরও যেন অপরিচ্ছন্ন হয়ে উঠেছে। রামা ছুটি নিয়ে বাড়ি গেছে। দারোয়ানের ভাই হরির তার বদলে কাজকর্ম

করে দেওয়ার কথা। সেই আশায় তিনি যখন বাইরে যান, ঘরের চাবি দারোয়ানের কাছে রেখে যান। হরি কিন্তু মাইনেটি নেওয়া ছাড়া আর কিছু করে না। পুরন্দরবাবুর মাঝে মাঝে সন্দেহ হয় ছোঁড়ার হাতটানও আছে সম্ভবত। কিন্তু সবই তিনি সহ্য করেন—যা হয় হোক! বেশ তো আছেন একা একা! একা কিন্তু থাকারও একটা সীমা আছে। মাঝে মাঝে অসহ্য বোধ হত। বিশেষতঃ ঘরে ফিরে যখন দেখতেন—চতুর্দ্দিক অপরিচ্ছন্ন, বিছানা অগোছালো, টেবিলে, চেয়ারে, ছবিতে, আয়নায় ধুলো জমে আছে।

সেদিন কিন্তু এসব কিছু হ'ল না। জুতো জামা খুলেই সোজা গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লেন। ঘুমুতে হবে…বাজে চিন্তা করে' সময় নষ্ট করা হবে না…। বালিশে মাথা রাখা মাত্রই ঘুমিয়েও পড়লেন। এ রকম আশ্চর্য্য ঘটনা গত এক মাসের মধ্যে ঘটে নি।

তিন ঘণ্টা ঘুমোলেন তিনি। গভীর ঘুম কিন্তু নয়। স্বপ্ন দেখলেন নানারকম। অদ্ভুত সব স্বপ্ন—লোকে জ্বরের ঘোরে যেমন স্বপ্ন দেখে অনেকটা তেমনি। যেন তিনি একটা গুরুপ্ত করে লুকিয়ে আছেন—লোকে তা জানতে পেরেছে…দলে দলে তাঁর দিকে আসছে সব। প্রকাণ্ড ভীড় জমে গেছে একটা। কিন্তু আসছে, ক্রমাগতই আসছে। ঘরের কপাট বন্ধ করা যাচ্ছে না…ভীড়ের মধ্যে তিনি কিন্তু একদৃষ্টে একটি লোককেই দেখছিলেন কেবল—তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু একজন, অনেকদিন আগে মারা গেছে…এ হঠাৎ এল কি করে! আর সব চেয়ে বিব্রত বোধ করছিলেন তার নাম মনে না করতে পেরে। কিছুতেই নামটা মনে পড়ছিল না। কেবল মনে হচ্ছিল খুব ভালবাসতেন তাকে। সমস্ত জনতাও যেন তারই মুখের দিকে চেয়েছিল—সেই যেন ঠিক করে' দেবে পুরন্দর দোষী না নির্দোষ…সবাই যেন অধীরভাবে অপেক্ষা করছিল। সে কিন্তু নির্ব্বাক হয়ে টেবিলের ধারে চুপ করে' বসেছিল। কিছুতেই কথা বলবে না। গোলমাল বাড়তে লাগল, অস্থির হয়ে উঠছে সবাই…সে কিন্তু নির্ব্বাক।

এ নীরবতা অসহ্য হয়ে উঠল পুরন্দরবাবুর পক্ষে···তিনি উঠে ঠাস করে' একটা চড় মারলেন তাকে চুপ করে থাকার জন্য। আর মেয়ে যেন উপভোগ করলেন সেটা। ভয় হল, দুঃখ হল, যা করলেন তার জন্যে শিউরে উঠলেন মনে মনে—কিন্তু শিহরণটাও উপভোগ করলেন যেন। উত্তেজিত হয়ে—আবার মারলেন তাকে, আর একবার, আর একবার, আর একবার···রাগে, ক্ষোভে, আতঙ্কে যেন বুঁদ হয়ে গেলেন, শেষে উন্মাদ হয়ে উঠলেন, উন্মাদনার অন্তরালে অদ্ভুত একটা আনন্দও যেন শির শির করে' বইতে লাগল শরীরের শিরা-উপশিরায়···ক্রমাগত মেরে যেতে লাগলেন ··যেন থামতে পারছেন না। মনে হতে লাগল নিঃশেষ করে ফেলি সব—চুরমার করে ফেলি সমস্ত। হঠাৎ বিপর্যয় ঘটে গেল একটা। সবাই একসঙ্গে চীৎকার করে খোলা দরজাটার দিকে ছুটল কিসের প্রত্যাশায় যেন···আর সঙ্গে সঙ্গে ইলেকট্রিক বেলটা বেজে উঠল। তিন বার বাজল··· ঝন-ঝন ঝন-ঝন ঝন-ঝন···ঝনাৎকারের চোটে আকাশ ভেঙে পড়বে যেন। পুরন্দরবাবুর ঘুম ভেঙে গেল···তড়াক করে বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠে দরজার দিকে ছুটলেন তিনিও। ইলেকট্রিক বেলটা স্বপ্ন নয়—তাঁর মনে হল—সত্যিই এসেছে কেউ। এমন তীক্ষ্ণ প্রবল ঝনাৎকার স্বপ্ন হতে পারে না কিছুতে···।

কিন্তু কি আশ্চর্য, এটাও স্বপ্ন। দরজাটা খুললেন, সিঁড়ির কাছে গিয়ে উঁকি দিয়ে দেখলেন পর্যন্ত। কোথাও কেউ নেই। আশ্চর্য লাগল বটে, কিন্তু আরামও পেলেন মনে মনে। ঘরে ঢুকে আলো জ্বাললেন, তার পর মনে হল কপাটে খিল দেন নি। ফিরে দেখলেন একবার, না খিল দেন নি, ভেজান আছে। আগেও অনেকবার রাত্রে ফিরে ঘরে খিল দিতে ভুলেছেন তিনি। কি আর হবে—থাক। ঘড়িতে আড়াইটে বাজার শব্দ হল।···তিন ঘণ্টা ঘুমিয়েছেন তাহলে।

স্বপ্ন দেখে মনটা এমন খারাপ হয়ে গিয়েছিল যে আর শুতে ইচ্ছে হল না।

একটা সিগারেট ধরিয়ে ঘরে পায়চারি করতে লাগলেন। জানালার কাছে গিয়ে পরদাটা সরিয়ে দিলেন। গ্রীষ্মকালের রাত্রি শেষ হয়ে এল প্রায়—ভোরের আভাস দেখা যাচ্ছে। স্বপ্নটা কিন্তু কিছুতেই তাড়াতে পারছিলেন না মন থেকে। ওই লোকটাকে তিনি যে মেরেছেন—মারা যে সম্ভব হল তাঁর পক্ষে—এই অনুভূতিটাই কষ্ট দিচ্ছিল তাঁকে। কিছুতেই মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারছিলেন না।

"ও রকম লোক নেই, কেউ ছিল না, থাকতে পারে না···ওটা শুধু স্বপ্ন। কেন মাথা ঘামাচ্ছি এ নিয়ে!"

যতই নিজেকে বোঝাতে লাগলেন ততই উত্তেজনা বাড়তে লাগল, ততই যেন মনে হতে লাগল তাঁর সমস্ত কষ্টের মূল কারণ এ ছাড়া আর কিছু নয়··· আসন্ন একটা বিপদ যেন ঘনিয়ে আসছে।

ক্রমশঃ বৃদ্ধ এবং দুর্বল হয়ে পড়ছেন এ কথা ভাবলে কষ্ট হত তাঁর। কিন্তু মন খারাপ হয়ে গেলে নিজেকে আরও কষ্ট দেবার জন্য নিজের বার্দ্ধক্য এবং দৌর্ব্বল্যকেই বহুগুণ বাড়িয়ে তুলতেন তিনি।

"জরা"—মনে মনে আবৃত্তি করতে লাগলেন তিনি—"হাঁ! জরাই। জরা ছাড়া আর কি। শরীরে শক্তি নেই—স্মরণ শক্তিও নেই···তাছাড়া ভূত দেখছি···অদ্ভুত সব স্বপ্ন দেখছি···স্বপ্নে ঘণ্টা বাজছে! চুলোয় যাক···চুলোয় যাক···একটা অসুখ করলে আর কি···অসুখেরই পূর্বলক্ষণ এ সব। ওই বেঁটে লোকটাও স্বপ্ন সম্ভবতঃ কাল যা ভাবছিলাম, আমিই তার পিছনে ছুটে বেড়াচ্ছি, সে কিছু করে নি···সবই আমার সৃষ্টি। নিজেই ভূত সৃষ্টি করছি, নিজেই তার ভয়ে টেবিলের তলায় লুকোচ্ছি। আশ্চর্য—তার ওপর রাগই বা হচ্ছে কেন, ছোটলোকই বা বলছি কেন তাকে মিছিমিছি! হয় তো খাঁটি ভদ্রলোক সে আসলে। দেখতে ভাল নয়। বেঁটে—তাতে হয়েছে কি··· পোষাক পরিচ্ছদ ভদ্রলোকের মতই। কিন্তু লোকটার চোখের দৃষ্টিতে কি যেন একটা আছে···ওই, আবার সুরু করেছি। তার কথা বার বার ভাববার

দরকার কি। তার চোখের দৃষ্টিতে কি আছে তা আবিষ্কার ক'রে কি হবে আমার ঘোড়ার ডিম! ও ছাড়া কি আর ভাববার কিছু নেই!…"

হঠাৎ একটা কথা ভেবে মনের ভেতরটা খচ্‌খচ্‌ করতে লাগল। হঠাৎ তাঁর বিশ্বাস হল ওই বেঁটে লোকটা তাঁর পূর্ব্বপরিচিত—শুধু পূর্ব্বপরিচিত নয়, তাঁর জীবনের কোন গোপন কথা জানা আছে ওর, তাই দেখা হলেই চোখে ওই দৃষ্টি ফুটে ওঠে।

জানালাটা ভাল করে' খুলে দেবার জন্যে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। ভাবলেন বাইরের ঠাণ্ডা বাতাস ঘরে ঢুকুক একটু, আর—হঠাৎ আপাদমস্তক শিউরে উঠল তাঁর…মনে হল অসম্ভব একটা ব্যাপার চোখের সামনে ঘটছে যেন।

জানালাটা তখনও ভাল করে' খোলেন নি তিনি। চট্ করে' সরে' এসে জানালার একধারে লুকিয়ে পড়লেন। ঠিক জানালার সামনে ওদিকের শূন্য ফুটপাথে সেই বেঁটে লোকটা দাঁড়িয়ে আছে। তাঁর জানালার দিকে চেয়েই দাঁড়িয়ে আছে, দেখতে পায় নি বোধ হয় তাঁকে, ভুরু কুঁচকে দাঁড়িয়ে আছে, ভাবছে কি যেন…ভাবছে কিন্তু ঠিক করতে পারছে না…হাতটা তুলে কপালে বুলিয়ে নিলে একবার। আর দ্বিধা রইল না…ঘাড় ফিরিয়ে এদিক ওদিক চেয়ে দেখলে একবার, তারপর চোরের মতো পা টিপে টিপে রাস্তাটা পার হতে লাগল। হাঁ, এই বাড়িতেই ঢুকছে। গলিটার দিকে গেল…

"আমার কাছেই আসছে"—চকিতে মনে হল পুরন্দরবাবুর এবং তিনিও পা টিপে টিপে এগিয়ে গেলেন। ভেজান দরজাটার সামনে স্তব্ধ উৎকর্ণ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন…সিঁড়িতে পায়ের শব্দ পাওয়া যাবে এখনই।

বুকের ভিতর এমন কাঁপছিল। লোকটা পা টিপে টিপে যদি আসে কোন শব্দই শুনতে পাবেন না হয়তো। কি যে হচ্ছিল তা যুক্তি দিয়ে বুঝতে পারছিলেন না একটুও, কিন্তু শতগুণ অনুভব করছিলেন সমস্ত সত্তা দিয়েই। স্বপ্ন বাস্তবে রূপান্তরিত হচ্ছে। পুরন্দরবাবু সাহসী লোক। অনেক সময়

অনেক বিপদের সম্মুখীন হয়েছেন তিনি—লোকের কাছে বাহাদুরি পাওয়ার জন্যে নয়—নিজেকে পরীক্ষা করবার জন্যে। কিন্তু এখন যা হ'ল তাতে সাহস ছাড়া আরও কিছু ছিল। যিনি একটু আগে স্নায়বিক দৌর্বল্যে ভুগছিলেন তিনি সহসা সম্পূর্ণরূপে রূপান্তরিত হয়ে গেলেন। অন্য লোক যেন! একটা নীরব অদ্ভুত হাসি ফুটে উঠল তাঁর মুখে। বন্ধ দ্বারের ভিতর দিয়েই তিনি যেন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলেন।

"ওই আসছে, এসে পড়ল, চারিদিকে চেয়ে দেখছে, কান পেতে শুনছে কি যেন দম বন্ধ করে'—উঠছে এইবার···ওই। কপাটের কড়াতে হাত দিয়েছে···"

তিনি যা ভাবছিলেন ঠিক তাই হয়েছিল; দরজার ওপারে সত্যিই একজন দাঁড়িয়েছিল এসে, কড়াতে হাতও দিয়েছিল নিঃশব্দে। পুরন্দরবাবু আর থাকতে পারলেন না, কেমন যেন অদ্ভুত উন্মাদনা একটা পেয়ে বসল তাঁকে। হঠাৎ কপাটটা খুলে ফেললেন। সেই বেঁটে লোকটা দাঁড়িয়েছিল।

নির্ব্বাক নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়েছিল সে। পুরন্দরবাবুর দিকে চেয়ে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রইল আরও খানিকক্ষণ নিস্পন্দভাবে। হঠাৎ পুরন্দরবাবু তাকে চিনতে পারলেন। সে-ও যেন বুঝতে পারলে যে পুরন্দরবাবু তাকে চিনেছেন। তার চোখের দৃষ্টি থেকেই বোঝা গেল তা। হঠাৎ স্নিগ্ধ হাসিতে সমস্ত মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল তার।

"পুরন্দরবাবু আশা করি চিনতে পেরেছেন আমাকে"—গাঢ়কণ্ঠে অত্যন্ত আবেগভরে কথাগুলো বলল সে। কেমন যেন খাপছাড়া শোনাল।

"বুগল পালিত না কি"—

পুরন্দরবাবুও একটু বিব্রত বোধ করতে লাগলেন।

"ন'বছর আগে বর্দ্ধমানে আমাদের পরিচয় হয়েছিল, খুব ঘনিষ্ট পরিচয়ই হয়েছিল, মনে আছে আশা করি আপনার"—

"হ্যাঁ···নিশ্চয়। কিন্তু এখন রাত তিনটে। আপনি আমার বন্ধ দরজার

সামনে দশ মিনিট ধরে' দাঁড়িয়ে আছেন কড়ায় হাত দিয়ে, এর মানেটা বুঝতে পারছি না ঠিক—"

"রাত তিনটে! বলেন কি"—পকেট থেকে ঘড়ি বার করে দেখে যুগল শুধু বিস্মিত নয় একটু আহত হল যেন—"তাই তো, তিনটেই দেখছি। আমায় মাপ করুন পুরন্দরবাবু, সিঁড়িতে ওঠবার আগে ঘড়িটা আমার দেখা উচিত ছিল। বড় লজ্জিত হলাম, আবার একদিন আসব তখন বলব সব, দু' একদিনের মধ্যেই আসব, এখন যাই।"

"সব বলতেই যদি চান এখনই বলুন"—পুরন্দরবাবু তার হাত ধরলেন—"আসুন, ভিতরে আসুন। ভিতরে আসবারই ইচ্ছে ছিল নিশ্চয় আপনার, তা না হলে এত রাত্রে শুধু শুধু এত কষ্ট করে এলেন কেন? কিছু একটা উদ্দেশ্য ছিলই—বলুন কি সেটা—"

তিনি উত্তেজিতও হয়েছিলেন, হতাশও হয়েছিলেন, ব্যাপারটা ঠিক ধরতে পারছিলেন না। একটু লজ্জাও করছিল···রহস্য, বিপদ কিছুই তো নয়। কল্পনায় যেটাকে বিভীষিকাময় করে তুলেছিলেন একটু আগে তা কিছুই নয়—নিরীহ যুগল পালিতে পরিণত হল শেষ পর্যন্ত! কিন্তু না, এত সরল নয় ব্যাপারটা। একটা অস্পষ্ট আশঙ্কার হাত এড়াতে পারছিলেন না তিনি।

যুগল পালিতকে ইজিচেয়ারে বসিয়ে, পাশেই বিছানায় গিয়ে বসলেন তিনি। দুই হাঁটুর উপর হাত রেখে সামনের দিকে একটু ঝুঁকে বসলেন। লোকটা কি বলে শোনাই যাক। আপাদমস্তক ভাল করে' দেখলেন আর একবার। ভাল করে মনে পড়ল সব। যুগল পালিত কিন্তু চুপ করে বসে রইল। একটি কথাও বলে না। আগত সে যে তার অদ্ভুত আচরণের জবাবদিহি করতে বাধ্য একথা যেন তার মাথাতেই আসছে না। বরং সে এমনভাবে পুরন্দরবাবুর দিকে চাইতে লাগল যেন পুরন্দরবাবুই কিছু বলবেন। হয়তো ভয় পেয়েছিল। ফাঁদে পড়লে ইঁদুর যেমন হকচকিয়ে যায় তেমনি হয়েছিল হয়তো। পুরন্দরবাবু কিন্তু রেগে উঠলেন।

"এরকম করার মানেটা কি! আপনি ভূতও নন স্বপ্নও নন নিশ্চয়, মতলবটা কি খুলেই বলুন না…"

যুগল পালিত উশখুশ করতে লাগল। তারপর একটু মুচকি হেসে একটু থেমে থেমে বলল—"আমি যতদূর বুঝতে পারছি তাতে এ সময়ে এবং এ ভাবে আসাটা অদ্ভুতই মনে হচ্ছে আপনার…যদিও অতীতের কথা মনে করলে, কি ভাবে আমাদের ছাড়াছাড়ি হয়েছিল তা ভাবলে …এটা অবশ্য ঠিক এ সময়ে আসব ভাবি নি আমি…পাকেচক্রে হয়ে গেল…"

"পাকেচক্রে মানে! জানালা দিয়ে আমি স্বচক্ষে দেখলাম যে আপনি পা টিপে টিপে আমার ঘরের দিকে চাইতে চাইতে রাস্তাটা পার হলেন।"

"ও, আপনি দেখেছিলেন তাহলে! তাহলে আপনিই তো আমার চেয়ে বেশী জানেন। কিন্তু আপনাকে বিরক্ত করছি বোধ হয়…দেখুন তিন হপ্তা আগে আমি এখানে এসেছি, নিজের একটা কাজে। আমি যুগল পালিত আপনি তো জানেনই, চিনতেই তো পারলেন। আমি এখানে এসেছি চাকরির তদ্বির করতে। বদলি হতে চাই আমি। খুব ভাল পোষ্ট খালি হয়েছে একটা, ঢের বেশী মাইনে…কিন্তু সে চাকরি এখানে নয় যেখানে ছিলাম সেখানেও নয়, যদিও…মোট কথা আসল ব্যাপারটা হচ্ছে—গত তিন সপ্তাহ ধরে' এই কোলকাতা শহরে ঘুরে ঘুরে' বেড়াচ্ছি। কাজটা ওজুহাত মাত্র, ঘুরে বেড়াচ্ছি এইটেই আসল কথা।—চাকরিটা যদি হয়ও খুব যে ধন্য হয়ে যাব তা নয়, তখনও হয়তো এমনি ভাবে ঘুরে বেড়াব রাস্তায় রাস্তায় এখন যেমন ঘুরছি। জীবনের লক্ষ্য হারিয়ে ফেলেছি পুরন্দরবাবু। আর দেখুন হারিয়ে ফেলেছি বলে' খুশীই হয়েছি মনে হচ্ছে—মানে আমার যা মনে হচ্ছে তাই বলছি আপনাকে—এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে হয়তো, মাপ করবেন—"

"কি রকম মনে হচ্ছে?" পুরন্দরবাবু জিজ্ঞাসা করলেন।

যুগল পালিত নির্নিমেষে চেয়ে রইল খানিকক্ষণ তাঁর মুখের দিকে। তারপর গাঢ়স্বরে বলল, "সে আর নেই—"

পুরন্দরবাবু হতভম্ব হয়ে গেলেন কয়েক মুহূর্ত। তারপর হঠাৎ তাঁর কান দুটো গরম হয়ে উঠল, বুকের ভিতরটা মুচড়ে দিলে কে যেন।

"কে! মিসেস পালিত?"

"হ্যাঁ। অপর্ণা গত ফাল্গুন মাসে মারা গেছে…যক্ষ্মা হয়েছিল। দু'তিন মাস ভোগবার পর হঠাৎ বাড়াবাড়ি হল একদিন। আমাকে ফেলে চলে গেল। কি অবস্থায় ফেলে গেছে দেখতেই পাচ্ছেন।"

হতাশা-ব্যঞ্জক ভঙ্গীতে যুগল পালিত নিজের বাহুযুগলকে দুপাশে প্রসারিত করে' মাথাটা নীচু করে রইল। পুরন্দরবাবু দেখলেন টাক পড়েছে লোকটার।

যুগলবাবুর কথা শুনে এবং ভাব-ভঙ্গী দেখে পুরন্দরবাবু যেন চাঙ্গা হলেন খানিকটা। একটা শ্লেষতিক্ত নির্মম হাসির আভাসও যেন খেলে গেল ঠোঁটে…কিন্তু তা ক্ষণকালের জন্য। যে মহিলাটির মৃত্যু সংবাদ এইমাত্র শুনলেন তাকে অনেকদিন আগে তিনি চিনতেন, অনেকদিন আগে ভুলেও ছিলেন। তার মৃত্যু সংবাদে এতটা বিচলিত হয়ে নিজেই আশ্চর্য্য হয়ে গেলেন।

"তাই না কি!…আমাকে এতদিন খবরটা দেন নি কেন? দেওয়া উচিত ছিল। সত্যি বিশ্বাস হচ্ছে না—"

"আপনার সহানুভূতির জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনার সহানুভূতি যে মেকি নয় তাও জানি। যদিও…"

"যদিও?"

"যদিও আপনার সঙ্গে অনেকদিন ছাড়াছাড়ি হয়েছে—কিন্তু আপনি আমার দুঃখে এ রকম বিচলিত হলেন কি করে' যে, বিশ্বাস করুন, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করব ভাষা পাচ্ছি না। অন্য বন্ধুদের সম্বন্ধেও আমার ওই এক কথা—

—ভাষা পাচ্ছি না—এই তো এখানেই পূর্ণ গাঙ্গুলী রয়েছেন—অকৃত্রিম বন্ধু একজন। কিন্তু আপনার সঙ্গে আমাদের পরিচয়—আমি বন্ধুত্বই বলি সেটাকে, আমার স্পর্দ্ধা মাপ করবেন—আপনার সঙ্গে পরিচয় ন'বছর আগে, তারপর যদিও আপনি আর যান নি আমাদের কাছে, চিঠিপত্রও লেখেন নি···"

লোকটা সুর করে গান গাইছে যেন। আর সর্ব্বদা চোখ নীচু করে' মাটির দিকে চেয়ে আছে, কিন্তু দেখে মনে হচ্ছে কিছুই তার দৃষ্টি এড়াচ্ছে না। সব লক্ষ্য করে চলেছে।

পুরন্দরবাবু ইতিমধ্যে একটু প্রকৃতিস্থ হয়েছিলেন। সকৌতুকে এবং সবিস্ময়ে যুগল পালিতকে লক্ষ্য করছিলেন তিনি। তার সব কথা শুনছিলেন। হঠাৎ সে যখন থেমে গেল তখন অসংলগ্ন কয়েকটা কথা তাঁর মনে হল।

"আচ্ছা, এর আগে আপনাকে চিনতে পারি নি কেন বলুন তো!"—হঠাৎ তিনি বলে উঠলেন—রগের শিরাগুলো দপ দপ করে উঠল তাঁর—"অন্তত পাঁচবার রাস্তায় দেখা হয়েছে আপনার সঙ্গে ইতিপূর্ব্বে"—

"হ্যাঁ; আমারও মনে আছে তা। আপনার সঙ্গে কয়েকবারই দেখা হয়েছিল—দু'বার, কিম্বা তিনবার বোধ হয় আপনি এসে পড়েছিলেন আমার সামনে"—

"আপনিই এসে পড়েছিলেন বলুন। আমি একবারও যাই নি ইচ্ছে করে—"

পুরন্দরবাবু হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠলেন এবং অতিশয় অপ্রত্যাশিতভাবে হেসে উঠলেন। যুগল পালিত থেমে গেল, পুরন্দরবাবুর দিকে এক নজর চেয়ে বলল—"আমাকে চিনতে না পারার ঢের কারণ আছে। প্রথমত হয়তো আমাকে ভুলেই গিয়েছিলেন, ভুলে যাওয়া কিছু বিচিত্র নয়—তা ছাড়া আমার বসন্ত হয়েছিল, মুখে দাগ হয়ে গেছে···"

"ও! বসন্ত হয়েছিল না কি! বসন্ত কি করে—"

"বাগালাম? আরও কত কি হতে পারত। কিছু কি বলা যায়, মশাই! অদৃষ্ট মন্দ হলে সবই হতে পারে—'

"তা বটে, তা বটে। বলুন কি বলছিলেন—"

"আমিও অবশ্য আপনাকে দেখেছিলাম রাস্তায়—"

"আচ্ছা—আপনি হঠাৎ 'বাগালাম' বললেন কেন! আমি কথাটা ঠিক ও রকম ভাবে বলতে চাই নি। আচ্ছা থাক ও কথা, যা বলছিলেন বলুন—" তাঁর মনে যেন প্রসন্নতা ফিরে আসছিল। ধাক্কাটা সামলে নিয়েছিলেন। উঠে পায়চারি করতে সুরু করলেন।

"যদিও আমি আপনাকে রাস্তায় দেখেছিলাম, কোলকাতায় আসবার সময়ই যদিও আমি ভেবেছিলাম যে আপনার সঙ্গে দেখা করব—কিন্তু সত্যি কথা বলছি, মনটা এমন ভেঙে গেছে···ফাল্গুন মাস থেকে বুকটা ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে সত্যি বলছি—"

"ও—কি বললেন—চুরমার হয়ে গেছে? আচ্ছা এক মিনিট—সিগারেট খান আপনি কি···"

"আপনি তো জানেন, আগে অপর্ণা যখন বেঁচেছিলেন তখন আমি···"

"হ্যাঁ, আগে তো খেতেন। ফাল্গুনের পর থেকে ছেড়ে দিয়েছেন বুঝি"?

"এক আধটা খাই কখনও কখনও।"

"নিন তাহলে একটা। এই যে দেশলাই—ধরিয়ে নিন। তার পর বলুন—বলে যান—এ যে অত্যন্ত, মানে—"

পুরন্দরবাবু নিজেও একটা সিগারেট ধরালেন এবং বিছানার উপর বসলেন।

যুগল পালিত চুপ করে' রইল খানিকক্ষণ।

"আপনি বড় বিচলিত হয়েছেন মনে হচ্ছে। আপনার শরীর ভাল আছে তো?"

"চুলোয় যাক আমার শরীর"—হঠাৎ উত্তেজিত কণ্ঠে বলে উঠলেন পুরন্দরবাবু—"আপনি বলে যান—"

যুগল পালিত পুরন্দরবাবুকে বিচলিত হতে দেখে একটু যেন খুশী হল। আত্মপ্রত্যয় যেন বেড়ে গেল তার।

"কিন্তু বলবার আর কি আছে? ভেবে দেখুন, আমার সমস্ত জীবনই নষ্ট হয়ে গেল—মানে সমূলে নষ্ট হয়ে গেল। কবিত্ব নয়, ভেবে দেখুন, কুড়ি বছর বিবাহিত জীবন যাপন করবার পর উদ্দেশ্যহীন হয়ে এ ভাবে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ানো—কোলকাতা শহর নয়—মনে হচ্ছে যেন একটা অরণ্য। সব যেন গুলিয়ে গেল, হারিয়ে গেল, মিলিয়ে গেল—সব শূন্য। শূন্যতাটাই পেয়ে বসেছে যেন আমাকে। এ অবস্থায় কোন চেনাশোনা লোকের সঙ্গে, এমন কি ঘনিষ্ঠ বন্ধুর সঙ্গে দেখা হলে পাশ কাটিয়ে সরে পড়াটাই স্বাভাবিক। অন্য সময় আবার অন্য রকম হয়—সব মনে পড়ে যায়, সকলের সঙ্গ পেতে ইচ্ছে করে, বিশেষ করে' যে সময় চিরকালের জন্যে চলে' গেছে সেই সময় যারা ছিল তাদের সঙ্গ।…মাঝে মাঝে এত ইচ্ছে করে সেই অতীতকে ফিরে পেতে, সেই অতীতের যারা সাক্ষী ছিল তাদের কাছে যেতে…বুকের ভেতরটা এমন করতে থাকে যে তখন হিতাহিত জ্ঞান লোপ পায়। রাত দুপুরেও—হ্যাঁ, অন্যায় জেনেও—রাত দুপুরেও বন্ধুর কাছে যেতে তখন বাধে না…রাত তিনটের সময় তার ঘুম ভাঙিয়েও তার সঙ্গে দুটো কথা বলতে ইচ্ছে করে…সময়টা অবশ্য ঠিক করতে পারি নি…সে বিষয়ে ভুল হয়েছে আমার…কিন্তু আমাদের বন্ধুত্ব বিষয়ে ভুল করি নি আমি। এই যে আপনার সঙ্গে কথা কইছি এইতো যথেষ্ট, এইতেই সমস্ত ক্ষতিপূরণ হয়েছে বলে মনে করি। সত্যি আমি ভেবেছিলাম বড় জোর বারোটা বেজেছে…এখনও আমার বারোটার বেশী মনে হচ্ছে না। দুঃখের নেশায় বুঁদ হয়ে গেছি, বুঝলেন—দিগ্বিদিক জ্ঞান আর নেই। ঠিক দুঃখও নয়, বুঝলেন…জিনিসটার অভিনবত্ব বিহ্বল করে তুলেছে আমাকে—"

পুরন্দরবাবু অত্যন্ত গম্ভীর হ'য়ে পড়েছিলেন, কেমন যেন বিষণ্ণ দেখাচ্ছিল তাঁকে। বিষণ্ণ কণ্ঠেই তিনি বললেন—"ভারী অদ্ভুত তো—"

"সত্যিই অদ্ভুত হয়ে গেছি আমি যে—"

"ঠাট্টা করছেন না আশা করি—"

"ঠাট্টা!" শুধু বিস্ময় নয়, যুগল পালিতের চোখের দৃষ্টিতে বেদনাও ঘনিয়ে এল—"এ কি ঠাট্টা করবার বিষয়! যার মৃত্যুর কথা বলছি—"

"থাক—ও কথা আর বলবেন না—"

পুরন্দরবাবু উঠে পড়লেন এবং আবার পায়চারি সুরু করলেন।

পাঁচ মিনিট কেটে গেল। যুগল পালিত যাবার জন্যে উঠে দাঁড়াতেই পুরন্দরবাবু প্রায় চীৎকার করে উঠলেন—"যাবেন না, বসুন, বসুন, বসুন—"

বাধ্য বালকের মতো যুগল বসে পড়ল সঙ্গে সঙ্গে। পুরন্দরবাবু হঠাৎ তার সামনে থেমে বললেন···"সত্যি, আপনার কি ভীষণ পরিবর্ত্তন হয়েছে—"

যেন পরিবর্ত্তনটা হঠাৎ এখনই চোখে পড়ল তাঁর।

"ভয়ানক পরিবর্ত্তন হয়েছে। অসাধারণ। অন্য লোক হয়ে গেছেন একেবারে—"

"তা আর বিচিত্র কি। ন' বছরে—"

"না কাঞ্চন থেকে?"

"ছি ছি"—হাসি চেপে যুগল পালিত বললে—"না, তা নয়। আচ্ছা, জিগ্যেস করতে পারি কি—ঠিক কি পরিবর্ত্তনটা দেখছেন আমার—"

"একথা জিগ্যেস করছেন আপনি! যে যুগল পালিতকে আমি জানতাম তিনি বেশ শক্ত সমর্থ সৌখীন লোক ছিলেন, বেশ বুদ্ধিমান···এখন যাঁকে দেখছি তাঁকে তো মনে হচ্ছে একটা ভাঁড় মাত্র।"

পুরন্দরবাবু বিরক্তির সেই সীমায় উপনীত হয়েছিলেন যে সীমায় গম্ভীর লোকেরও রসনার রাশ টেনে রাখা শক্ত হয়।

"ভাঁড় ? তাই আপনার মনে হচ্ছে ? এখন আর বুদ্ধিমান মনে হচ্ছে না আমাকে ? সত্যি ?"

যুগল পালিতের মুখে ব্যঙ্গ-দীপ্ত হাসি ফুটে উঠল একটা। মনে হল কি একটা যেন মনে মনে উপভোগ করছেন তিনি।

"বুদ্ধিমান ? না,—তবে চতুর মনে হচ্ছে বটে—মানে অতি-চতুর—" বলেই পুরন্দরবাবু ভাবলেন মনে মনে, "অশিষ্টতা হচ্ছে···কিন্তু এ লোকটাও কম অশিষ্ট নয় কি···রাতদুপুরে এমন—তা ছাড়া এর উদ্দেশ্যই বা কি···"

"ছি ছি কি বলছেন পুরন্দরবাবু, আপনি হলেন পুরানো বন্ধু একজন"—যুগল পালিতের চোখে মুখে নিখুঁত আন্তরিকতা ফুটে উঠল যেন—চেয়ারে ঘুরে বসল সে।

"কি নিয়ে আলোচনা হচ্ছে বলুন তো ! আমরা কি এখন পৃথিবীতে আছি ? সামাজিক গণ্ডী কি এখন বেঁধে রেখেছে আমাদের ? আমরা দুজন বন্ধু, অনেক-দিনের পুরোনো বন্ধু, বহুকাল পরে একসঙ্গে মিলেছি, মন খুলে কথা বলছি, আমাদের অমূল্য বন্ধুত্বের যে প্রাণ-স্বরূপ ছিল তার কথাই স্মরণ করছি···"

কথা বলতে বলতে অভিভূত হয়ে পড়ল সে। মাথা নীচু করে' দু'হাতে মুখ ঢেকে চুপ করে' বসে রইল খানিকক্ষণ। পুরন্দরবাবু চেয়ে রইলেন তার দিকে। তাঁর সমস্ত চিত্ত ঘৃণায় বিতৃষ্ণায় ভরে' উঠল। কেমন যেন একটা অস্বস্তিও ভোগ করতে লাগলেন তিনি।

"হয়ত ভাঁড় ছাড়া আর কিছু নয়"—আবার মনে হল তাঁর—"কিন্তু না। মদ খায় নি তো ? না—তাও নয়। কিছু বিচিত্র নয় অবশ্য। মুখটা লাল হয়ে আছে বেশ। মদও যদি খেয়ে থাকে—ব্যাপার একই দাঁড়াচ্ছে। ওর উদ্দেশ্যটা কি ? কি চায় ও ?"

"মনে আছে আপনার, মনে আছে"—হঠাৎ মুখ থেকে হাত সরিয়ে যুগল পালিত আবার সুরু করলে···"সেই যে আমরা একবার বেড়াতে গিয়েছিলাম মহিম মল্লিকদের জমিদারিতে—সেই বাচ খেলা, হৈ হৈ করা, গান হল্লোড়—

সন্ধ্যের সময় সেই যে আপনি রবি ঠাকুরের কবিতা পড়ে শোনাতেন—নিরুদ্দেশ যাত্রা—'আর কত দূরে নিয়ে যাবে মোরে হে সুন্দরি'—মনে আছে সে সব? আপনার সঙ্গে প্রথম দিনের আলাপের কথাটা মনে আছে? আপনি কি একটা বৈষয়িক দরকারে এসেছিলেন আমার কাছে···বসবার ঘরে আপনার সঙ্গে আলাপ করছিলাম আমি—অপর্ণা এসে ঢুকল—ব্যস্—ঠিক তার দশ মিনিটের মধ্যেই আপনি আমাদের অন্তরঙ্গ হয়ে পড়লেন। সমস্ত পরিবারের বন্ধু হয়ে গেলেন, আর সত্যিকারের বন্ধু। ঠিক এক বৎসর অন্তরঙ্গতাটা বজায় ছিল—ঠিক এক বছর—রবি ঠাকুরের চিত্রাঙ্গদার অর্জ্জুনের মতো—"

পুরন্দরবাবু মাটির দিকে চেয়ে পদচারণ করছিলেন ধীরে ধীরে। অধীর চিত্তে শুনছিলেন—সমস্ত মন ঘৃণায় ভরে উঠছিল—তবু শুনছিলেন—হ্যাঁ, বেশ মন দিয়েই শুনছিলেন।

"অর্জ্জুন চিত্রাঙ্গদার কথা আমার কখনও মনে হয় না তো" অপ্রতিভভাবে হঠাৎ বলে উঠলেন তিনি, "তাছাড়া আপনি অমন চীৎকার করে' কথা বলছেন কেন, আগে তো আপনি অত চেঁচাতেন না···এমন অস্বাভাবিক ভাষাও ব্যবহার করতেন না। এমন করবার মানেটা কি—"

"হ্যাঁ, আগে আমি কথা কম কইতাম, মানে গম্ভীর ছিলাম"—যুগল পালিত বলে' উঠল সঙ্গে সঙ্গে—"আগে আমি কথা শুনতেই ভালবাসতাম। সে বলত আমি শুনতাম। আপনার মনে আছে বোধ হয় কি সুন্দর কথা বলত সে—কি চমৎকার রস দিয়ে দিয়ে। আর চিত্রাঙ্গদার কথা আপনি যা বলছেন তা ঠিক—আপনার মনে থাকবার কথা নয়—আমাদেরই মনে হয়েছিল, তা নিয়ে আলোচনাও করেছিলাম, কিন্তু আপনি চলে আসবার পর। অর্জ্জুন যেমন হঠাৎ এল হঠাৎ চলে গেল···"

"কি অর্জ্জুন অর্জ্জুন করছেন" পুরন্দরবাবু মাটিতে পা ঠুকে থমকে উঠলেন। তাঁর মনে এমন একটা বিশ্রী স্মৃতি জাগছিল!

"আমাদের কিন্তু মনে হয়েছিল অর্জ্জুনের কথা" অতিশয় মধুমাখা কণ্ঠে যুগল পালিত আবার বললে, "বিশেষ করে' পূর্ণবাবু যখন এলেন—আপনি যেভাবে এসেছিলেন ঠিক তেমনি ভাবেই এলেন। তিনি পাঁচ বচ্ছর ছিলেন।"

"পূর্ণবাবু? মানে? পূর্ণবাবু কে?

পুরন্দরবাবু থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। সমস্ত শরীরটা জমে' গেল যেন।

"পূর্ণচন্দ্র গাঙ্গুলী। আপনি চলে আসবার এক বছর পরে তিনিও কৃপা করে আমাদের সাহচর্য্য দান করেছিলেন ঠিক আপনারই মতো"—

"ও হ্যাঁ—ঠিক তো—মনে পড়ছে"—পুরন্দরবাবু আত্মসম্বরণ করে' বললেন, "পূর্ণবাবু! ঠিক—তিনি তো বদলি হয়ে গিয়েছিলেন ওখানে"—

"হ্যাঁ, বদলি হয়ে গিয়েছিলেন। কমিশনার সাহেবের অফিসে। এখান থেকেই গিয়েছিলেন। চমৎকার লোক, ভাল বংশের ছেলে—"

যুগল পালিত যেন গদগদ হয়ে পড়ল একেবারে।

"হ্যাঁ হ্যাঁ। কিন্তু কি ভাবছিলাম—ও—হ্যাঁ তিনিও তো···"

"হ্যাঁ তিনিও, তিনিও—" পুরন্দরবাবু অসতর্ক মুহূর্তে যে কথাটা বলে ফেলেছিলেন যুগল পালিত সোল্লাসে তাই পুনরাবৃত্তি করল···"হ্যাঁ তিনিও। তিনি থাকতে আমরা চিত্রাঙ্গদাটা অভিনয়ও করেছিলাম একবার। আমাকে কিন্তু অর্জ্জুনের ভূমিকায় নামতে দেয় নি—অপর্ণাই দেয় নি—"

"কি মুশকিল! আপনার অর্জ্জুন হবার যোগ্যতা কোথায়—আপনি হলেন নিখাদ যুগল পালিত"—বিরক্তিভরে রূঢ়কণ্ঠে বলে উঠলেন পুরন্দরবাবু—রাগে বিরক্তিতে কাঁপছিলেন তিনি—"ক্ষমা করবেন···ও পূর্ণবাবু—পূর্ণবাবু তো এখানেই আছেন—তাঁর সঙ্গে দেখাও হয়েছিল আমার। আপনি তাঁর সঙ্গে দেখা করুন না। যান নি সেখানে?"

"গেছি বই কি। গত পনর দিন থেকে প্রত্যহ যাচ্ছি। কিন্তু দেখা হচ্ছে না। আমাকে ঢুকতেই দিচ্ছে না কেউ। তাঁর অসুখ, শোনা কথা

নয়, নিজে গিয়ে খোঁজ করে জেনেছি তাঁর অসুখ। শক্ত অসুখ। ছ' বছরের বন্ধু। উঃ—সত্যি বলছি পুরন্দরবাবু, মাঝে মাঝে বলতে ইচ্ছে করে ভগবতী বসুন্ধরে দ্বিধা হও—সত্যি বলছি। আবার মাঝে মাঝে অতীতটাকে আঁকড়ে ধরতেও ইচ্ছে করে—অতীতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যারা ছিল সবাইকে—আবার কখনও কাঁদতে ইচ্ছে হয়, অন্য কোন কারণে নয়, কেবল খানিকটা হালকা হবার জন্যে…"

"আচ্ছা, আজ তাহলে আসুন। আজকের মতো অন্তত যথেষ্ট হয়েছে—কি বলেন"

পুরন্দরবাবু হঠাৎ বলে বসলেন।

"যথেষ্ট, যথেষ্ট"—যুগল পালিত উঠে দাঁড়াল—"চারটে বাজে, স্বার্থপরের মতো আপনাকে এভাবে…ছি ছি…"

"শুনুন, আমি গিয়ে দেখা করব আপনার সঙ্গে এর পরে। তারপর আশা করি—আচ্ছা, একটা কথা বলুন তো, সত্যি করে' বলুন, আপনি কি মদ খেয়েছেন ?"

"মদ ? মোটেই না"—

"এখানে আসবার ঠিক আগে, কিম্বা তারও আগে মদ খান নি আপনি ?"

"আপনাকে বড্ড অসুস্থ দেখাচ্ছে পুরন্দরবাবু। আপনার জ্বর হয় নি তো—"

"না কিছু হয় নি। কাল দেখা করব আপনার সঙ্গে একটা নাগাদ"—

"এসে পর্যন্ত আমি লক্ষ্য করছি আপনি কেমন যেন প্রকৃতিস্থ নন"—উপভোগ করতে করতে কথাগুলো বললে যুগল পালিত—"সত্যি বড় খারাপ লাগছে আমার, বিবেক দংশন করছে। এরকম সময়ে এসে আপনাকে… আমি যাচ্ছি…শুয়ে পড়ুন আপনি, ঘুমুন একটু—"

"শুনুন, আপনার ঠিকানাটা কি"

"৭২, বহুবাজার স্ট্রীট—

"ও আচ্ছা। যাব আমি—"

"নিশ্চয়। কৃতার্থ হব তাহলে—"

যুগল পাণ্ডিত সিঁড়ি দিয়ে নামছিল।

"শুনুন"—পুরন্দরবাবু ডাকলেন আবার—"ঠিকানা বদলে ফেলবেন না তো…"

"ঠিকানা বদলে ফেলব মানে? কি যে বলেন!"

বিস্ময় বিস্ফারিত চক্ষে পুরন্দরবাবুর দিকে চেয়েই ঘাড় ফিরিয়ে হাসি গোপন করলে যুগল পাণ্ডিত।

কোন উত্তর না দিয়ে দড়াম করে' কপাটটা বন্ধ করে' দিলেন পুরন্দরবাবু। খিল দিলেন। তালা লাগালেন। জানালার কাছে গিয়ে থু থু করে' অনেকবার থুতু ফেললেন. মুখের ভিতর কেমন অশুচিতা অনুভব করছিলেন যেন একটা। নিস্পন্দ হয়ে ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে রইলেন মিনিট পাঁচেক। তারপর হঠাৎ গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লেন এবং মিনিট খানেকের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়লেন আবার

৪

প্রগাঢ় নিদ্রার পর বেলা সাড়ে ন'টার সময় উঠলেন তিনি। মুহূর্তেই সব মনে পড়ে গেল। বিছানায় উঠে বসলেন। অপর্ণার মৃত্যুর কথাই মনে হতে লাগল। কাল রাত্রে আকস্মিক মৃত্যুসংবাদটা সমস্ত ওলটপালট করে দিয়েছে, অতিশয় বেদনাময় অনুভূতি রেখে গেছে একটা সারা বুক জুড়ে। যুগল পালিত যতক্ষণ ছিল বেদনাটা ঢাকা ছিল। এখন স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠছে। শুধু তাই নয়, ন'বছর আগে যা যা ঘটেছিল মানস-পটে পরিস্ফুট হয়ে উঠছে সব।

এই মহিলাটিকে, যুগল পালিতের স্ত্রী এই অপর্ণা পালিতকে, তিনি একদিন ভালবেসেছিলেন। যতদিন বর্দ্ধমানে ছিলেন ততদিন তার প্রণয়ী ছিলেন তিনি। বর্দ্ধমানে তিনি গিয়েছিলেন নিজের কাজে—সে-ও এক মকোদ্দমার ব্যাপার। কিন্তু শেষজন্য পুরো এক বছর বাড়ি ভাড়া করে' সেখানে না থাকলেও চলত। প্রণয়-ব্যাপারের জন্যেই অতদিন থেকে গিয়েছিলেন। সত্যিই বড্ড জড়িয়ে পড়েছিলেন। অপর্ণা তাঁকে যেন যাদু করেছিল। যেন ভর করেছিল তাঁর উপর। এই মেয়েটার সামান্য খেয়াল মেটাবার জন্যে না করতে পারতেন হেন কাজ ছিল না।

বস্তুত তার পূর্ব্বে এ রকম অভিজ্ঞতা কখনও হয় নি তাঁর। তীব্র উন্মাদনার আস্বাদ সেই তাঁর জীবনে প্রথম। এক বৎসর পরে বিচ্ছেদ যখন আসন্ন হয়ে এল, (যদিও সে বিচ্ছেদ দীর্ঘ হবে না এই আশা তিনি তখন করেছিলেন)—সত্যিই যাবার সময় ঘনিয়ে এল যখন, তখন এমন অধীর হয়ে পড়েছিলেন যে অপর্ণাকে হরণ করবার কথাও মনে হয়েছিল তাঁর। তাকে সে কথা বলেও

ছিলেন—স্বামীকে ছেড়ে, ঘর সংসার ছেড়ে, সমাজকে তুচ্ছ করে' তাঁর সঙ্গে পালিয়ে যাবার কথাও পেড়েছিলেন—হ্যাঁ, সনির্বন্ধ অনুরোধই করেছিলেন—বেশ মনে পড়ছে। যদিও অপর্ণা প্রস্তাবটা নিমরাজি হয়েছিল (হয় তো সংসারের একঘেয়েমি থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্যে, হয় তো অভিনবত্বের আশায়) কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত সে বেঁকে দাঁড়াল। সে আপত্তি করল বলেই পুরন্দরবাবুকে একা বর্দ্ধমান ত্যাগ করতে হল। তা না হলে পুরন্দরবাবু তাকে নিয়েই আসতেন। কেউ তাঁর গতিরোধ করতে পারত না। অপর্ণাই তাঁকে বুঝিয়ে নিবৃত্ত করেছিল।

কোলকাতায় ফিরেই কিন্তু দু'মাস যেতে না যেতেই তাঁর মনে হত, বারবার মনে হত—সত্যিই কি অপর্ণাকে ভালবেসেছিলেন তিনি? এ প্রশ্নের কিন্তু কোন সদুত্তর মিলত না। ভালবাসা? না, মোহ? ঠিক করতে পারেন নি কিছু। আজও পারেন নি। কোলকাতায় ফিরে নূতন কোন প্রেমের প্রভাবে পড়ে' যে একথা মনে হত তা নয়। যদিও ফিরে এসেই তিনি দলে মিশে রমণাগমে লোনাখাছি চষে বেড়িয়েছিলেন রীতিমত—কিন্তু সেই প্রথম দু'মাস তাঁর সমস্ত মন কেমন যেন আচ্ছন্ন হয়েছিল। কোন মেয়েমানুষই চোখে লাগে নি, কেউ মনে দাগ কাটতে পারে নি। অপর্ণার প্রতি তাঁর মনোভাব ভালবাসা না মোহ, এ প্রশ্ন মনে বারবার জাগলেও এটা তিনি ঠিক জানতেন যে, আবার কোনক্রমে যদি বর্দ্ধমানে গিয়ে পড়েন তাহলে অপর্ণারই মায়াপাশে আবার গিয়ে ধরা দেবেন অসঙ্কোচে, কিছুমাত্র দ্বিধা করবেন না। পাঁচ বৎসর পরেও তাঁর এ বিশ্বাস বদলায় নি পাঁচ বৎসর পরে একথা স্বীকার করতে কিন্তু লজ্জা হত তাঁর—সমস্ত অন্তর আত্ম-ধিক্কারে ভরে উঠত, অপর্ণার উপরও ঘৃণা হত, সত্যটা কিন্তু উড়িয়ে দিতে পারতেন না। বর্দ্ধমানের ব্যাপারটা ভেবে মাঝে মাঝে আশ্চর্য্যও লাগত খুব। তিনি—পুরন্দর রায়চৌধুরী—কি করে' এমন একটা ব্যাপারে পড়লেন! প্রেম? অসম্ভব। লজ্জায় দুঃখে আত্মগ্লানিতে চোখে জলও

এসে পড়েছে। হ্যাঁ জল! আরও কিছুদিন পরে অনেকটা শান্ত হয়েছিলেন অবশ্য। প্রাণপণে ভুলতে চেষ্টা করেছিলেন, মন থেকে নিশ্চিহ্ন করে' মুছে ফেলতে চেয়েছিলেন ব্যাপারটাকে—সফলকামও যে হন নি, তা নয়। কিন্তু আজ হঠাৎ ন'বছর পরে অপর্ণার মৃত্যুসংবাদ শুনে সমস্ত মনে পড়ে যাচ্ছে আবার। সমস্ত।

একটা বিষয়ে বিস্ময় লাগছে কিন্তু। এখন, বিছানায় বসে বসে' নানাবিধ এলোমেলো চিন্তার মধ্যে একটা কথা স্পষ্ট অনুভব করছেন তিনি—যদিও সংবাদটা পেয়ে চমকে উঠেছিলেন প্রথমটা, কিন্তু অপর্ণার মৃত্যু সত্যি তাঁর হৃদয় স্পর্শ করে নি। সত্যি কোন দুঃখ হচ্ছে না। সত্যিই এতটা হৃদয়হীন আমি নাকি?—নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করলেন। এখন অবশ্য আর ঘৃণা করেন না তাকে, পক্ষপাতশূন্য হয়ে তার প্রতি সুবিচার করবার ক্ষমতা হয়েছে এখন। ন'বছরের এই দীর্ঘ বিচ্ছেদের মধ্যে অপর্ণার একটা স্বরূপ খাড়া করে-ছিলেন তিনি মনে মনে। মফঃস্বলের শহরে হাবভাবময়ী কলাকুশলা একধরণের ভদ্রমহিলা দেখা যায়—যারা সকলের সঙ্গে হেসে আলাপ করে, পার্টিতে যায়, সব কথায় বুকনি দেয়, অপর্ণাও সেই জাতের মেয়ে—তার বেশী কিছু নয়—তিনি হয় তো তাকে স্বপ্নলোকে দেবী বানিয়েছিলেন। হয় তো! এটাও মনে হত হয় তো তাঁর বিচার নির্ভুল নয়। বিশেষ করে' এই কথাটাই মনে হচ্ছে এখন। হয় তো···কিন্তু না—বিরুদ্ধ সাক্ষী অনেক বর্তমান। এই পূর্ণ গাঙ্গুলী লোকটা পাঁচ বছর সংশ্লিষ্ট ছিল এই পরিবারের সঙ্গে এবং তাঁর মতো সে-ও হয়তো ফেঁসে ছিল। পূর্ণ গাঙ্গুলী কোলকাতার অভিজাত সম্প্রদায়ের ছেলে, কোলকাতায় থাকলে তার কিলে হ'ত কিছু একটা, কারণ তার ব্যক্তিত্বে বা চরিত্রে এমন কিছুই ছিল না (পুরন্দরবাবুর তাই ধারণা অন্তত) যার জোরে চেনা-শোনা সমাজের বাইরে গিয়ে সে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। কিন্তু কোলকাতা ত্যাগ করে' অর্থাৎ তার ভবিষ্যৎকে বিসর্জন দিয়ে সে বর্দ্ধমানে গিয়ে আড্ডা গাড়লে—কেবল ওই অপর্ণার জন্যে। শেষ

পর্য্যন্ত কোলকাতায় এল—অপর্ণা: তাকে ছেঁড়া জুতোর মতো পরিত্যাগ করেছিল বলে' সম্ভবত। ওই মেয়েটার সত্যিই আকর্ষণ করবার, বশ করবার, শাসন করবার অদ্ভুত কুহকিনী শক্তি ছিল একটা।

কিন্তু যে সব গুণের জোরে মেয়েরা পুরুষদের সাধারণত আকর্ষণ করে, বশ করে, অপর্ণার সে সব গুণ ছিল না। সুন্দরী ছিল না মোটেই। অত্যন্ত সাদামাটা চেহারা। পুরন্দরবাবুর সঙ্গে যখন দেখা হয় তখন তার বয়সও আটাশ বছর—অর্থাৎ যৌবনও উত্তীর্ণ প্রায়। সুন্দরী না হলেও তার সারা মুখে অপূর্ব্ব কমনীয়তা ছিল একটা, চোখ খুব বড় ছিল না, কিন্তু চোখের দৃষ্টিতে ছিল অদ্ভুত শক্তির ব্যঞ্জনা। রোগা ছিল খুব। খুব বেশী লেখাপড়া শেখে নি, কিন্তু তার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি অস্বীকার করবার উপায় ছিল না। কেমন যেন জেদি গোছের ছিল। নিজের মতকেই চূড়ান্ত বলে জানত। মতান্তর শোনবার ধৈর্য্য ছিল না। কখনও কোন ব্যাপারে আপোষ করে নি। চালচলনে শহুরে ভাব খুব বেশী না থাকলেও বেশ একটা বৈশিষ্ট্য ছিল। নিপুণ বৈশিষ্ট্য। মার্জ্জিত রুচিও ছিল, যদিও তার পরিচয় প্রধানত পাওয়া যেত প্রসাধনে আর সাজসজ্জায়। চরিত্রে ছিল সে সম্রাজ্ঞী—আধিপত্য করবার লোভ এবং শক্তি দুইই ছিল তার। যাকে ভালবাসত তাকে পদানত করে' রাখত একেবারে। আসন্ন বিপদে দিশাহারা হয়ে পড়ত না কখনও। বিপদের সময় তার মনের জোর দেখে অবাক লাগত সত্যি। অদ্ভুত চরিত্র। উদারতা এবং নীচতার এমন সমন্বয় কদাচিৎ চোখে পড়ে। তার সঙ্গে তর্ক করা অসম্ভব ব্যাপার ছিল একরকম। যুক্তির ধার ধারত না, প্রয়োজন হলে 'দু' দুগুণে চার' এ সত্যকেও ফুৎকারে উড়িয়ে দিতে বাধত না তার। নিজের দোষ বা নিজের ভুল দেখতেই পেত না কখনও। স্বামীকে আজীবন বঞ্চনা করে এসেছে, অসংখ্য চাতুরী খেলেছে তার সঙ্গে—কিন্তু সে জন্য কখনও দুঃখিত বা অনুতপ্ত হয় নি। তাকে দেখে পুরন্দরবাবুর মনে পড়ত উর্ব্বশী কবিতার প্রথম লাইনটা—নহ মাতা, নহ কন্যা, নহ বধূ

সুন্দরী রূপসী। ও যেন সকলের। চিরন্তনী কামিনী! নিজেও বোধ হয় সে তাই অকপটে বিশ্বাস করত। পুরুষের মনোহরণ করাই তো তার কাজ। তাতে আর পাপ পুণ্য কি! যাকে যতক্ষণ ভালবাসত ততক্ষণ তার সঙ্গে প্রতারণা করত না। কিন্তু ভালবাসা নিঃশেষ হয়ে যেই সুরু হত অভ্যাসের দাসত্ব, অমনি শিকল কাটার সুযোগ খুঁজে বেড়াত সে। প্রণয়ীকে পীড়নও যেমন করত, সোহাগও করত তেমনি। উদগ্র কামনার নিষ্ঠুর প্রতিমূর্ত্তি ছিল যেন। অথচ নীতি নিয়ে লম্বা বক্তৃতা—হ্যাঁ, বক্তৃতাই দিত—ভ্রষ্ট চরিত্র লোককে নিদারুণ ভাষায় গালাগালি দিতে শতমুখ হ'য়ে উঠত, অথচ নিজে ছিল ভ্রষ্টা! কিন্তু সে যে ভ্রষ্টা তা কিছুতেই, হাজার প্রমাণ প্রয়োগ করেও, বোঝান যেত না তাকে। প্রণয়ী পুরন্দরবাবু মাঝে মাঝে ভাবতেন—"ভণ্ডামি নয়, সত্যিই হয়তো ও ওইরকম। হয়তো ভ্রষ্টা হয়েই জন্মেছে—ওই ওর প্রকৃতি। এ জাতীয় মেয়েরা কখনও বুড়ো হয় না, কখনও কারও গৃহিণী হয় না, জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত একটার পর আর একটাকে বরণ করে যায় কেবল। ওই ওদের ধর্ম্ম। বিবাহিত স্বামীই বোধহয় ওদের প্রথম প্রণয়ী। কিন্তু সে প্রণয়টা আরম্ভ হয় বিবাহের পরে। এরা খুব সহজে স্বামী পাকড়াতেও পারে। যখন দ্বিতীয় প্রণয়ী বরণ করে তখন স্বামীকেই দোষ দেয়, যেন স্বামীর কাছে সুখের আস্বাদ না পেয়ে বাধ্য হয়ে পর-পুরুষের বাহুপাশে ধরা দিয়েছে। পর-পুরুষের বাহুপাশে যখন ধরা দেয় তখন প্রাণ ঢেলেই দেয়, তাতে কোন ভণ্ডামি থাকে না। শেষ পর্য্যন্ত ওরা মনে করে—যা করছি ঠিকই করছি, দোষের কিছু নেই এতে…। আমরা সতীই—"

এ ধরণের মেয়ে থাকা সম্ভব পুরন্দরবাবুর এ বিশ্বাস সত্যিই হয়েছিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ বিশ্বাসও তাঁর হয়েছিল যে, এই মেয়েদের অনুরূপ এক জাতীয় স্বামীও আছেন যাঁরা ঠিক এদের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে পারেন। অর্থাৎ যাঁরা চিরকাল স্বামীর ভূমিকায় অভিনয় করে যান্ আর কিছু করেন

না, আর কিছু করবার ক্ষমতাই নেই। এঁরা কেবল বিয়ে করবার জন্যই জন্মান যেন। নিজেদের চরিত্রের নানাবিধ বৈশিষ্ট্য সত্বেও এঁরা বিয়ের পর অবিলম্বে স্ত্রীর পরিপূরক হয়ে পড়েন ঠিক। এঁদের কতকগুলো চারিত্রিক লক্ষণও থাকে। কেমন যেন মেয়েলি ভাবাপন্ন হন এঁরা। এঁদের চলন বলন হাবভাব সব কিছুই পেলব পেলব। দেখলেই চিনতে পারা যায়। পুরন্দরবাবুর দৃঢ়বিশ্বাস ছিল যুগল পালিত এই জাতীয় লোক। কিন্তু গতরাত্রে যে যুগল পালিতকে দেখা গেল সে তো একেবারে অন্য লোক, বর্দ্ধমানে যার সঙ্গে আলাপ ছিল এ তো সে নয়। অবিশ্বাস্য রকম বদলে গেল লোকটা। বদলাবারে কথাও—পুরন্দরবাবুর মনে হল—এ অবস্থায় বদলে যাওয়াটাই স্বাভাবিক। স্ত্রীর জীবিতকালে সে স্ত্রীর পরিপূরক ছিল, স্ত্রীর মৃত্যুর পর সে আর তা থাকবে কি করে'—সে তো এখন একটা ভগ্নাংশ মাত্র···দু'জনে মিলে সমগ্র ছিল। সমগ্র জীবনের একটা অংশ হঠাৎ কেটে বেরিয়ে এসেছে যেন···বিস্ময়কর এবং অদ্ভুত।

অতীতের যুগল পালিত সম্বন্ধে পুরন্দরবাবুর মনে নানা কথা জাগছিল। অনেক ঘটনা, অনেক স্মৃতি···

"বর্দ্ধমানে লোকটা স্বামী ছাড়া আর কিছু ছিল না। চাকরি করত, একজন গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারীই ছিল, কিন্তু তাও যেন স্ত্রীর জন্যই! স্ত্রীর গয়না কাপড় কেনবার জন্য, তার সামাজিক সম্ভ্রম বাড়াবার জন্য দশটা পাঁচটা আপিস করে মরত লোকটা। আর খুব নিষ্ঠাভরেই করত। একটু ফাঁকি দিত না কাজে। অথচ আপিসে খুব যে একটা সুনাম ছিল তাও নয়। দুর্নামও ছিল না। বাপের বিষয় আশয় ছিল কিছু। ভালভাবেই চলে যেত। দামী সোফা সেটি, কার্পেট, দামী দামী বাসন সেয়ারা বয়।—চতুর্দ্দিক ঝকঝকে, তকতকে টিপটপ রাখতেই হত। কারণ ভয়ানক বড়লোক ঘেঁসা ছিল। বড় বড় অফিসার তো বটেই, নামজাদা যে কোন লোকের সঙ্গেই আলাপ করতে পেলে বর্ত্তে যেত যেন

লোকটা। বাড়িতে সবাইকে নিমন্ত্রণ করত, স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিত। বহু বড়লোকের সঙ্গে বেশ দহরম মহরম ছিল। অপর্ণারও বেশ খাতির ছিল বড়লোক মহলে। অপর্ণা অনন্ত খাতির পেয়ে গলে' পড়ত না কখনও। নিজের ন্যায্য প্রাপ্য হিসেবেই নিত সে এসব। কিন্তু নিজের বাড়ীতে বড় বড় লোকদের সে নিমন্ত্রণ করত যখন, তখন সত্যিই উপভোগ্য হত ব্যাপারটা। অতিথি-সৎকার করতে জানত সে। যুগলকেও এমন তালিম দিয়ে ছিল যে নামজাদা অভিজাতবংশীয় কৃতবিদ্য ব্যক্তিদের সঙ্গে আলাপ করতেও তার তাল কাটত না কখনও। পুরন্দরবাবুর মাঝে মাঝে সন্দেহ হত যে যুগল পালিতেরও নিজস্ব বুদ্ধি আছে কিছু--ইচ্ছে করলে নিজের শক্তিতেই হয়তো আলাপ করতে পারে সে--কিন্তু পাছে বেশী বকবক করে এই ভয়ে অপর্ণা তাকে ওজনকরা ভদ্রতা-সম্মত কথা ছাড়া অন্য কথা কইতেই দিত না। ভদ্রসমাজে যুগল পালিতের স্বকীয়তা পরিস্ফুটই হতে পায় নি কখনও। ভাল-মন্দ মিশিয়ে তার নিজস্ব চরিত্র ছিল নিশ্চয়ই একটা। কিন্তু তা কেউ জানবার সুযোগ পায় নি। মৃদু হেসে আসতো আসতো ভদ্রতা করেই কালক্ষেপ করতে হত তাকে। তার সদগুণগুলো চাপা পড়ে যেত অপর্ণার জ্যোতিতে, আর বদগুণগুলো বিলুপ্ত হত তার শাসনে। পুরন্দরবাবুর মনে পড়ল যুগল পালিতের পরচর্চা করার দিকে একটু ঝোঁক ছিল, প্রতিবেশীদের নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রূপ করতে ভালই বাসত সে—কিন্তু অপর্ণার ভয়ে সে মুখ খুলতে পারত না। নানারকম গালগল্প করার দক্ষতা ছিল যুগলের, কিন্তু করতে পেত না। যা সংক্ষেপে সারা যায় এবং যা কোন দিক দিয়েই উল্লেখযোগ্য নয় এ রকম প্রসঙ্গ ছাড়া অন্য কোন প্রসঙ্গ উত্থাপনই করতে দিত না তাকে অপর্ণা। যুগল মদ খেত, সুযোগ পেলে বেশ টানতে পারত, কিন্তু উপায় ছিল না। অপর্ণা ভারী কড়া ছিল সে বিষয়ে। স্ত্রীর ভয়ে যুগল মদ ছুঁত না। কিন্তু বাইরে থেকে তাকে স্ত্রৈণ বলে' সন্দেহ করবার উপায় ছিল না—বরং মনে হত অপর্ণাই পতিভক্তিপরায়ণা বাধ্য স্ত্রী, ভুলেও স্বামীর বিরুদ্ধাচরণ করে

না। শুধু মনে হত নয়, অপর্ণা তা নিজেও বিশ্বাস করত সম্ভবত। যুগল হয় তো অপর্ণাকে ভালবাসত—হয় তো খুব গভীরভাবেই ভালবাসত, কিন্তু বাইরে থেকে তা বোঝবার উপায় ছিল না। অপর্ণার কড়া শাসনের জন্যই হয় তো ছিল না। বর্দ্ধমানে থাকবার সময় পুরন্দরবাবুর প্রায়ই মনে হ'ত তাঁর সঙ্গে অপর্ণার যে সম্বন্ধ দাঁড়িয়েছে তা যুগল জানে কি না। কোন সন্দেহই কি হয় না তার মনে? অপর্ণাকে প্রশ্নও করেছেন অনেকবার—কিন্তু প্রতিবারই এক উত্তর পেয়েছেন। অপর্ণা বিরক্তি ভরে প্রতিবারই বলেছে—উনি কিছু জানেন না, জানতে পারেন না—ও নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার নেই। অপর্ণার আর একটা বিশেষত্ব ছিল—স্বামীকে কখনও খেলো করবার চেষ্টা করত না সে। অপর কেউ করলে বরং চটে যেত, স্বামীর পক্ষ নিয়ে কোমর বেঁধে তর্ক করত তার সঙ্গে। ছেলেপিলে ছিল না, সুতরাং একটু বার ফটকা হতেই হয়েছিল তাকে। কোন নিমন্ত্রণ, কোন পার্টি বাদ যেত না। কিন্তু তাই বলে' যে ঘরের দিকে টান ছিল না, তা নয়। মনে হত বাইরের সামাজিক আনন্দে তার মন ভরত না। ঘর-সাজানো, সেলাই-করা, রান্নার ব্যবস্থা করা এই সব গৃহস্থালী কাজেও অনেক সময় কাটাত সে। কাল রাত্রে যুগল যে কথাটা বললে—অনেক সময় সন্ধ্যাবেলায় পড়াশোনার চর্চাও হত। কখনও যুগল পালিত কোন বই পড়ত তাঁরা শুনতেন। তিনিও পড়তেন কখনও কখনও। যুগল চমৎকার পড়তে পারত, মাঝে মাঝে তাক লেগে যেত পুরন্দরবাবুর। অপর্ণা সেলাই করতে করতে গম্ভীরভাবে শুনত। রবিবাবুর গল্প কবিতা পড়া হত বেশী - কিন্তু মাঝে মাঝে গম্ভীর জিনিসও হত—হীরেন দত্তর 'গীতায় ঈশ্বরবাদ' পড়া হয়েছিল একদিন। পুরন্দরবাবুর রুচি ও বিদ্যার প্রতি অপর্ণার শ্রদ্ধা ছিল, কিন্তু নীরবে শ্রদ্ধা করত সে। কখনও উচ্ছ্বসিত হয় নি। ভাবটা যেন পুরন্দরবাবুর শ্রেষ্ঠত্ব এমনই অবিসংবাদিত যে তা' নিয়ে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। মোটের উপর সাংস্কৃতিক এবং সাহিত্যিক বিষয়ে সে প্রায় চুপ করেই থাকত—পুরন্দরবাবুর

মনে হত এ সব বিষয়ে খুব যেন উৎসাহ নেই তার। সমাজে থাকতে গেলে এ সবের সংস্রবে বাধ্য হয়ে আসতে হয়—হয় তো এদের উপযোগিতাও আছে কিছু—তাই যেন সে এসব সহ্য করে। যুগলের কিন্তু খুব উৎসাহ ছিল এ সব বিষয়ে।

পুরন্দরবাবুর দিক থেকে ব্যাপারটা যখন চরমে উঠেছিল—অর্থাৎ যখন তিনি প্রায় উন্মত্ততার শেষ সীমায় উপস্থিত হব হব করছিলেন—ঠিক সেই সময়ে প্রণয় পর্বে ছেদ পড়ল হঠাৎ একদিন। হঠাৎ অপর্ণাই সব চুকিয়ে দিল একদিন! তাঁকে ছেঁড়া চটির পাটির মতো ছুঁড়ে ফেলে দিলে যে—এ কথা কিন্তু বুঝতে পারেন নি তিনি তখন।

এর মাস দুই আগে এক বিলেত-ফেরত ছোকরা পুলিশ বিভাগে বড় চাকরি নিয়ে বর্দ্ধমানে এসেছিল। যুগলদের বাড়িতে যাতায়াতও সুরু করেছিল সে। আগে তাঁরা তিন জন ছিলেন—ইনি আসাতে চার জন হলেন। অপর্ণা এই 'ছেলেমানুষ' অফিসারটিকে বেশ সাড়ম্বরে অভ্যর্থনা করলে—ভাবভঙ্গী দেখে মনে হল তাকে 'ছেলেমানুষ' বলেই গণ্য করেছে সে। পুরন্দরবাবুর মনে তাই কোন সন্দেহই হয় নি। এ সব কথা ভাববার মতো মনের অবস্থাও ছিল না তাঁর—কারণ অপর্ণা তখন তাঁকে 'নোটিশ' দিয়েছে। বিচ্ছেদ অনিবার্য। বহু কারণ অপর্ণা দেখিয়েছিল—তার মধ্যে প্রধানতম—সে সন্তানসম্ভবা। সুতরাং অবিলম্বে অন্তত চার পাঁচ মাসের জন্য স্থান ত্যাগ করতে হবে···এ নিয়ে কোন কেলেঙ্কারী যদি হয় তাহলে তার স্বামীর মনে কোন সন্দেহ জাগবে না অন্তত। পুরন্দরবাবুর মনে হল যুক্তিটা বড্ড বেশী প্যাঁচালো। তিনি সোজা বললেন—চল আমার সঙ্গে। বম্বে, মাদ্রাজ, কাশী, কাশ্মীর যেখানে হোক। কিন্তু কিছু হল না, তাঁকে একাই ফিরতে হল শেষ পর্যন্ত। অবশ্য মাত্র তিন চার মাসের জন্য—এ আশ্বাস না পেলে কোন ব্যক্তিই নিরস্ত করতে পারত না তাঁকে, অপর্ণাকে নিয়েই আসতেন তিনি। ঠিক দু'মাস পরে অপর্ণার এক চিঠি পেলেন—আপনার

ফেরবার দরকার নেই আর। যা মরে' গেছে, কি হবে তাকে আবার বাঁচিয়ে? চেষ্টা করলেও তা কি আর বাঁচে কখনও? সুখবর আছে একটা, আমার যে 'ভয়' হয়েছিল তা অলীক। পুরন্দরবাবু খবর পেলেন "হেলেনমাইন" পুলিশ অফিসারটি বেশ জমিয়েছেন সেখানে। পুরন্দরবাবুর কাছে সমস্ত ব্যাপারটা জলের মতো পরিষ্কার হয়ে গেল তখন। মোহের সমস্ত কুয়াশা কেটে গেল নিমেষে। আরও কিছুদিন পরে, মানে কয়েক বৎসর পরে, এ খবরও তিনি পেয়েছিলেন যে পূর্ণ গাঙ্গুলীও গিয়ে জুটেছিল সেখানে এবং এক আধ দিন নয় পুরো পাঁচটি বছর ছিল। পূর্ণ গাঙ্গুলীর এত দুর্লভ সৌভাগ্যের কারণ বোধ হয় অপর্ণা বুড়ো হয়ে আসছিল ক্রমশ, টেনে বেড়াবার প্রবৃত্তি ছিল না, সুযোগও জোটে নি হয় তো।

বিছানায় পুরো এক ঘণ্টা বসে' রইলেন তিনি। তারপর উঠে স্নান করলেন, চা খেলেন। চা খেয়েই বেরিয়ে পড়লেন তাড়াতাড়ি, যুগল পালিতের খোঁজে। তার সঙ্গে কাল রাত্রে যে অভদ্র ব্যবহারটা করেছিলেন তার স্মৃতিটা মুছে ফেলতে হবে যেমন করে হোক। ছি, ছি, বড় দুর্ব্যবহার করে ফেলেছেন…।

গত রাত্রে যুগল পালিতের রহস্যময় আবির্ভাবটার নানা ব্যাখ্যা নিজেই বার করছিলেন তিনি মনে মনে…হয়তো আকস্মিক খেয়াল লোকটার… কিম্বা হয় তো মদ খেয়েছিল…কিম্বা আরও কিছু হবে হয় তো। কিন্তু যার সঙ্গে সব চুকে বুকে গেছে তার স্বামীর সঙ্গে আবার কেন যে তিনি নূতন করে' পরিচয় জমাতে যাচ্ছেন তার কোন ব্যাখ্যা তাঁর মাথায় এল না। কি যেন একটা আকর্ষণ করছিল তাঁকে। প্রাণে একটা অদ্ভুত সাড়া তুলেছে লোকটা।

৫

যুগল পালিত ঠিকানা বদলায় নি। সে রকম কোন উদ্দেশ্যই তার ছিল না। পুরন্দরবাবু কেন যে ওরকম বেখাপ্পা একটা প্রশ্ন করেছিলেন তা তিনি নিজেই ঠিক করতে পারছিলেন না। একটু খোঁজ করেই যুগলের বাসাটা পেয়ে গেলেন তিনি। দোতলায় থাকে যুগল। সঙ্কীর্ণ অন্ধকার নোংরা স্যাঁতসেঁতে সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠেই একটা কান্না শুনতে পেলেন। ছোট মেয়ের কান্না, মিহি গলা ··সাত আট বছরের মেয়ের মত মনে হল...ধক্ করে উঠল বুকটা। গুমরে গুমরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে মেয়েটা...আর কে যেন ধমকাচ্ছে তাকে . মেঝেতে পা ঠুকে ঠুকে চীৎকার করছে...ভাঙা কর্কশ গলা ..চেষ্টা করছে মেয়েটার কান্না বাইরের কেউ যেন শুনতে না পায়, ধমক দিয়ে চুপ করতে বলছে তাকে এবং এই সব করতে গিয়ে নিজেই বেশী চেঁচাচ্ছে। নির্ম্মম কণ্ঠে চেঁচাচ্ছে লোকটা...মেয়েটা ক্ষমা ভিক্ষা করছে...আর কোরব না, আর কোরব না ..মাপ কর আমাকে··· উঠেই লম্বা গোছের একটা লোকের সঙ্গে দেখা হল। গলায় পৈতে, ঘাড়ে গামছা···রাঁধুনী বোধ নয়। যুগল পালিতের কথা জিগ্যেস করতেই যে ঘর থেকে কান্নার শব্দ আসছিল সেই ঘরটা দেখিয়ে দিলে সে। পুরন্দরবাবু লক্ষ্য করলেন তার চোখের দৃষ্টি থেকে ঘৃণা ফুটে বেরুচ্ছে।

"কি কাণ্ড" বলে সে নেমে গেল।

পুরন্দরবাবু কড়া নাড়তে যাচ্ছিলেন, কিন্তু কি ভেবে কড়া না নেড়ে সোজা ঢুকে গেলেন ভিতরে। যুগল পালিত খালি গায়ে ঘরের মাঝখানে

দাঁড়িয়ে—চীৎকার করে' ধমকে' (এবং খুব সম্ভব মার-ধোর করে) একটা সাত-আট বছরের মেয়ের কান্না থামাবার চেষ্টা করছে। মেয়েটার গায়ে একটা ময়লা ছেঁড়া ফ্রক। ভয়ে থরথর করে কাঁপছিল সে। যুগল পালিতের দিকে দু' হাত বাড়িয়ে সে যেন তাকেই আঁকড়ে ধরতে চাইছিল; একটা কাতর অনুনয় যেন মূর্ত্ত হয়ে উঠেছিল তার সর্বাঙ্গে। মুহূর্ত্তে সমস্ত দৃশ্য বদলে গেল। একজন আগন্তুককে দেখে মেয়েটা পাশের একটা ছোট ঘরে পালিয়ে গেল ছুটে। যুগল হতভম্ব হয়ে রইল খানিকক্ষণ, তারপর তার মুখে অদ্ভুত হাসি ফুটে উঠল একটা। কাল রাত্রে পুরন্দরবাবু সিঁড়ির কপাট খুলে তার মুখে যেমন হাসি দেখতে পেয়েছিলেন ঠিক তেমনি।

"পুরন্দরবাবু!" সবিস্ময়ে বলে উঠল সে—"সত্যিই আমি আশা করি নি—আসুন আসুন—এই চেয়ারটায় বসুন···ইজি-চেয়ারটায় বসবেন? আমি ততক্ষণ..."

তাড়াতাড়ি সে ওপন-ব্রেষ্ট কোটটা গায়ে দিয়ে ফেললে।

"ব্যস্ত হবেন না।"

পুরন্দরবাবু চেয়ারটায় বসলেন।

"না, জামাটা গায়ে দিয়ে নি, মানে—ওকি আপনি কোণে বসলেন কেন, এই ইজি-চেয়ারটায় বসুন না। সত্যি আপনি যে আসবেন তা ভাবতে পারি নি···সত্যিই প্রত্যাশা করিনি।"

একটা চেয়ার একটু সরিয়ে নিয়ে তার হাতলটার উপর বসল সে।

"আমাকে প্রত্যাশা করেন নি কেন? আমি তো বলেছিলাম আসব সকালে।"

"আমি কিন্তু ভেবেছিলাম আসবেন না আপনি। কাল রাত্রে যা হয়ে গেল তারপর আপনার আসাটা সম্ভবপর মনে হয় নি। মনে হচ্ছিল জীবনে বোধ হয় আপনার সঙ্গে দেখা হবে না আর।"

পুরন্দরবাবু চারিদিকে চেয়ে চেয়ে দেখছিলেন। সবই কেমন যেন

এলোমেলো। বিছানা করা হয় নি, কাপড়-চোপড় চারদিকে ছড়ানো, টেবিলে এঁটো চায়ের পেয়ালা, রুটির টুকরো পড়ে রয়েছে আশে-পাশে, আধ বোতল মদও রয়েছে, বোতলে ছিপি নেই, পাশেই একটা গ্লাস। পাশের ঘরের দরজাটার দিকে চাইলেন একবার, কোন সাড়াশব্দ নেই। মেয়েটা চুপ করে আছে।

"মদ খাচ্ছিলেন না কি" বোতলটা দেখিয়ে পুরন্দরবাবু বললেন।

"না ও কালকের পড়ে আছে খানিকটা, মানে—" মুগল অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল একটু।

"খুব পরিবর্তন হয়েছে আপনার।"

"হ্যাঁ, এ সব ছিল না আগে আমার। কিন্তু গত ফাল্গুন মাসের পর থেকে ধরেছি। সাইরি বলছি। কিছুতে সামলাতে পারি না। তবে এখন আমি খাই নি, মানে মাতাল নই, ভয় পাবেন না। কাল রাত্রে যা করেছিলাম তা আর করব না···কাল রাত্রে ছি ছি কেলেঙ্কারি—কিন্তু সত্যি বলছি গত ফাল্গুন থেকে ..আমার যে এ দশা হবে, এমনভাবে যে ভেঙে পড়ব আমি, তা কে জানত। ছ'মাস আগে কেউ যদি বলত আমায়—বিশ্বাসই করতাম না, কিছুতেই বিশ্বাস করতাম না—"।

"কাল রাত্রে মাতাল অবস্থায় আমার কাছে গিয়েছিলেন তাহলে—"

'হ্যাঁ"—মাটির দিকে চেয়ে একটু কুণ্ঠিত ভাবেই মুগল পালিত বললে কথাটা। "ঠিক সেই সময়ে মদ না খেলেও, তার খানিকক্ষণ আগে খেয়েছিলাম। মদ খাবার খানিকক্ষণ পরে আমার অবস্থা আরও খারাপ হয়। একটু পেটে পড়লেই কেমন যেন হয়ে যাই। কেমন যেন মাথায় খুন চড়ে যায়, মুখ ছুটতে থাকে, আর সঙ্গে সঙ্গে এও মনে হয় দুঃখে বুকটা ফেটে যাবে বুঝি। দুঃখ ভোলবার জন্যেই মদ ধরেছিলাম হয়তো। কে জানে? মদ খেলে কিন্তু আমি না করতে পারি হেন কাজ নেই, যেখানে যাওয়া উচিত নয় সেখানে গিয়ে হাজির হই, যা মুখে আসে

বলি, অপমান করে বসি যাকে তাকে। কাল আমাকে খুব অদ্ভুত মনে হয়েছিল—না ?"

"আপনার মনে নেই ?"

"মনে নেই ! সব মনে আছে…"

"আমারও ঠিক ওই একই কথা মনে হচ্ছে—" পুরন্দর হেসে বললেন। "আমিও আপনার সঙ্গে ব্যবহারটা ঠিক, মানে মেজাজটাই আমার কেমন যেন বিগড়ে ছিল কাল…কেমন যেন তিরিক্ষি গোছের…আমার হয় এরকম মাঝে মাঝে। তাছাড়া কাল অমনভাবে আপনার আসাটা…"

"হ্যাঁ, অত রাত্রে। ঠিক !"—যুগল মাথা নেড়ে সায় দিলে।

কাল রাত্রে কিসে যেন ভর করেছিল আমার উপর। আপনি যদি তখন ঠিক মুহূর্তে দরজা না খুলতেন তাহলে দরজা থেকেই আমি ফিরে যেতাম হয়তো। এক সপ্তাহ আগে আমি আর একদিন গিয়েছিলাম, আপনি বাড়ি ছিলেন না। আর হয়তো আমার যাওয়া উচিত ছিল না, কারণ—যাই বলুন, যদিও দুরবস্থা হয়েছে আমার—আত্মসম্মান এখনও বিসর্জন দিতে পারি নি একেবারে। রাস্তায় কতবার দেখা হয়েছে আপনার সঙ্গে, প্রতিবারেই আমি ভেবেছি—বাঃ উনি চিনতেই পারছেন না আমাকে, মুখ ঘুরিয়ে চলে যাচ্ছেন—ন' বছরের ব্যবধান তো ভীষণ দেখছি। প্রতিবারই আসব আসব করে' আসতে পারি নি। কাল রাত্রে ঘুরতে ঘুরতে এসে পড়লাম আপনার বাড়ির কাছে হঠাৎ…কত রাত হয়েছে খেয়ালই ছিল না। খেয়াল না থাকবার হেতু ওই (বোতলটা দেখাল)—আমার মানসিক অবস্থাও অবশ্য দায়ী খানিকটা। অন্যায় হয়েছিল খুবই। অপর কেউ হলে নোধ হয় মেরে বার করে' দিত আমাকে। আপনি বলে' তাই আবার এসেছেন আমার কাছে—"

পুরন্দরবাবু মন দিয়ে প্রতি কথাটি শুনছিলেন। যুগলের কথাগুলো আন্তরিক বলেই মনে হয়, কিন্তু তার একটি কথা বিশ্বাস করছিলেন না তিনি।

"আপনি কি একাই আছেন? ওই যে ছোট মেয়েটি দেখলাম ওটি কার?"

যুগল সবিস্ময়ে ভ্রূযুগল উৎক্ষিপ্ত করে চেয়ে রইল ক্ষণকাল। তার পরই তার চোখের দৃষ্টিতে আনন্দ ঝলমল করে উঠল যেন।

"ওই ছোট মেয়েটি? ও পাপিয়া।"

"কে পাপিয়া?" প্রশ্নটা করেই পুরন্দরবাবুর অন্তরাত্মা কেঁপে উঠল। সম্ভাব্য উত্তরটার সম্বন্ধে সহসা সচেতন হলেন যেন। প্রথম ঘরে ঢুকেই যখন তিনি পাপিয়াকে দেখেছিলেন তখন এ কথা মনে হয় নি।

"কে আবার, আমাদের পাপিয়া, আমাদের মেয়ে পাপিয়া"—যুগলের মুখে হাসি ফুটে উঠল।

"আপনার মেয়ে? মানে, আপনার অপর্ণা দেবীর?······অপর্ণা দেবীর ছেলে-পিলে হয়েছিল নাকি! শুনিনি তো—"

একটু ইতস্তত করে' ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করলেন পুরন্দরবাবু।

"হয়েছিল বই কি! কিন্তু ঠিক তো, আপনি শুনবেন কি করে? মাথা খারাপ হয়েছে আমার। আপনি চলে আসবার পরই পাপিয়ার জন্ম হয়—হ্যাঁ, ঠিক তার পরই মার কোল আলো করে ও এল···"

যুগল চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠল হঠাৎ···মনে হল যেন বসে থাকতে পারছে না।

"আমি কিছুই শুনি নি"—বিবর্ণমুখে উত্তর দিলেন পুরন্দরবাবু।

"ঠিক তো, ঠিক তো, কি করে' শুনবেন আপনি"—যুগলের কণ্ঠস্বর আবেগে অবরুদ্ধ হয়ে আসছিল—"ছেলে হবার তো কোন আশাই ছিল না আমাদের, আপনি তো জানেন, মাদুলি কবচ কত কি ধারণ করেছিলাম আমরা—হঠাৎ অপ্রত্যাশিত ভাবে সদয় হলেন ভগবান—হা হা হা। কি আনন্দ যে হয়েছিল তা অনুমান করা শক্ত নয়—আপনি চলে আসবার এক বৎসর—না, ভুল করছি—পুরো এক বছর হবে না—থামুন, আপনি যতদূর

মনে পড়ছে অক্টোবর মাসে বৰ্দ্ধমান থেকে চলে আসেন—অক্টোবর, না নভেম্বর ?"

"আমি বৰ্দ্ধমান থেকে এসেছিলাম সেপ্টেম্বরের গোড়ার দিকে। তারিখটা মনে আছে আমার ১২ই সেপ্টেম্বর—"

"ও, সেপ্টেম্বর ? তাই না কি, ও···হ্যাঁ, কি বলছিলাম।" কেমন যেন সব গুলিয়ে গেল যুগল পালিতের।

"ও হ্যাঁ—তাই যদি হয়—১২ই সেপ্টেম্বর, আর পাপিয়ার জন্ম হয়েছে ৮ই মে। তাহলে সেপ্টেম্বর অক্টোবর নভেম্বর ডিসেম্বর জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মার্চ্চ এপ্রিল মে—মানে আট মাসের কিছু ওপর। আপনি যদি দেখতেন ওকে পেয়ে অপর্ণার যে কি রকম—"

"ডাকুন ওকে, ডাকুন" বলতে গিয়ে পুরন্দরবাবুর গলাটা কেঁপে উঠল।

"হ্যাঁ, নিশ্চয়ই"—যুগল পালিত ব্যস্ত হয়ে উঠল—"নিশ্চয়ই, এখনই ডাকছি ওকে। আপনার সঙ্গে ওর পরিচয় করা তো আগে দরকার—" দ্রুতপদে ছোট ঘরটার ভিতর সে-ও ঢুকে পড়ল।

পুরো পাঁচটি মিনিট কেটে গেল। ঘরের ভিতর থেকে নিম্নকণ্ঠে ফুসফুস কথাবার্ত্তা শোনা যেতে লাগল। মনে হল পাপিয়াও কি, বললে যেন। আসতে চাইছে না বোধ হয়, পুরন্দরবাবু ভাবলেন।

একটু পরেই বেরিয়ে এল দুজনে।

"এই দেখুন, আপনার নাম শুনে ভারী ঘাবড়ে গেছে, এত লাজুক! আত্মসম্মান বোধও কম নয় মেয়ের। হুবহু মায়ের প্রতিমূর্ত্তি আর কি—" যুগল হাত ধরে টেনে এনেছিল তাকে। সে আর কাঁদছিল না। মাটির দিকে চেয়ে ঘাড় হেঁট করে' চুপ করে' দাঁড়িয়ে রইল। ছিপছিপে লম্বা গড়নের মেয়েটি, ভারী চমৎকার। চোখ তুলে চাইল একবার। কৌতূহল হল বোধ হয়। বড় বড় কালো চোখে কিন্তু বিষণ্ণ দৃষ্টি। একবার চোখ তুলেই নামিয়ে নিল আবার। অপরিচিত লোক দেখলে শিশুদের চোখে যে

গভীর দৃষ্টি ফুটে ওঠে, যে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তারা অপরিচিত আগন্তুককে আড়-চোখে নিরীক্ষণ করে, এর চোখেও তা আছে—কিন্তু তা ছাড়াও আরও কি যেন একটা আছে—পুরন্দরের মনে হল।

যুগল হাত ধরে তাকে আরও কাছে টেনে নিয়ে এল।

"তোমার কাকাবাবু হ'ন, তোমার মায়ের খুব বন্ধু ছিলেন এককালে। লজ্জা কি, প্রণাম কর।"

ভয়ে ভয়ে একটু নীচু হল সে—কিন্তু ঠিক প্রণাম করল না।

"ওর মা ওকে প্রণাম করতে শেখায় নি। সে কি বলত জানেন? সকলের পায়ে মাথা কুটে কুটেই এদেশের মেয়েরা আরও অপদার্থ হয়ে গেল। অদ্ভুত মত ছিল তার!"

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে রইল সে পুরন্দরবাবুর মুখের দিকে।

পুরন্দরবাবু বুঝতে পারছিলেন যে যুগল তাকে লক্ষ্য করছে, কিন্তু আত্মগোপন করবার কোন প্রয়াস আর করছিলেন না তিনি। পাপিয়ার হাত ধরে' তার মুখের দিকে চেয়ে তিনি স্তব্ধ হয়ে বসেছিলেন। কিন্তু পাপিয়া একটু বিব্রত হচ্ছিল যেন—বাপের দিকে বারবার চাইছিল সে। যুগলের প্রতি কথাটি মন দিয়ে শুনছিল। পুরন্দর নির্নিমেষে চেয়ে ছিল পাপিয়ার কালো চোখ দুটির দিকে। না, ও চোখ ভুল হবার নয়। মুখের লালিত্য, ঠোঁটের গড়ন, চুলের রং···অদ্ভুত মিল! যুগল ইতিমধ্যে অত্যন্ত আবেগভরে অনর্গল কি যে বকে যাচ্ছিল, পুরন্দরবাবু তা শুনতেই পাচ্ছিলেন না। শেষ কয়েকটা কথা শুধু তাঁর কানে গেল "..ভগবান যখন একে দিলেন তখন আমাদের কি যে আনন্দ হয়েছিল তা ধারণাই করতে পারবেন না আপনি। দেখতে দেখতে আমার নয়ন-মণি হয়ে উঠল মশাই। এমন কি এ-ও আমার মাঝে মাঝে মনে হত, অপর্ণাকে ভগবান যদি কেড়েও নেন পাপিয়াকে নিয়ে আমি সে শোক ভুলতে পারব। হ্যাঁ, এ বিশ্বাস আমার হয়েছিল—"

"আর মিসেস পালিতের?"

"অপর্ণার? তার স্বভাব তো আপনার ভাল করেই জানা আছে, সে মুখে বেশী কিছু প্রকাশ করতে পারত না, সে স্বভাবই ছিল না তার কিন্তু মৃত্যু-শয্যায় শেষ বিদায় নেবার বেলায় সব প্রকাশ হয়ে পড়ল শেষে। 'মৃত্যু-শয্যায় বলছি বটে কিন্তু মৃত্যুর কথা ভাবেও নি সে। মৃত্যুর আগের দিনও সে বলেছে যে আমরা মিছি মিছি ব্যস্ত হচ্ছি—তার কিছু হয় নি, ডাক্তাররা রোগ ধরতে পারছে না বাজে ওষুধ খাওয়াচ্ছে খালি। সারদাবাবু ফিরে এলেই (সারদা ডাক্তারকে মনে আছে আপনার?) ভাল হয়ে যাবে সে। কিন্তু দেখুন! মরবার পাঁচ ঘণ্টা আগেও বলেছে যে পাপিয়ার জন্মদিনে তার পিসিদের আনতে হবে···

পুরন্দরবাবু চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন হঠাৎ। পাপিয়া তীক্ষ্ণ একাগ্র দৃষ্টিতে তার বাবার দিকে চেয়েছিল, পুরন্দরবাবুর মনে হ'ল দৃষ্টিতে যেন মৌন ভর্ৎসনাও ফুটে উঠেছে একটা।

"এর কোন অসুখ করে নি তো?" তাড়াতাড়ি জিগ্যেস করলেন তিনি, যদিও সেটা বেখাপ্পা শোনাল।

"এর? না, তা তো মনে হয় না···তবে এখানে যে অবস্থায় আছি, দেখতেই পাচ্ছেন"—যুগল পালিতের কণ্ঠস্বরে উদ্বেগ ফুটে উঠল—"আর অদ্ভুত ওর স্বভাব, এমন তীক্ষ্ণ। মা মারা যাবার পর পনর দিন বড্ড কাবু হয়ে পড়েছিল, কেবল কান্না। এই এখুনি, আপনি আসবার ঠিক আগেই, কি কান্নাটাই কাঁদছিল। কেন কাঁদছিলি বল ত! শুনবেন? আমি ওকে একলা ফেলে রেখে বাইরে যাই কেন। বলছে মা বেঁচে থাকতে আমাকে তুমি যত ভালবাসতে এখন আর তত বাস না। এই নিয়ে অভিমান! কোথায় খেলনা নিয়ে খেলা টেলা করবে···অবশ্য খেলবার সঙ্গীও কেউ নেই এখানে—"

"একেবারে একা আছে ও?"

"একেবারে একা। চাকরটা দিনে একবার আসে শুধু—"

"আর ওকে একা রেখে বাইরে চলে যান আপনি ?"

"কি করব ? কাল যখন বেরুলাম ওকে ওই ছোট ঘরটায় পুরে তালা দিয়ে গেলাম। সেই জন্যেই আরও কাঁদছিল আজকে। কিন্তু ওছাড়া আর কি উপায় আছে বলুন। আপনিই বলুন, পরশু দিন রাস্তায় বেরিয়ে গিয়েছিল, একটা ছোঁড়া এমন ঢিল ছুঁড়ে মেরেছে যে কপালটা কেটে গেছে। আমি বেরিয়ে গেলেই কাঁদবে, আর পাড়ার প্রত্যেককে জিগ্যেস করবে যে কখন ফিরব আমি। এটা কি ভাল ? আপনিই বলুন। আমারও অবশ্য দোষ আছে, এখখুনি ফিরব বলে' বেরুলাম, এলাম তার পরদিন—কাল ঠিক এই হয়েছিল। আর সব চেয়ে চমৎকার হচ্ছে—ওর কান্নাকাটি শুনে—বাড়িওয়ালা কামার ডেকে তালা ভেঙে ঘর থেকে বার করেছিল ওকে—ছি—ছি—কি কাণ্ড···মনে হচ্ছে আমি মানুষ নই, পশু। মাথার ঠিক নেই, একটু মাথার ঠিক নেই—বুঝলেন।"

মৃদু ক্ষুব্ধ কণ্ঠে পাপিয়া বলল—"বাবা—"

"ওই, আবার সুরু করছ বুঝি ! এখনি কি বলেছি তোমাকে। কি বলেছি—"

"না আর বলব না, আর বলব না।"—ভয়ে বিবর্ণ হয়ে দুহাত জোড় করে বারবার একই কথা আবৃত্তি করতে লাগল সে।

"না, এরকমভাবে তো চলতে পারে না"—আদেশের ভঙ্গীতে পুরন্দরবাবু বললেন। ধৈর্য্য রক্ষা করা অসম্ভব হয়ে উঠছিল তাঁর পক্ষে।

"আপনি গরীব নন···এখানে এমন ভাবে থাকবার মানে কি—পাড়াটা জঘন্য···"

"পাড়াটা ? কিন্তু আর হপ্তাখানেকের ভিতর চলে যাব আমরা বোধ হয়। এইতেই প্রচুর টাকা খরচ হয়ে গেছে···গরীব নই তা ঠিক···কিন্তু···"

"খুব হয়েছে, আর বলতে হবে না" বলেই পুরন্দরবাবু থেমে গেলেন (ধৈর্য্যের সীমা সত্যিই অতিক্রম করেছিলেন তিনি) কিন্তু তাঁর ভাবভঙ্গী যেন

বলতে লাগল "খুব হয়েছে, আর বলতে হবে না। যা বলবে তা আমি জানি, আর কতটা সত্যি বললে, তাও জানি।"

"শুনুন, একটা কথা বলছি। আপনি বলছেন বেশীদিন থাকবেন না, এক হপ্তা কিম্বা বড় জোর পনর দিন। এখানে আমার জানাশোনা একটি পরিবার আছে—খুবই জানাশোনা আমার সংগে—গত কুড়ি বছর থেকে জানাশোনা। বাড়ির মালিক ভবেশ মল্লিক ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট। এখানেই আছেন এখন, আপনি যে ব্যাপারে এখানে এসেছেন তাতে তিনিও সাহায্য করতে পারবেন। তারা এখন এখানেই আছে—যাদবপুরে প্রকাণ্ড বাড়ি তাদের—অনেক জায়গা। ভবেশবাবুর স্ত্রী আমার বোনের মতো। তার আটটি ছেলেমেয়ে। চলুন পাপিয়াকে তাঁর কাছে রেখে আসি···সময় নষ্ট না করে' এখুনি চলুন। আপনি যে ক'দিন এখানে থাকবেন পাপিয়া ওইখানেই থাকুক। খুব ভাল লোক তাঁরা—খুব খুশী হবেন, নিজের ছেলের মতন যত্ন করবেন ওকে। নিয়ে চলুন, বুঝলেন···"

অত্যন্ত অধীর হয়ে উঠেছিলেন পুরন্দরবাবু এবং তা গোপন করার প্রয়োজনও অনুভব করছিলেন না।

"তা' কি করে' হয়"—নাক সিটকে পুরন্দরবাবুর দিকে আড়চোখে চেয়ে যুগল পালিত বললে।

"হবে না কেন ?"

"বাঃ। যদিও আপনি একজন পুরোনো পরিচিত লোক—সেকথা বলছি না, কিন্তু হঠাৎ আমার মেয়েকে একটা অচেনা পরিবারে পাঠিয়ে দেওয়াটা কি ভাল ? বিশেষত তাঁরা বড়লোক, আমার মেয়েকে কি চক্ষে দেখবেন তা যখন জানি না।"

"কি বিপদ! আমি তাদের চিনি যে, আমারই পরিবার বলে' ধরে' নিতে পারেন তাঁদের। বিশ্বাস হচ্ছে না আমার কথা।"—সক্রোধে প্রায়

চীৎকার করে' উঠলেন পুরন্দরবাবু—ভবেশবাবুর স্ত্রী নীলিমা আমার কথা শুনলে একটুও আপত্তি করবেন না—আমার নিজের মেয়ে হলে যেমন যত্ন করতেন ঠিক তেমনি যত্ন করবেন। এতে আপত্তির কিছু নেই।"

"কিন্তু একটু কেমন যেন ঠেকছে আমার। আমাকে মাঝে মাঝে অন্তত দু' একবারও দেখা করতে যেতে হবে তো···হাজার হোক আমি ওর বাবা··· হি হি—তাছাড়া অত বড়লোক ওঁরা।"

"মোটেই বড়মানুষি চাল নেই ওদের, অত্যন্ত সাদাসিধে লোক। সেখানে অনেক ছেলেমেয়ে আছে, ও গেলে বেঁচে যাবে সেখানে। ওর ভালর জন্যই বলা, অন্য কোন উদ্দেশ্য নেই আমার। আপনিও চলুন না কাল, পরিচয় করিয়ে দেব, আপনার নিজে একবার গিয়ে বলা উচিতও, মানে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত। চলুন আজই যাই।"

"কিন্তু মানে, কেমন—"

"না, না কোন সঙ্কোচের কারণ নেই, আমি বলছি। আপনি বুঝতেও পারছেন সঙ্কোচের কোন কারণ নেই, ভান করছেন শুধু। শুনুন, আজ রাত্রে আমার বাসায় আসুন, রাত্রে সেখানে থাকবেন, ভোরে উঠেই বেরিয়ে যাব না হয়।"

"সত্যি কি উপকারী লোক আপনি—রাত্রে আপনার বাড়ীতে যেতে বলছেন?"

যুগল পালিত হঠাৎ গদগদ কণ্ঠে বলে উঠল—"আপনার এত ঋণ কি করে যে শোধ করব! কোথায় থাকেন তাঁরা?"

"যাদবপুর।"

"কিন্তু ওর জামা কাপড়ের কি হবে? অত বড়লোকের বাড়ীতে ওকে এই পোষাকে পাঠাতে, মানে, হাজার হোক আমি ওর বাবা তো—"

"কি বিপদ! বলছি তারা ভদ্রলোক, কারও পোষাক নিয়ে তারা মাথা ঘামায় না, তাছাড়া আপনার মেয়ের পোষাক এমন কি খারাপ, এখন

শোকের সময় বেশী সাজসজ্জা করলেই বরং খারাপ দেখাবে···পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হলেই হল···

"প্যাপিয়ার জামা কাপড় সত্যিই খুব অপরিচ্ছন্ন ছিল।

"জামা কাপড় ছেড়ে ফেলুক তাহলে"—যুগল পালিত ব্যস্ত হয়ে উঠল—"শাড়ী যা আছে গুছিয়ে নিক। ধোপার বাড়ীও গেছে কিছু।"

"একটা গাড়ি ডাকতে বলুন তাহলে তাড়াতাড়ি।"

যুগল বেরিয়ে গিয়ে গাড়ি ডাকতে বললে।

কিন্তু আর একটা মুস্কিল হল, পাপিয়া যেতে রাজি হল না। সভয়ে সে এতক্ষণ সব শুনছিল। পুরন্দরবাবু লক্ষ্য করলে দেখতে পেতেন যে তিনি যখন যুগলের সঙ্গে কথা কইছিলেন প্যাপিয়ার মুখ শুকিয়ে যাচ্ছিল ক্রমশঃ।

"আমি যাব না"—মৃদু কিন্তু দৃঢ়কণ্ঠে সে বললে।

"দেখুন! ঠিক মায়ের মতো স্বভাব হয়েছে ওর, দেখছেন—"

"না, মোটেই আমি মায়ের মতো নই, মোটেই আমি মায়ের মতো নই—এমনভাবে পাপিয়া কণ্ঠস্বরে বলতে লাগল যেন মায়ের মতো হওয়াটা তার একটা অপরাধ এবং বাবার কাছে সেজন্য সে ক্ষমা ভিক্ষা করছে।

"তোমাকে ছেড়ে আমি যাব না···"

তারপর হঠাৎ সে পুরন্দরবাবুর দিকে ফিরে বললে—"আপনি যদি আমাকে নিয়ে যান তাহলে আমি···"

কথা শেষ করবার পূর্ব্বেই যুগল ক্ষেপে হাত ধরে হিড় হিড় করে' কোণের ঘরটায় টেনে নিয়ে গেল তাকে। তর্জ্জন গর্জ্জন চাপা কান্না শোনা যেতে লাগল। কয়েক মিনিট পরে যুগল বেরিয়ে এসে জোর করে একটু হেসে বললে—"আসছে এবার। পুরন্দরবাবু অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে রইলেন। তার দিকে চাইতে প্রবৃত্তি হল না।

পুরন্দরবাবুর যে ঠাকুরটার সঙ্গে দেখা হয়েছিল সে এসে জিনিষপত্র স্যুটকেশে গুছোতে লাগল। পুরন্দরবাবুর দিকে চেয়ে বললে—

পাপিয়াকে আপনি নিয়ে যাচ্ছেন ? আপনার বাড়ি বুঝি এখানে বেশ করছেন, বড় ভাল মেয়েটি, বড় লক্ষ্মী, এখানে যা কষ্টে ছিল—"

"তুমি যা করছ কর, ফাজিল কোথাকার—ধমকে উঠল যুগল।

"ফাজিল বলছেন কি মশাই ? মিছে কথা বলিনি কিছু। এখানে যে সব কাণ্ড হয় তা ওটুকুন মেয়ের চোখের সামনে হওয়াই কি ভাল ? ফাজিল ! যেখানে গতর খাটাব সেখানেই অন্ন জুটবে দু'টি। হক কথা বলতে ভয় পাব না কখনও—"

গজগজ করতে করতে সে বেরিয়ে গেল। তারপর এসে বললে—"গাড়ি এসেছে" পাপিয়ার স্যুটকেসটা নিয়ে বেরিয়ে যেতে যেতে পুরন্দরবাবুর দিকে চেয়ে আবার বললে, "ওর ভাগ্য ভাল যে আপনি এসে গেছেন"—

পাপিয়া বেরিয়ে এল। বিবর্ণ মূর্ত্তি, আনত চক্ষু। কারুর দিকে চাইলে না, পুরন্দরবাবুর দিকে না, বাপের দিকেও না। যাবার সময় বাবাকে প্রণাম পর্য্যন্ত করল না। যুগল একটু কায়দা করে' তার কপোল চুম্বন করলে, আলতো আলতোভাবে পিঠটা চাপড়ে দিলে একটু, পাপিয়ার ঠোঁট চিবুক কেঁপে উঠল একবার—কিন্তু সে বাবার দিকে চাইল না। যুগলের মুখটা ফ্যাকাসে হয়ে গেল, হাত কাঁপতে লাগল—পুরন্দরবাবু যদিও প্রাণপণে চেষ্টা করছিলেন যুগলের দিকে না চাইতে, তবু তিনি স্পষ্ট দেখতে পেলেন। কোন রকমে এখান থেকে বেরুতে পারলে বাঁচি—এই তাঁর মনে হচ্ছিল খালি।

"আমার দোষ কি" ভাবছিলেন তিনি, "এতো হ'তই—হতে বাধ্য।"

সবাই নীচে নেমে এল। ঠাকুরটা পাপিয়াকে আদর করলে একটু। গাড়ী যখন চলতে সুরু করেছে তখন পাপিয়া হঠাৎ তার বাবার দিকে চেয়ে দু'হাত তুলে চীৎকার করে' উঠল—আর একটু হলে জানলা দিয়ে লাফিয়ে পড়ত—কিন্তু ঘোড়া ছুটো ছুটতে সুরু করেছে তখন।

৫

"অসুখ করবে কেন? গাড়ী থামাতে বলব? জল চাই?—"

পুরন্দরবাবু ভয় পেয়ে বার বার জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন।

পাপিয়া তাঁর দিকে ফিরে চেয়ে রইল খানিকক্ষণ···চোখ দুটো জ্বলছে যেন।

"কোথা নিয়ে যাচ্ছেন আমাকে?" তীক্ষ্ণকণ্ঠে হঠাৎ প্রশ্ন করল সে।

"খুব ভাল জায়গা, দেখবে খুব ভাল লোক তারা। চমৎকার ফাঁকা বাড়ি, অনেক সঙ্গী পাবে, কত খেলা করবে তারা তোমার সঙ্গে ভয় কি, তোমার ভালর জন্যেই নিয়ে যাচ্ছি তোমাকে। রাগ কোরো না, পাপিয়া।"

পুরন্দরবাবুর পরিচিত কেউ এ সময় তাঁকে দেখলে বিস্মিত হতেন।

"উঃ—কি—কি ভয়ঙ্কর লোক আপনি—ক্ষোভে দুঃখে পাপিয়ার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে আসছিল—জ্বলন্ত দৃষ্টি মেলে সে চেয়ে রইল শুধু।

"পাপিয়া, আমি—"

"আপনি পাজি, পাজি, পাজি, পাজি।"

নিজের হাত দুটো কচলাতে লাগল সে। পুরন্দরবাবু কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে বসে রইলেন।

"পাপিয়া মা—কেন এমন করছ, কেন এ কথা বলছ—"

"বাবা কি কাল আসবেন? সত্যি আসবেন?"

"হ্যাঁ। আমি নিজে নিয়ে আসব তাঁকে।"

"না। ঠিক ফাঁকি দিয়ে পালাবেন তিনি।"

নক্ষ—(৮)

"তোমার বাবা কি ভালবাসেন না তোমাকে ?"

"না, মোটেই না।"

"দুর্ব্যবহার করেন তোমার সঙ্গে ? বল—"

পাপিয়া নীরব। তারপর তাঁর দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে অন্য দিকে চেয়ে রইল। অনেক সাধ্য সাধনা করলেন পুরন্দরবাবু, কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। কত কি বললেন, কত বোঝালেন, পাপিয়া শুনল বটে, কিন্তু মনে হল কিছু বিশ্বাস করছে না সে। কিন্তু সে যে শুনছে এতেই পুলকিত হয়ে উঠলেন তিনি। মানুষ মদ খেলে যে কি হয় তাই বোঝাতে লাগলেন তাকে। কোন ভয় নেই, তিনি তার আর তার বাবার যাতে কোন বিপদ না হয় তার ব্যবস্থা করবেন। পাপিয়া কি বুঝতে পারছে না যে তিনি তাদের কত আপন লোক, তাকে কত ভালবাসেন। পাপিয়া মুখ ফিরিয়ে তাঁর দিকে চাইলে এবং তীক্ষ্নদৃষ্টিতে চেয়েই রইল। তিনি গল্প করতে লাগলেন যে তার মায়ের সঙ্গে কত বন্ধুত্ব ছিল তাঁর, তাদের বাড়িতে কতবার গেছেন তিনি। এ কথা শুনে পাপিয়ার মন একটু ভিজল মনে হল। ক্রমশ সে দু'একটা প্রশ্নের উত্তরও দিতে লাগল, যদিও সাবধানে এবং দু'এক কথায়। কিন্তু যা তিনি শুনতে চাইছিলেন তা কিছুতে বললে না সে, বাবার কথা একটি বললে না। পুরন্দরবাবু তার হাতখানা কথা বলতে বলতে ধরলেন এবং ধরেই থাকলেন। হাত সে টেনে নিলে না। নানা কথার মধ্যে একটা কথা কিন্তু স্পষ্ট হয়ে উঠল—বাবাকে সে মায়ের চেয়ে বেশী ভালবাসত; বাবাই তাকে বরাবর বেশী স্নেহ করেছেন, মা তার দিকে ফিরেও চাইতেন না। কেবল মরবার আগে চুমো খেয়ে অনেকক্ষণ কেঁদেছিলেন তিনি···অনেকক্ষণ···এখন সে যাকে খুব ভালবাসে, রোজ রাত্রে মনে পড়ে তাকে। পুরন্দরবাবু দেখলেন মেয়েটির আত্মসম্মান-জ্ঞান খুব আছে, কথায় কথায় এত কথা বলে ফেলে হঠাৎ যেন তার হুঁস হল যে সে অন্যায় করছে—চুপ করে' গেল আবার। কান্নাকাটি আর করলে না,

কিন্তু চুপ করে' রইল। বুনো জানোয়ারকে বন্দী করলে সে যেমন চুপ করে থাকে ঠিক তেমনি। একটা অচেনা জায়গায় যাচ্ছে বলেই যে তার কষ্ট হচ্ছিল তা ঠিক নয়। অন্য আর একটা কারণ ছিল।

পুরন্দরবাবু অনুভব করলেন সেটা। বাবার ব্যবহারে লজ্জায় মাথা কাটা যাচ্ছিল যে তার। এত সহজে তিনি আসতে দিলেন তাকে একটা অচেনা লোকের সঙ্গে। মনে হল তাঁর বোঝাটা পরের ঘাড়ে কোনক্রমে তুলে দিয়ে বাঁচলেন যেন?

"মেয়েটা অসুস্থ"—পুরন্দরবাবু ভাবছিলেন···"খুবই অসুস্থ···ভয়ে ভাবনায় আরও কাবু হয়ে পড়েছে। মাতালটা করেছে কি! এতক্ষণে বুঝতে পারছি সব' কোচোয়ানকে জোরে হাঁকাতে বললেন তিনি। যাদবপুর জায়গাটা ফাঁকা, বাগানও আছে ভদ্রলোকের একটা, ছেলেমেয়েগুলিও ভাল, নতুন জায়গায় গিয়ে শরীরটা সেরে যেতে পারে, তারপর···। তারপর যে কি হবে সে সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না তাঁর মনে—ইতিমধ্যেই ভবিষ্যতকে রঙীণ করে তুলেছিলেন মনে মনে। আর একটা কথাও নিঃসন্দেহে অনুভব করছিলেন তিনি, এখন যা তাঁর মনে হচ্ছে তা ইতিপূর্বে আর কখনও হয় নি, এ মনোভাব জীবনে বদলাবেও না আর কখনও।

"আঁকড়ে ধরবার মতো এই তো একটা পেয়েছি কিছু—সম্পূর্ণ জীবন একটা" সানন্দে ভাবছিলেন তিনি।

অনেক চিন্তা তাঁর মনের উপর দ্রুতবেগে খেলে যাচ্ছিল, কিন্তু একটাকেও আমোল দিলেন না তিনি—পরে ভাল করে' ভেবে দেখা যাবে সব। ভাল করে' ভেবে না দেখা পর্যন্ত প্রত্যেকটিকেই চমৎকার মনে হচ্ছিল, একেবারে অকাট্য—এ ছাড়া আর কি হওয়া সম্ভব! এই করতে হবে।

ভাবছিলেন—"সবাই মিলে বুঝিয়ে মাতালটার হাত থেকে উদ্ধার করতে হবে একে। যাদবপুর ওদের বাড়িতেই থাকবে। দেবে না? ভাল করে' বোঝালে ঠিক দেবে। প্রথমে কিছুদিনের জন্য যাদবপুর রেখে চলে যাক···

তারপর ক্রমশঃ আমি আমার কাছে নিয়ে নেব। সেইটিই আমার উদ্দেশ্য। এ ছাড়া আর তো আমি কিছু চাই না। কিন্তু যুগলও হয় তো ওকে চায়। ওই হয় তো ওর জীবনের একমাত্র সুখ···তা হলে ওকে যন্ত্রণা দেয় কেন! যন্ত্রণা দিয়ে সুখ পায় বোধ হয়।"

অবশেষে এসে পৌঁছল তারা। ভবেশবাবুর বাড়িখানা সত্যিই চমৎকার। গাড়ি থামতেই একদল ছেলেমেয়ে কলরব করতে করতে এসে অভ্যর্থনা করল। পুরন্দরবাবু অনেকদিন আসেন নি। তাঁকে দেখে সবাই মহা খুশী—সবাই ভালবাসে তাঁকে। ওরই মধ্যে যারা বড়, গাড়ি থেকে নামতে না নামতেই তারা চীৎকার করে উঠল—"আপনার মকোদ্দমার কি হল কাকাবাবু—কত বাকী আর—"

বড়দের অনুকরণে ছোটরাও তাই বলতে লাগল—মহা সোর গোল তুললে সবাই মিলে। নীলিমা দেবী বেরিয়ে এলেন, ভবেশবাবুও। তাঁরাও স্মিতমুখে মকোদ্দমার বিষয়ে জানতে চাইলেন।

নীলিমা দেবীর বয়স বছর সাঁইত্রিশ। একটু মোটা হয়ে গেছেন, কিন্তু তবু এখনও সুন্দরী বলা চলে। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, চোখে মুখে বেশ একটা সজীবতা আছে। ভবেশবাবুর বয়স বছর পঞ্চাশ, চালাক চতুর বুদ্ধিমান এবং সর্বোপরি মহাশয় ব্যক্তি। পুরন্দরবাবুর মতে এঁরাই আদর্শ গৃহস্থ। এই পরিবারটির প্রতি পুরন্দরবাবুর অনুরাগের আর একটি বিশেষ কারণ ছিল। প্রায় কুড়ি বছর আগে, পুরন্দরবাবুর ছাত্রজীবন শেষ হয় নি তখনও, এই নীলিমা দেবীকে বিয়ে করবার জন্যে পাগল হয়েছিলেন তিনি। নীলিমা দেবীই তাঁর জীবনের প্রথম প্রণয়। প্রচণ্ড হাস্যকর এবং চমৎকার। নীলিমা দেবী কিন্তু বিয়ে করেছিলেন ভবেশ মল্লিককে। পাঁচ বছর পরে দেখা হয়েছিল আবার। সেই উদ্দাম প্রণয় ক্রমশঃ রূপান্তরিত হল শান্ত স্নিগ্ধ বন্ধুত্বে। বন্ধুত্বের মধ্যে একটু বৈশিষ্ট্য ছিল অবশ্য। এক অনির্দিষ্ট ফল্গুধারার গোপন রসে তা সঞ্জীবিত থাকত যেন। কোন কালিমা ছিল না, গ্লানি ছিল

না, ভদ্রতা ছাড়া আর কিছু ছিল না এ বন্ধুত্বে। তাঁর জীবনে পবিত্র প্রণয়ের একটি মাত্র নিদর্শন বলে' বোধ হয় এর বিশেষ একটা মূল্য ছিল তাঁর কাছে। এই পরিবারের সংস্পর্শে এলে তাঁর সমস্ত মুখোস সমস্ত বহিরাবরণ খসে যেত যেন। সরল, উদার-হৃদয় পুরন্দরবাবু আত্মপ্রকাশ করতেন, সহজ ভাবে। ছেলেদের সঙ্গে মিশতেন, তাদের আদর করতেন, নিজের সমস্ত দোষ ত্রুটি অকপটে স্বীকার করতেন, কোন রকম ভড়ং থাকত না। প্রায় বলতেন যে সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে এদের কাছেই এসে থাকবেন এবার। মুখের কথা নয়, সত্যি ইচ্ছে ছিল তাঁর।

পাপিয়ার কথা সব খুলে বললেন। বেশী বলবার দরকার ছিল না, পুরন্দরবাবুর অনুরোধই যথেষ্ট এ পরিবারের কাছে। নীলিমা সস্নেহে অভ্যর্থনা করে' নিলেন মাতৃহীন পাপিয়াকে এবং ছেলেমেয়েরা যখন পাপিয়াকে বাগানে টেনে নিয়ে গেল তখন তিনি পুরন্দরবাবুকে বললেন যে তাঁর যথাসাধ্য তিনি করবেন, পাপিয়ার কোন কষ্ট হবে না, পুরন্দরবাবু নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।

আধঘণ্টা পরেই তিনি বললেন—"এবার আমাকে যেতে হবে।" সবাই আশ্চর্য্য হয়ে গেল। কতদিন তিনি আসেন নি, এসেই বলছেন যেতে হবে। আধঘণ্টা পরেই। কিন্তু পুরন্দরবাবু ব্যস্ত হয়ে উঠলেন. তাঁর অধৈর্য্য দেখে ও অবাক লাগল সকলের। পুরন্দরবাবু প্রতিশ্রুতি দিলেন যে পরের দিনই আবার আসবেন, আজ কিন্তু যেতেই হবে। সকলেই লক্ষ্য করল বেশ একটু উত্তেজিত হয়ে রয়েছেন তিনি। হঠাৎ উঠে তিনি নীলিমা দেবীকে বললেন—"শোন, একটু কথা আছে তোমার সঙ্গে, চল ওঘরে চল।"

পাশের ঘরে গিয়ে বললেন—"অনেকদিন আগে তোমাকে একটা কথা বলেছিলাম মনে আছে? তোমাকেই বলেছিলাম খালি, ভবেশবাবু এর বিন্দুবিসর্গ কিছু জানেন না। আমার সেই বর্দ্ধমানের ব্যাপারটা?"

"মনে আছে বই কি, প্রায়ই সে গল্প করতেন যে"— মৃদু হেসে নীলিমা বললেন।

"গল্প নয়, সত্য কথা, আর তোমাকেই কেবল বলেছিলাম তা। তার পরিচয় তোমাকে দিই নি। সে এই যুগল পালিতের স্ত্রী। সে এখন মারা গেছে—পাপিয়া তারি মেয়ে—মানে আমারই মেয়ে।"

"সত্যি!"

"সত্যি—কোন ভুল নেই এতে"—উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বললেন তিনি।

অতিশয় উত্তেজিতভাবে সংক্ষেপে যতটা পারলেন বললেন আবার—সবটাই বললেন।

অপর্ণার নামটি ছাড়া নীলিমা সবই শুনেছিলেন আগে। পুরন্দরবাবু নামটা আগে বলেন নি—কারণ তাঁর ভয় ছিল যদি কখনও অপর্ণা পালিতের সঙ্গে নীলিমার দেখা হয়ে যায় তখন সে হয়তো ভাববে—পুরন্দরবাবুর মতো লোক—এই মেয়েকে এত ভালবেসেছিলেন! কি আশ্চর্য্য! নীলিমাকে পর্য্যন্ত নামটা বলেন নি তাই।

"ওর বাপ কিছু জানে না?"—নীলিমা প্রশ্ন করলেন।

"তা, মানে—হ্যাঁ—সন্দেহ—জানেই ধরতে হবে। ব্যাপারটা ঠিক পরিষ্কার হয়নি এখনও আমার কাছে। হ্যাঁ জানে বই কি—কাল আজ দু'দিনই যা লক্ষ্য করলাম তাতে তাই তো মনে হয়। কিন্তু কতটা জানে তাই আমাকে জানতে হবে। তাই আমি যেতে চাইছি এখুনি, আজ রাত্রে তার আসবার কথা আছে আমার বাসায়। আমি কিছুতে বুঝতেই পারছি না জা লে কি করে'—সমস্তটা জানা কি করে সম্ভব! কিন্তু জেনেছে। পূর্ণ গাঙ্গুলীর সম্বন্ধে যে জেনেছে তাতে আর সন্দেহ নেই! কিন্তু আমার কথা জানলে কি করে? অপর্ণা খুব চতুর মেয়ে ছিল—কারও নাম বলবার পাত্রী সে নয়। তা ছাড়া জানই তো—স্বামীদের অদ্ভুত একটা অন্ধ বিশ্বাস থাকে স্ত্রীদের সম্বন্ধে। স্বর্গের দেবতাকে তারা বরং অবিশ্বাস করে কিন্তু স্ত্রীকে নয়।

নুপেনের তো কথাই নেই। না, না, মাথা নেড়ো না—আমারই ষোল আনা দোষ তা আমি স্বীকার করছি। শুধু এখন নয়—বহুদিন থেকেই স্বীকার করছি আমিই দোষী।...সে যে সব জানে একথাটা এত স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল আজ সকালে যে, তার কাছে আমি প্রায় স্বীকার করে' ফেলেছিলাম সব। কাল রাত্রে হঠাৎ দেখা হয়ে এমন লজ্জিত হয়ে পড়েছিলাম, এমন অভদ্র ব্যবহার করে বসেছিলাম—ছিছি কি যেন হয়ে গেল একটা! মদ খেয়ে এসেছিল লোকটা বুঝলে? কিন্তু আমার মনে হচ্ছে মদ খেয়েছিল বলেই এসেছিল, বুকের জ্বালাটা চাপতে পারে নি—তার প্রতি কত বড় অন্যায় যে করা হয়েছে তাই জানাতেই এসেছিল—মানে, না এসে পারে নি। অন্যায়টা কে যে করেছে তা-ও সে জানে...সেই কথাটাই বলতে এসেছিল...তা না হলে রাত দুপুরে অমন করে' আসার মানে হয় না কোনও। দোষ দিচ্ছি না তার...আমি হলেও ওই করতুম। কাল আজ দু'দিনই আমি গোপন করতে পারিনি নিজেকে। হড়বড় করে' কি সব যে বলে' বসলাম...আঃ! আর ঠিক এমন সময় এল যখন আমার মাথার ঠিক নেই। পাপিয়াকেও ঠিক যন্ত্রণা দেয় ও। আমার মনে হয় মনের ঝাল ঝাড়বার জন্যে...মেয়েটার ওপর দিয়ে প্রতিশোধ নিচ্ছে! হ্যাঁ, প্রতিশোধ নিতে পারে ও...যদিও মানুষ নয়, একটা কীট-বিশেষ...কিন্তু বিষটুকু ঠিক আছে। আগে লোকটা ভদ্র ছিল—যদিও মেরুদণ্ড বলে কিছু ছিল না। এই ধরণের লোকরাই উচ্ছন্ন যায় শেষ পর্য্যন্ত। আমি কোন অন্যায় করতে চাই না ওর ওপর—ওর যথাসাধ্য উপকার আমি করব। আমিই দোষী...আমিই ওর জীবনটা নষ্ট করে' দিলাম হয় তো। লোকটা সত্যিই বন্ধু বলে' ভাবত আমাকে। একবার বর্দ্ধমানে হাজার দুই টাকার দরকার হয়েছিল আমার—চাইবামাত্র দিয়ে দিলে, একটা রসিদ পর্য্যন্ত চায় নি...বুঝলে..."

"আপনি বড্ড বেশী অস্থির হয়ে পড়েছেন"—নীলিমা বললেন—

"আপনার জন্যে ভাবনা হচ্ছে আমার। পাপিয়াকে নিজের মেয়ের মতো

যত্ন করব আমি—সে বিষয়ে কোন চিন্তা করবেন না। কিন্তু অনেক কিছু গড়াতে পারে এর থেকে, আপনি সাবধানে কথাবার্ত্তা কইবেন তাঁর সঙ্গে—উচ্ছ্বাসের মুখে যা তা ব'লে বসবেন না যেন। যা হবার তা তো হয়েই গেছে।"

পুরন্দরবাবুকে বিদায় দেবার জন্যে সবাই বারান্দায় বেরিয়ে এলেন। ছেলেরাও পাপিয়াকে নিয়ে এল বাগান থেকে। পাপিয়ার সঙ্গে খুব ভাব হয়ে গেছে তাদের। পুরন্দরবাবুকে দেখে পাপিয়া মাথা নীচু করলে—লজ্জায় বোধ হয়। পুরন্দরবাবু সকলের সামনে তার মুখচুম্বন করলেন, বারবার বললেন যে কালই তিনি যুগলবাবুকে নিয়ে আসবেন। পাপিয়া চুপ করে' মাটির দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর হঠাৎ তাঁর হাত দুটো ধরে' সকরুণ দৃষ্টিতে চাইলে তাঁর দিকে, মনে হল কি যেন বলবে। তিনি তাড়াতাড়ি তাকে নিয়ে পাশের ঘরটায় ঢুকে পড়লেন।

"কি, পাপিয়া"—

পাপিয়া এদিক ওদিক চেয়ে দেখলে, তারপর তাকে নিয়ে ঘরের কোনে চলে গেল একেবারে।

"কি বলবে, কি হয়েছে—"

চুপ করে' রইল সে, যেন কথা বলতে পারছে না। নিৰ্নিমেষ কালো চোখের দৃষ্টি তাঁর মুখের উপর নিবদ্ধ করে' নীরবে দাঁড়িয়ে রইল। তার চোখে মুখে সমস্ত ভঙ্গিমায় ফুটে উঠল ভয়—কিসের একটা আতঙ্ক।

"গলায় দড়ি দেবে···" চুপি চুপি বললে, ষড়যন্ত্রের মতো।

"কে গলায় দড়ি দেবে ?"

"বাবা। কাল রাত্রে গলায় দড়ি দিচ্ছিল। আমি দেখতে পেয়েছিলাম। আমাকে বলেছে গলায় দড়ি দিয়ে মরব। অনেকদিন থেকে চেষ্টা করছে··· কাল আমি দেখেছিলাম—"

"কি বাজে কথা বলছ"—মুখে একথা বললেও পুরন্দরবাবু মনে মনে

বিস্মিত হলেন। হঠাৎ পাপিয়া তাঁর পায়ে ধরে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল···কি যে বলল কিছুই বুঝতে পারলেন না তিনি···কি করবেন ভেবে পেলেন না। অশ্রুসিক্ত বেদনাতুর দৃষ্টি তুলে সে চেয়ে রইল তাঁর দিকে। পাপিয়ার এই মূর্তিই আঁকা হয়ে রইল তাঁর মনে·· ভবিষ্যতে স্বপ্নে জাগরণে এই মূর্তিই দেখতে পেতেন তিনি।

হঠাৎ তাঁর হিংসে হল। মেয়েটা সত্যিই কি বাপকে এত ভালবাসে! সমস্ত রাস্তা এই কথাটাই ভাবতে ভাবতে এলেন। বুকটা পুড়ে যেতে লাগল। আজ সকালেই তো বললে যে সে মাকে খুব ভালবাসত। তাকে বোধ হয় ঘৃণা করে! বাবা গলায় দড়ি দেবে মানে? মাতালটা সত্যিই আত্মহত্যা করবে না কি।···না, ব্যাপারটা জানতে হবে। আমি আজই গিয়ে সব জানতে হবে—দেরি করলে চলবে না।

৭

জানবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন তিনি।

"সকালে এমন গুলিয়ে গেল সব। ভাল করে' ভেবে দেখবারই সময় পেলাম না"—পাপিয়ার কথা ভাবতে ভাবতেই আসছিলেন পুরন্দরবাবু—"এবার কিন্তু তলিয়ে দেখতে হবে ব্যাপারটা কতদূর গড়িয়েছে সত্যি।" তলিয়ে দেখবার আগ্রহাতিশয্যে একবার ভাবলেন সুগলের বাসাতেই যাওয়া যাক, কিন্তু তখনই আবার মনে হল—"না, আমার বাসাতেই ও আসুক। ইতিমধ্যে আমি আমার মকোর্দ্দমার কাজ খানিকটা সেরে ফেলি।"

কাজ সারবার জন্য কাগজপত্তর ঘাঁটাঘাঁটি সুরু করলেন; কিন্তু একটু পরেই বুঝতে পারলেন যে কাজ এগোচ্ছে না, বারবার অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছেন। পাঁচটার সময় চা খাবার জন্যে যখন বেরুলেন, তখন তাঁর প্রথম মনে হল যে সত্যিই বোধহয় তিনি নিজেই সব করতে গিয়ে আরও জটিল করে' তুলেছেন তাঁর মকোর্দ্দমাকে, তাঁর উকীল তাঁকে দেখলেই যে আত্ম-গোপন করবার চেষ্টা করে—ঠিকই করে বোধ হয়। কেন হাঁপিয়ে মরছি আমি। কথাটা ভেবেই হাসি পেল তাঁর—"একথাটা কাল মনে হ'লে কিন্তু কষ্ট হ'ত।" তখনই কিন্তু অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন আবার। অধীরতা আরও বেড়ে গেল। এলোমেলো নানা চিন্তা জাগতে লাগল মনে—বিশৃঙ্খল পরস্পর-সম্বন্ধ-হীন চিন্তা সব—যার কোন মাথামুণ্ড নেই। ক্রমশঃই অস্থির হয়ে উঠতে লাগলেন।

"নাঃ ওই লোকটিকে চাই"—শেষ পর্য্যন্ত ভাবলেন "ওর রহস্য সমাধান না করতে পারলে কিছুই করা যাবে না।"

সাতটার সময় বাড়ি ফিরে যুগল পালিতকে দেখতে না পেয়ে অত্যন্ত বিস্মিত হলেন তিনি, তারপর রাগ হল, তারও খানিক পরে কেমন যেন দমে' গেলেন। শেষটা ভয় হতে লাগল।

"শেষ পর্যন্ত কি যে হবে ভগবানই জানেন" বারবার আবৃত্তি করতে লাগলেন, বারবার ঘুরে বেড়াতে লাগলেন সারা ঘরময়, বারবার ঘড়ি দেখতে লাগলেন। অবশেষে, নটার সময় যুগল পালিত এল। পুরন্দরবাবুর মনে হল "লোকটা যদি আমাকে ঠকাবার উদ্দেশ্যে থাকে তাহলে এর চেয়ে বড় সুযোগ আর পাবে না। কিন্তু মাথার ঠিক নেই, একদম নেই"—কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই আশ্বস্ত হলেন তিনি, মনের জোর আবার যেন ফিরে এল হঠাৎ।

স্বচ্ছন্দ সাবলীল কণ্ঠেই তিনি বিলম্বের কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। যুগল পালিতও একটু বাঁকা হাসি হেসে স্বচ্ছন্দভাবে বসে পড়ল সোফাটায়। তার স্বাচ্ছন্দ্য দেখে অবাক হলেন পুরন্দরবাবু, আগের রাত্রের মতো মোটেই নয়। এ যেন অন্য লোক।

অতিশয় শান্তভাবে পুরন্দরবাবু সব বলে গেলেন। পাপিয়া কি ভাবে গেল, কত ভদ্রভাবে তাঁরা অভ্যর্থনা করলেন তাকে, পাপিয়াকে ওখানে নিয়ে যাওয়াতে কতটা ভাল হল। ক্রমশঃ পাপিয়ার বদলে কথাটা ভবেশবাবুদের সম্বন্ধে হতে লাগল। কি চমৎকার লোক ওঁরা, তাঁর সঙ্গে কতদিনের আলাপ, ভবেশবাবু নিজে কত সহৃদয়, অথচ প্রভাবশালী লোক—ইত্যাদি। যুগল শুনে যাচ্ছিল—খুব যে মন দিয়ে তা নয়। মাঝে মাঝে চোখ তুলে চেয়ে দেখছিল—একটা তীব্র ক্রূর হাসিও যেন উঁকি দিচ্ছিল চোখের কোণ থেকে।

"বড্ড খামখেয়ালী লোক আপনি"—বলেই অতিশয় বিশ্রী রকমের একটা হাসি হাসলে সে।

"আপনার মেজাজটা আজ যেন খারাপ বলে' মনে হচ্ছে"--পুরন্দরবাবু বললেন।

"হবেই না বা কেন! আর পাঁচজনের যখন হয়, আমারই বা হবে না কেন"—হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে বলে উঠল যুগল, মনে হল যেন ওৎ পেতে ছিল।

"তাতো বটেই—হেসে উত্তর দিলেন পুরন্দরবাবু—"না, আমি ভাবছিলাম কিছু হয়েছে বুঝি।"

"হয়েছে বই কি!"—যুগল এমনভাবে উত্তর দিলে যেন কোন কিছু হওয়াটাই একটা কৃতিত্ব।

"কি হয়েছে?"

যুগল চুপ করে' রইল কিছুক্ষণ।

"পূর্ণবাবু শেষকালে ঠকালেন আমায়—পূর্ণ গাঙ্গুলী কলিকাতার অভিজাত সম্প্রদায়ের শিরোভূষণ একজন..."

"দেখা করলেন না আপনার সঙ্গে? দারোয়ান বুঝি বললে বাড়ীতে নেই?"

"এবার বাড়িতেই ছিলেন, আমি প্রবেশের অনুমতিও পেয়েছিলাম, তাঁর সঙ্গে দেখাও হয়েছিল—কিন্তু তিনি মারা গেছেন! কাল মহাসমারোহ-সহকারে তাঁর শবযাত্রা বেরুবে শুনলাম।"

"সে কি! পূর্ণবাবু মারা গেছেন?"

পুরন্দরবাবু অভিমাত্রায় বিস্মিত হলেন, যদিও বিস্মিত হবার কারণ ছিল না কিছু। "হ্যাঁ। ছ' বছর যিনি আমাদের ঘনিষ্ঠ এবং অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন কাল দুপুরবেলা তিনি মারা গেছেন, অথচ আমি খবর পাই নি কিছু। কাল দুপুরবেলাই ভাবছিলাম ভদ্রলোকের খবরটা নিয়ে আসি একবার। আহা, মেনিন্‌জাইটিস হয়েছিল! দেখা করবার সুযোগ যখন ঘটল, গিয়ে মড়া দেখলুম। একেই বলে কপাল! তাদের বলে এলাম, বড় ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন আমাদের। কিন্তু ছ' বছর ধরে আমার সঙ্গে উনি যে ব্যবহারটা করেছেন—দীর্ঘকালের এই প্রগাঢ় বন্ধুত্ব—সে সম্বন্ধে এখন কি করা উচিত বলুন তো। ওর জন্যেই আমার এখানে আসা..."

"তা আর কি হবে বলুন"—পুরন্দরবাবু হেসে বললেন—"উনি তো আর ইচ্ছে করে' মারা যান নি।"

হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে যুগল বলে উঠল—"বাদীর ভূমিকায় অভিনয় করছি যে!" একটা অদ্ভুত কুটিল হাসি খেলে গেল তার চোখে। পুরন্দরের দিকে নির্নিমেষে চেয়ে বসে রইল খানিকক্ষণ, সমস্ত দৃষ্টি দিয়ে একটা প্রচ্ছন্ন বিষ ক্ষরিত হচ্ছে যেন। কিন্তু এভাব বেশীক্ষণ থাকল না। পরক্ষণেই তার অধরেও ব্যঙ্গ-তিক্ত হাসি ফুটে উঠল একটা ধীরে ধীরে।

"ও কথার মানে কি" যেন কিছু বোঝেন নি এমনিভাবে প্রশ্ন করলেন তিনি।

"বাদীর ভূমিকা মানে বাদীর ভূমিকা—ভূমিকা" টেবিল চাপড়ে উত্তর দিল যুগল।

"আপনি অভিনয় করছেন ?"

"নিশ্চয়! শুধু অভিনয় করছি না—মহত্ব সহকারে করছি"—সমস্ত দন্ত দীরদে বিকশিত করে' একটা অতি কুৎসিৎ হাসি হাসলে যুগল।

কিছুক্ষণ উভয়েই নীরব।

"আপনার বুকের পাটা আছে, একথা মানতেই হবে"—পুরন্দরবাবু বললেন অবশেষে।

"কেন, একথা বললাম বলে? তাহলে আনান কিছু—বেশী না এক বোতল।"

"বেশ তো, কি খাবেন আপনি?"

"শুধু আমি কেন, আপনিও খাবেন আজ। খাবেন না?" একটা আদেশের সুর যেন ধ্বনিত হয়ে উঠল যুগলের কণ্ঠস্বরে—চোখের দৃষ্টি থেকে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছুটে বেরুল যেন।

"বেশ তো। কি আনাব? শ্যামপেন?"

"হ্যাঁ, শ্যামপেনই ভাল। হুইস্কি এখন চলবে না।"

পুরন্দর উঠে গিয়ে চাকরকে হুকুম করলেন।

"দীর্ঘ ন'বৎসর পরে পুনর্মিলন উৎসবটা বেশ করে' জমানো যাক—"

একটা বেখাপ্পা বেসুরো হাসি হেসে যুগল বাগিয়ে বলল।

"পুরোনো বন্ধুদের মধ্যে এক আপনিই রইলেন শুধু। পূর্ণবাবু গেলেন।"

কবি গেয়েছেন—

"মধুনিশি পূর্ণিমার আসে যায় বারবার—

সে তো রে ফেরে না আর যে গেছে চলে"

ভঙ্গীভরে হাত দুটি উলটে হাসিমুখে পুরন্দরবাবুর দিকে চেয়ে রইল। "যা বলবি বলে' ফেল না ব্যাটা—ইঙ্গিত ফিঙ্গিত ভাল লাগে না আর" পুরন্দরবাবু মনে মনে বলছিলেন। রাগ ক্রমশই বাড়ছিল তাঁর, আত্মসম্বরণ করা অসম্ভব হয়ে উঠছিল।

"আচ্ছা একটা কথা বলুন তো" বিরক্তি চেপে পুরন্দরবাবু বললেন, "পূর্ণ গাঙুলী যদি আপনার প্রতি অন্যায়ই করেছিলেন তাঁর মৃত্যুতে তো আপনার আনন্দিতই হওয়া উচিত। আপনি ক্ষুব্ধ হচ্ছেন কেন?"

"আনন্দিত! আনন্দিত হতে যাব কেন?"

"আমার তো মনে হয় আনন্দিত হওয়াই উচিত।"

"হি—হি! আমার মনোভাব ঠিক ধরতে পারেন নি আপনি। একজন জ্ঞানী ব্যক্তি বলেছেন—শত্রু মরে যাওয়া ভাল, কিন্তু বেঁচে থাকা আরও ভাল। হি—হি!"

"কিন্তু আপনি তো তাকে একটানা পাঁচ বছর দেখবার সুযোগ পেয়েছিলেন। ক্লান্তি আসা উচিত ছিল"—একটু অতএবকম খোঁচা দিয়ে পুরন্দরবাবু উত্তর দিলেন।

"আপনি কি মনে করেন আমি তখন জানতাম···আমি কি জানতাম তখন?" যুগল পালিতের মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ল হঠাৎ। অন্ধকার কোণ থেকে লাফিয়ে হঠাৎ আলোতে বেরিয়ে এল যেন সে। বেরিয়ে এসে

পাংশু যেন। এতদিন ধরে' যে জটিল প্রশ্নটার সম্মুখীন হতে চাইছিল সে কিন্তু পারছিল না—হঠাৎ আড়াল আবডালে সরে' যাওয়াতে চক্ষুলজ্জার দায় থেকে সে বাঁচল যেন।

"আমাকে আপনি কি ভেবেছেন বলুন তো?"

অপ্রত্যাশিত রকম নতুন একটা দীপ্তি ফুটে উঠল তার চোখে মুখে। চেহারাই বদলে গেল। এতক্ষণ তার মুখভাবে কুৎসিৎ কদর্যতা ছাড়া আর কিছু ছিল না। পুরন্দরবাবু ঘাবড়ে গেলেন একটু।

"আপনি কিছুই জানতেন না এ কি সম্ভব?

"আমি জানতাম সেইটেই কি সম্ভব? সেইটেই কি সম্ভব? আশ্চর্য লোক এই শহরের ভদ্রলোকরা! আপনাদের বিচারে মানুষে আর কুকুরে কোন তফাত নেই, আর আপনারা সবাইকে বিচার করেন নিজেদের হীন মানদণ্ড দিয়ে। সুস্থ মস্তিষ্কে বহাল তবিয়তেই একথা বলছি আপনার মুখের উপর!"

প্রচণ্ড একটা ঘুসি মারল সে টেবিলের উপর। মেরেই একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল, কারণ শব্দটা খুব জোরে হ'ল।

পুরন্দরবাবু গম্ভীর হয়ে পড়লেন।

"শুনুন যুগলবাবু, আপনি জানতেন কি জানতেন না তা আমার কাছে অপ্রাসঙ্গিক, তা আপনি বুঝতেই পারছেন। আপনি যদি না জেনে থাকেন ভালই, যদিও···আর একটা কথাও আমি বুঝতে পারছি না, আপনি এসব কথা আমাকেই বা বলছেন কেন—"

"আপনাকেই ঠিক বলছি না আমি, কিছু মনে করবেন না, আপনাকে লক্ষ্য করেই আমি বলি নি কিছু"—চক্ষু আনত করলে যুগল।

শ্যামপেন নিয়ে চাকর প্রবেশ করল।

"এই যে"—সোল্লাসে যুগল বলে উঠল। চাকরটা আসাতে সমস্যার সমাধান হয়ে গেল।

"গ্লাস আন দিকি বাবা এইবার। বাঃ, আর কিছু চাই না। খুলেই এনেছ, বেশ বেশ। হে ভারত নৃপতিরে শিখায়েছ তুমি ত্যজিতে মুকুট দণ্ড—আহ্ন। যাও—তুমি যাও..."

চাকরটা চলে গেল। বুগলের উৎসাহ সঞ্জীবিত হল, পুরন্দরবাবুর দিকে সে উদ্ধত দৃষ্টি মেলে চাইলে আবার।

"স্বীকার করুন"—হঠাৎ সে বলে উঠল—"স্বীকার করুন যে এসব মোটেই অপ্রাসঙ্গিক নয় আপনার কাছে—রীতিমত প্রাসঙ্গিক, ভীষণ কৌতূহলজনক। এত বেশী যে এই মুহূর্তে যদি আমি সবটা না বলে' চলে' যাই রাত্রে ঘুম হবে না আপনার।"

"কি যে বলছেন—"

"ঠিক বলছি।"

একটা অদ্ভুত হাসিতে তার সমস্ত মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

"আসুন স্বরু করা যাক—"

গ্লাসে মদ ঢালতে লাগল। একগ্লাস পুরন্দরবাবুর দিকে এগিয়ে দিলে।

"আসুন, প্রথমেই প্রিয় পূর্ণবাবুর উদ্দেশ্যে পূর্ণ গ্লাস শেষ করা যাক—" বলেই গ্লাসটা তুলে ঢক ঢক করে শেষ করে' ফেললে।

"আমি পূর্ণবাবুকে আর টানব না।"

"কেন! অমন একটা পুণ্য-স্মৃতি!"

"আপনি এখানে আসবার আগেই খেয়ে এসেছিলেন একটু, নয়?"

"হ্যাঁ, একটু। কেন?"

"না, এমনি। কাল রাত্রে আমার মনে হয়েছিল, আজ সকালে আরও বেশী করে' মনে হয়েছিল যে অপর্ণার মৃত্যুটা বড্ড মর্মান্তিক হয়েছে আপনার পক্ষে।"

"মর্মান্তিক হয় নি তা-ই বা কে বললে আপনাকে এখন?"

ঠিক যেন স্প্রিংয়ের মতন লাফিয়ে উঠল বুগল।

"আহা, আমি সে ভাবে বলছি না কথাটা। পূর্ণবাবুর সম্বন্ধে আপনার ধারণাটা ভুলও তো হতে পারে—এতবড় গুরুতর ব্যাপারে ভুল ধারণা নিয়ে থাকলে—"

যুগলের মুখে চতুর হাসি ফুটে উঠল একটা। বাঁ চোখটা ছোট করে' কুঞ্চিত করলে সে একবার।

"পূর্ণ সাণ্ডেলীর ব্যাপার কি করে' আবিষ্কার করলাম তা জানতে আগ্রহ হচ্ছে আপনার নিশ্চয়।"

পুরন্দরবাবুর মুখ লাল হয়ে উঠল। একটু অপ্রতিভ হয়ে পড়লেন তিনি।

"না, আমার আগ্রহ হবে কেন!"

"বোতল-কোতল সুদ্ধ ব্যাটাকে এই মুহূর্তে দূর করে' দিলে কেমন হয়" পুরন্দরবাবু মনে মনে গজরাচ্ছিলেন। হঠাৎ সমস্ত মুখটা আরও লাল হয়ে গেল তাঁর।

"সব বলছি, ব্যস্ত হবেন না। আপনার কৌতূহল হয়েছে তা বুঝতে পারছি, হাওয়াটাই তো জীবন্ত প্রাণের লক্ষণ, আপনি যে একটা প্রাণবন্ত লোক তাতে আর সন্দেহ কি। হি—হি। দিন একটা সিগারেট দিন··· গত ফাল্গুনের পর থেকে আর···"

"এই যে নিন—"

"গত ফাল্গুনের পর থেকেই আমার সর্ব্বনাশ হয়েছে, তারপর থেকেই উচ্ছন্ন গেছি, বুঝলেন? কেমন করে' কি হল সব বলছি—শুনুন। যক্ষ্মা ব্যাধিটা, আপনি তো জানেন, ভারী এক অদ্ভুত ব্যারাম। যক্ষ্মা রোগী কখনও বিশ্বাস করে না যে তার মৃত্যু আসন্ন—অথচ ফট করে' যে কোন মুহূর্ত্তে মারা যেতে পারে সে। মৃত্যুর ঠিক পাঁচ ঘণ্টা আগে অপর্ণা প্ল্যান করছিল যে পনর দিন পরে সে তার পিসির কাছে বেড়াতে যাবে—পিসি থাকে ত্রিশ মাইল দূরে। অনেক মেয়ের একটা বদ অভ্যাস আছে আপনি জানেন বোধ হয়—শুধু মেয়েদের কেন তাদের প্রণয়ীদেরও আছে—প্রেমপত্র-

গুলি তারা পুড়িয়ে না ফেলে সযত্নে রেখে দেয়। কাগজের টুকরোটি পর্য্যন্ত তুলে রাখে। অনেক সময় আবার সন তারিখ মিলিয়ে গুছিয়ে রাখে থাক করে'। এতে যে কি সুখ পায় তারা—তা তারাই জানে। হয় তো স্মৃতিসুখ, বলতে পারি না। অপর্ণা পিসির বাড়ি বেড়াতে যাবার আয়োজন করছিল যখন মৃত্যুর পাঁচ ঘণ্টা পূর্ব্বে—তখন বুঝতেই পারছেন, মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত ছিল না সে। শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তার আশা ছিল যে ভাল হয়ে যাবে। ফলে হল কি—সে যখন হঠাৎ মারা গেল তখন তার ড্রয়ারে রৌপ্য এবং মুক্তাখচিত একটি আবলুস কাঠের বাক্স থেকে গেল। চমৎকার বাক্সটি। চাবিও সেই ড্রয়ারেই ছিল। সেই বাক্সেই সব ছিল—সমস্ত। বিগত কুড়ি বছরের সমস্ত চিঠিপত্র সন তারিখ মিলিয়ে চমৎকার করে' গুছিয়ে রেখে দিয়েছিল সে। পূর্ণবাবু একটু কবি-প্রকৃতির লোক ছিলেন (একবার একটা মাসিক পত্রে প্রেমের গল্পও লিখেছিলেন বুঝি একটা)—তাঁর চিঠি প্রায় শতাধিক ছিল—সবই তো পাঁচ বছর ধরে' লিখেছেন। কতকগুলো চিঠিতে অপর্ণা আবার নিজের হাতে নোটও লিখেছে কিছু কিছু। স্বামীর দিক দিয়ে জিনিসটা বেশ উপভোগ্য—কি বলেন?"

পুরন্দরবাবু বিদ্যুৎগতিতে ভেবে দেখলেন—না, তিনি কোন চিঠি অপর্ণাকে লেখেন নি। না কিছু না। দুখানা চিঠি অবশ্য লিখেছিলেন—কিন্তু দুটোতেই অপর্ণার নির্দ্দেশ অনুসারে ঠিকানা ছিল যুগলের নামে। অর্থাৎ দুটোই নিরামিষ চিঠি। অপর্ণার শেষ চিঠির উত্তরই দেন নি, দেবার প্রবৃত্তি হয় নি।

গল্প শেষ করে' যুগল মুখে একটা হাসি ফুটিয়ে পুরন্দরের দিকে চেয়ে রইল। চেয়েই রইল পুরো এক মিনিট ধরে'।

"আমার কথার জবাব দিচ্ছেন না যে—"

"কোন কথার?"

"জিনিসটা স্বামীর পক্ষে বেশ উপভোগ্য, কি না—"

"আমি আর কি বলব"—পুরন্দরবাবু উঠে পড়লেন এবং ঘরের চার দিকে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন।

"আপনি ঠিক ভাবছেন—এ লোকটা কি, ঘরের কথা বাইরে বলে' বলে' বেড়াচ্ছে! হি—হি। ঠিক ভাবছেন আপনি—আপনাকে চিনি তো-ভীষণ রুচি-বাগীশ লোক আপনি—"

"আমি কিছুই ভাবছি না। আপনার আচরণে অপ্রত্যাশিত কিছু দেখতে পাচ্ছি না তো। পূর্ণ গাঙ্গুলীকে জীবিত কেন চাইছিলেন তা-ও বুঝতে পারছি, আপনার এ দাবীকে শ্রদ্ধা করতেও ইচ্ছে করছে—"

"আচ্ছা, পূর্ণবাবুকে পেলে কি করতুম আপনি মনে করেন—"

"তা কি ক'রে' বলব?"

"আপনি বোধ হয় ভাবছেন ডুয়েল লড়তুম—ঠ্যাঁ নয়?"

"আঃ কি বিপদ"—একটু অধীরভাবে বলে' উঠলেন পুরন্দরবাবু, তিনি আর আত্মসম্বরণ করতে পারলেন না—"আমার তো মনে হয় এ অবস্থায় লোকে বাজে বকবক করে না, অতীত নিয়ে হা-হুতাশ করে না, নালিশও করে না কারও উপর, কোন রকম বাজে ভাবভঙ্গীর ধার দিয়েই যায় না—এ অবস্থায় যারা ভদ্রলোক তারা যা করবার সোজা করে' ফেলে।"

"হি—হি—হি। আমি বোধ হয় ভদ্রলোক নই—"

"সে আপনি বুঝুন। যদি ভদ্রলোক নন তাহলে জীবিত পূর্ণ গাঙ্গুলীকে চাইছিলেন কেন…"

"পুরোনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা করাটা অন্যায় কি! ঠিক এমনি ভাবে এক বোতল মদ আনিয়ে খেতাম দু'জনে—"

"তিনি মদ খেতেনই না আপনার সঙ্গে।"

"কেন? আপনি খাচ্ছেন তো! আপনার চেয়ে কি হিসেবে বড় তিনি—"

"আমিও আপনার সঙ্গে বসে' মদ খাচ্ছি না ঠিক।"

একটু অপ্রতিভ ও মনে মনে একটু বিরক্ত হলেন পুরন্দরবাবু।

"ও! হঠাৎ আভিজাত্য উথলে উঠল যে আপনারও দেখছি।"

"মহা জুলুমবাজ লোক দেখছি আপনি। নিরীহ স্বামী ছাড়া আপনি আর যে কিছু হতে পারেন তা ধারণা ছিল না আমার!"

"নিরীহ স্বামী! মানে?"—যুগল কান খাড়া করে' উঠে বলল।

"মানে খুব সরল। স্বামী বহুপ্রকার হয়—নিরীহ স্বামী একটা টাইপ।"

"আর জুলুমবাজ? জুলুমবাজ বললেন যে এখনি—"

"ঠাট্টাও বোঝেন না। উঠুন, বাড়ী যান এবার—"

"জুলুমবাজ কথাটি কি অর্থে ব্যবহার করলেন বলুন না খুলে—দোহাই আপনার!—জুলুমবাজ—অ্যাঁ—? জুলুমবাজ!"

"যথেষ্ট হয়েছে, বাড়ি যান এবার। উঠুন, অনেক রাত হয়েছে।"

পুরন্দরবাবুর ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটছিল।

"যথেষ্ট হয় নি মোটেই" 'ফোঁস করে' উঠল যুগল, "আপনার হয় তো আর ভাল লাগছে না কিন্তু যথেষ্ট হয় নি মোটেই। আমার সঙ্গে বসে মদ খেতেই হবে আপনাকে। না খেলে ছাড়ছি না। আসুন—গ্লাস নিন।"

"আপনি যাবেন কি না?"

"যাব। কিন্তু তার আগে মদ খাব। আর আপনাকে আমার সঙ্গে মদ খেতে হবে। খেতেই হবে।"

তার কণ্ঠস্বরে কোন রসিকতা বা ভাঁড়ামির সুর ছিল না। হঠাৎ সে অন্য লোক হয়ে গেল যেন। পুরন্দরবাবু বিস্মিত হয়ে গেলেন।

"আসুন, খান এক গ্লাস আমার সঙ্গে, ক্ষতিটা কি!"

পুরন্দরবাবুর হাতটা বজ্রমুষ্টিতে চেপে ধরে অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাঁর দিকে চেয়ে রইল যুগল। স্পষ্ট বোঝা গেল এক সঙ্গে মদ খাওয়ার গুরুতর মানে আছে অন্য কিছু।

"কিছু ক্ষতি নেই—আসুন। কিন্তু বোতলে আর আছে কি কিছু ?"

"হ্যাঁ, ঠিক দু'টো গ্লাস আছে। রীতিমত সভ্য রীতিতে গ্লাস 'ড্রিংক্' করতে হবে কিন্তু—"

সভ্য রীতি অনুযায়ী গ্লাস ড্রিংক্ করা হ'ল। শেষ করে পুরন্দরবাবু বললেন—"আচ্ছা লোক আপনি।"

যুগল নিজের রগ দু'টো টিপে চুপ করে রইল খানিকক্ষণ মাথা হেঁট করে'। পুরন্দরবাবু প্রতি মুহূর্তে প্রত্যাশা করতে লাগলেন এইবার যুগল তার শেষ এবং আসল কথাটি বলবে। কিন্তু যুগল কিছুই বললে না, চেয়ে রইল কেবল এবং একটু পরে' তাঁর দিকে ফিরে মুচকি মুচকি হাসতে লাগল।

পুরন্দরবাবু আর আত্মসম্বরণ করতে পারলেন না। চীৎকার করে' বলে উঠলেন, "কি বিপদ, কি চান আপনি আমার কাছে! মাতলামি করবার আর জায়গা পেলেন না ?"

"চেঁচাবেন না। চেঁচাচ্ছেন কেন, চেঁচাবার কি আছে! আমি মাতলামি করছি না। আপনি আমার চক্ষে এখন কি জানেন—প্রমাণ চান ?"

হঠাৎ সে পুরন্দরবাবুর হাতখানা তুলে নিয়ে চুম্বন করলে। ঘাবড়ে গেলেন পুরন্দরবাবু।

"এই, এই তার প্রমাণ। আর কিছু বলবার নেই, এবার আমি চললাম।"

"যাবেন না, থামুন। একটা কথা বলতে ভুলে গেছি।"

যুগল পালিত দুয়ারের কাছে ফিরে দাঁড়াল।

পুরন্দরবাবু বললেন (তিনি প্রাণপণে চেষ্টা করছিলেন যুগলের চোখের দিকে না চাইতে)—"কাল আপনাকে ভবেশবাবুদের ওখানে যেতে হবে। তাঁদের সঙ্গে পরিচয়ও হবে, তাঁদের ধন্যবাদ দিয়ে আসবেন। ভুলবেন না, যেতেই হবে।"

"নিশ্চয়। যাব বই কি। নিশ্চয়—হাঁ,"—যুগল মাথা এবং হাত নেড়ে এমন একটা ভঙ্গী করলে যে পুরন্দরবাবুর মনে তার আন্তরিকতা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ রইল না।

"পাপিয়াও অনেক করে' বলে দিয়েছে। আমিও প্রতিশ্রুতি দিয়েছি তাকে যে আপনাকে নিশ্চয় নিয়ে যাব।"

"পাপিয়া!"—যুগল পালিত ঘুরে দাঁড়াল ভাল করে'—"পাপিয়া? পাপিয়া আমার কাছে এখন কি এবং কতটা তা জানেন? কোনও ধারণা আছে আপনার" হঠাৎ পাগলের দৃষ্টি ফুটে উঠল তার চোখে।

"আচ্ছা থাক— সে কথা পরে হবে, পরে হবে। আর একটা কথা শুনুন আগে—একসঙ্গে বসে' মদ খাওয়াতেই সন্তুষ্ট নই আমি," হঠাৎ সে সোজা হ'য়ে দাঁড়াল এবং নির্নিমেষে চেয়ে রইল।

"আবার কি চাই—"

"আমাকে চুমুও খেতে হবে"

"পাগল না কি! কি বলছেন যা তা—"

"হতে পারে, কিন্তু চুমু খেতেই হবে আপনাকে। খান, আসুন। এখুনি তো আমি আপনার কর-চুম্বন করলাম।"

পুরন্দরবাবু বজ্রাহতবৎ নিষ্পন্দ হয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। হঠাৎ ঝুঁকে— যুগল পালিতের মাথাটা তাঁর বুকের কাছে পড়েছিল প্রায়—চুম্বন করলেন তাকে। মুখে ভীষণ মদের গন্ধ!

"বাস্ বাস্ বাস্ বাস্"—চীৎকার করে উঠল যুগল, চোখ দুটো জ্বলে' উঠল যেন উন্মত্ত হিংস্রতায়—"বাস্! এইবার সব খুলে বলি শুনুন—আপনাকে সন্দেহ হয়েছিল আমার। এর পর আর কারও ওপর কি বিশ্বাস হয়?"

হঠাৎ কেঁদে ফেললে সে। ঝর ঝর করে' চোখের জল ঝরে' পড়তে লাগল।

"সুতরাং বুঝতে পারছেন, আপনিই এখন আমার একমাত্র বন্ধু।"

ছুটে বেরিয়ে চলে গেল।

পুরন্দরবাবু স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

"মাতলামি করে' গেল লোকটা"—হাত নেড়ে খানিকক্ষণ পরে বললেন "নাঃ—মাতলামি ছাড়া আর কিছু নয়। স্রেফ মাতলামি।"

পরদিন সকালে পুরন্দরবাবু স্বপনের প্রতীক্ষা করছিলেন, তাকে নিয়ে ভবেশবাবুর ওখানে যেতে হবে। চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে সারা ঘরময় ঘুরে বেড়াতে লাগলেন তিনি। সিগারেট ধরালেন একটা। একটা কথা কিন্তু কিছুতে ভুলতে পারছিলেন না—মনে হচ্ছিল কাল রাত্রে তাঁর গালে কে যেন চড় মেরে গেছে একটা।

"হুঁ···সব জানে, বুঝতে পেরেছে সমস্ত। পাপিয়ার ওপর দিয়ে শোধটা তুলবে" কথাটা ভেবেই ভয় হল তাঁর। পাপিয়ার সুন্দর মুখখানি ভেসে উঠল মনের উপর···বিষাদ-মাখানো মুখখানি। একটু পরেই আবার তাকে দেখতে পাবেন মনে হবামাত্র হৃৎস্পন্দন বেড়ে গেল। পাপিয়া তাঁরই যে।

"না, তর্কের কোন অবসর নেই এতে। পাপিয়া আমারই। ওই এখন আমার জীবন এবং জীবনের লক্ষ্য। অতীতের স্মৃতি নিয়ে কি হবে, গালে চড় মারলেই বা কি এসে যায়। জীবনে কি করলাম এতদিন? কঙ্কাল আর জ্বালা ছাড়া কি বা পেয়েছি। কিন্তু এইবার সব ঠিক হয়ে যাবে, সব বদলে গেছে এর মধ্যেই!"

একটু পুলকিত হবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু একটা ছায়া ঘনিয়ে আসতে লাগল ক্রমাগত। "বেশ বুঝতে পারছি পাপিয়াকে দিয়েই ও জব্দ করতে চায় আমাকে। পাপিয়াকে কষ্ট দিচ্ছে সেই জন্যে। এই ভাবেই প্রতিশোধ নেবে! হুঁ···। না, কাল যা করেছে তা আর করতে দিচ্ছি না অবশ্য"—মুখ চোখ লাল হয়ে উঠল তাঁর—"বারোটা বাজে—এখনও পর্য্যন্ত পাত্তা নেই তার—ব্যাপার কি!"

প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। সাড়ে বারোটা বাজল। অধীর হয়ে উঠলেন শেষে। এল না। হঠাৎ একটা কথা মনে হল—অনেকক্ষণ থেকেই মনে হচ্ছিল—যুগল হয়তো ইচ্ছে করে' আসছে না। পরে এসে কাল রাত্রের মতো আবার একটা নাটক করবে হয় তো। রাগে সর্ব্বশরীর জ্বলে উঠল তাঁর। "সে ভাল করেই জানে যে আমি তার জন্যে অপেক্ষা করছি—এও জানে পাপিয়া তার আশা পথ চেয়ে আছে। তাকে সঙ্গে না নিয়ে যাবই বা কি করে' আমি···আঃ।"

আর অপেক্ষা করতে পারলেন না, একটা বাজতেই যুগলের বাসার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লেন। সেখানে গিয়ে শুনলেন যুগল কাল রাত্রে বাড়ি ফেরেনি, সকালে ন'টার সময় এসেছিল, পনর মিনিট থেকেই আবার বেরিয়ে গেছে। পুরন্দরবাবু বন্ধ দ্বারের সামনে দাঁড়িয়ে চাকরের কথাগুলো শুনলেন, তার পর তালাটা ধরে' অকারণে টানলেন দু' একবার অন্যমনস্ক-ভাবে। তার পর সহসা সচেতন হয়ে লজ্জিত হলেন একটু। বাড়ির মালিক তে'তলায় থাকেন। চাকরটাকে বললেন তাঁকে একবার ডেকে দিতে।

বাড়ির মালিক লোকটি ভালই। ভদ্রলোক। পাপিয়ার কথা জিজ্ঞাসা করলেন, তারপর সব শুনে বললেন, "পাপিয়ার জন্যেই আমি এতদিন কিছু বলিনি মশাই। তা নাহলে এতদিন ওরকম লোককে দূর করে' দিতাম। উনি প্রথমে একটা হোটেলে এসে উঠেছিলেন—ওঁর রকম সকম দেখে হোটেলওয়ালা দূর করে' দিলে। কি বলব মশাই—অত বড় মেয়ে সঙ্গে রয়েছে—একদিন এক মাগী এনে হাজির! চীৎকার করে বলছে আবার—"আমি যদি ইচ্ছে করি—এই তোর মা হতে পারে"—আর সে মাগী কি বললে শুনবেন? বললে—'ঝাঁটা মারি আমি অমন মেয়ের মুখে। মেয়ের বাপের মুখেও'···সে যে কি কাণ্ড মশাই—"

"সত্যি?" পুরন্দরবাবু সত্যিই বিশ্বাস করতে পারছিলেন না।

"আমি স্বকর্ণে শুনেছি। লোকটা মাতাল অবশ্য খুবই হয়েছিল—জ্ঞানগম্যি কিছুই ছিল না, কিন্তু নিজের মেয়ের সামনে ও রকম বেলেল্লাপনা করাটা উচিত কি, মেয়েটা ভাববে কি, নিতান্ত ছেলেমানুষ তো নয়। মেয়েটা খালি কাঁদত, কি আর করবে। আর ও ইচ্ছে করে' কাঁদাত মেয়েটাকে। সেদিন আবার এক কাণ্ড হয়েছিল সামনের বাড়িতে। এক কেরাণী গলায় দড়ি দিয়েছিল। দলে দলে লোক দেখতে গেল। চারদিকে ভীড়। যুগলবাবু বাড়ি ছিলেন না, মেয়েটা ভীড়ে মিশে চলে গেছে সেখানে, দেখলাম মড়াটার দিকে অবাক হয়ে চেয়ে দেখছে। কি দৃষ্টি চোখের! আমি তাড়াতাড়ি টেনে নিয়ে এলাম। ভয়ে ঠক ঠক করে' কাঁপছিল, সাদা মূর্ত্তি—এসেই শুয়ে পড়ল—দেখি মূর্চ্ছা গেছে। মুখে জলের ঝাপটা দিতে জ্ঞান হল। তারপর থেকেই মেয়েটা কেমন যেন হয়ে গেছে। যুগলবাবু বাড়ি এলেন—এসে মেয়েটাকে খামচাতে লাগলেন। ও মারে না কখনও—কেবল খামচায়। তারপর থেকে মদ খেয়ে যখনই বাড়ি ফেরে মেয়েটাকে ভয় দেখায় কেবল—আমিও গলায় দড়ি দেব। তোর জ্বালাতেই গলায় দড়ি দিতে হবে আমাকে। এই দেখ দড়ি এনেছি। সত্যি সত্যি একটা দড়িতে ফাঁস লাগিয়ে দেখায়—আর মেয়েটা ভয়ে চেঁচাতে থাকে—দুহাত দিয়ে বাপের গলা জড়িয়ে কেবলই বলতে থাকে 'কিচ্ছু করব না, তুমি যা বলবে শুনব, গলায় দড়ি দিও না বাবা।' অত্যন্ত করুণ দৃশ্য মশাই। যাচ্ছেতাই—"

যদিও পুরন্দরবাবু এমনই কিছু একটা প্রত্যাশা করেছিলেন, কিন্তু যা শুনলেন তা এতই বীভৎস যে বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হল না তাঁর।

বাড়ি-ওলা আরও অনেক কিছু বললেন। বললেন—পাপিয়া দোতলার জানলা থেকে ঠিক লাফিয়ে পড়ত একদিন তিনি যদি না থাকতেন সে সময়।

পুরন্দরবাবু দোতলা থেকে নেবে গেলেন—পা টলছিল তাঁর।

"ব্যাটাচ্ছেলেকে ধরে' চাবকাব আমি"···এই কথাটাই মনে হচ্ছিল কেবল। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত এই একটা কথাই বারম্বার আবৃত্তি করতে লাগলেন তিনি মনে মনে।

তাঁকে একলাই যেতে হল শেষ পর্য্যন্ত ভবেশবাবুর ওখানে। কিছুদূর গিয়ে গাড়িটা একটা চৌমাথায় দাঁড়াল, সারি সারি অনেক গাড়ি দাঁড়িয়েছে, শোভাযাত্রা চলেছে একটা। প্রচুর ভীড়। হঠাৎ পুরন্দরবাবুর চোখে পড়ল একটা গাড়িতে যুগল রয়েছে! গাড়ী থেকে মুখ বাড়িয়ে তাঁর দিকে চেয়ে মাথা নেড়ে হাসলে একটু। বেশ ফুর্ত্তিতে আছে মনে হ'ল—তাঁকে ইসারা করে' ডাকতেও লাগল। পুরন্দরবাবু গাড়ী থেকে নেমে ভীড় ঠেলে, পুলিশ ঠেলে, প্রায় উর্দ্ধশ্বাসে তার গাড়ির কাছে গিয়ে হাজির হলেন এবং চীৎকার করে বললেন "কি ব্যাপার কি? আপনি এলেন না যে! এখানে কি করছেন?"

"ঋণ শোধ করছি। চেঁচাবেন না অত, ঋণ শোধ করছি সবাই" চোখ মট্‌কে মুচকি হেসে বলল—"বন্ধুবর পূর্ণ গাঙ্গুলীর শবানুগমন করছি—ঋণ—ঋণ শোধ।"

ভয়ানক রাগ হল পুরন্দরবাবুর।

"আঃ—কি যা তা বলছেন! আবার মদ খেয়েছেন না কি? আসুন, নাবুন গাড়ি থেকে, আসুন আমার সঙ্গে।"

"ক্ষমা করবেন, পারব না। মহৎ কর্ত্তব্য এটা—"

"জোর করে টেনে নাবিয়ে নেব"

"আমি চেঁচাব তাহলে, ঠিক চেঁচাব"—গাড়ির ওদিককার কোণে সরে' গেল। যেন ভারি একটা মজার রসিকতা হচ্ছে। পুরন্দরবাবু মনে মনে গাল দিতে দিতে নিজের গাড়িতে ফিরে গেলেন।

"যাকগে। ওরকম লোককে নিয়ে যাওয়াও যায় না ভদ্র পরিবারে" এই ভেবে সান্ত্বনা পাবার চেষ্টা করলেন তিনি, কিন্তু মনটা বিরক্তই হয়ে রইল।

নীলিমাকে গিয়ে সব বললেন। বাড়ী-ওলার কাছ থেকে যা যা শুনেছিলেন সব, তাছাড়া শবাগমনের কথাও। শুনে তিনি একটু চিন্তিত হয়ে পড়লেন।

"আপনার জন্যে ভয় হচ্ছে আমার। ওর সঙ্গে আর কোন সম্পর্ক রাখবেন না।"

"ও কি করবে আমার! একটা হতভাগা মাতাল বই তো নয়"— পুরন্দরবাবু যেন চটেই গেলেন কথাটা শুনে, একটু উত্তেজিত কণ্ঠে বলে' উঠলেন—"আমি কি ভয় পেয়েছি ভাবলে না কি? তাছাড়া সম্পর্ক তো রাখতেই হবে এখন পাপিয়ার জন্যে, পাপিয়ার কথাটা ভেবে দেখ।"

পাপিয়ার এদিকে অসুখ করেছিল। কাল থেকেই জ্বর হয়েছে। কোলকাতা থেকে একজন বড় ডাক্তারকে ডেকে পাঠানো হয়েছে, যে কোন মুহূর্তে তিনি এসে পড়তে পারেন।

ষোল-কলা পূর্ণ হ'ল যেন। পুরন্দরবাবু অত্যন্ত মুষড়ে পড়লেন।

নীলিমা তাঁকে পাপিয়ার কাছে নিয়ে গেলেন।

'কাল সমস্তক্ষণ ওর কাছেই ছিলাম"—ঘরের বাইরে একটু থেমে নীলিমা বললেন—"মেয়েটা খুব চাপা স্বভাবের, আত্মসম্মানও খুব। এখানে আছে সেজন্যে যেন লজ্জায় মাথা কাটা যাচ্ছে। ওর বাবা যে ওকে এমন ভাবে ত্যাগ করেছে এইটে ওর প্রাণে বড্ড লেগেছে। আমার মনে হয় এই ওর অসুখের আসল কারণ।"

"ত্যাগ করেছে মানে? ত্যাগ করেছে বলছ কেন?"

"সম্পূর্ণ অচেনা বাড়িতে এমন ভাবে পাঠিয়ে দেওয়া মানেই তো— বিশেষত এমন লোকের সঙ্গে যে···যে লোকটাও সম্পূর্ণ অচেনা।"

"কি বিপদ, আমি তো ওকে জোর করে' নিয়ে এসেছি—আমি তো এতে কোন—কিন্তু পাপিয়া কি তাই মনে করেছে—ওইটুকু মেয়ে একটা

বোঝে ?—এতটা বোঝবার ক্ষমতা আছে ওর ! যুগল আসবে না এখানে, কি করব বল !"

পুরন্দরবাবুকে একা দেখে পাপিয়া বিস্মিত হ'ল না, একটু ম্লান হাসি হেসে দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে শুল সে। পুরন্দরবাবু অপটুভাবে একটু আদর করবার চেষ্টা করলেন, ভয়ে ভয়ে গায়ে মাথায় হাত দিলেন —পাপিয়া নিস্পন্দ হয়ে রইল। একবার ফিরে চাইল না পর্যন্ত। বাইরে বেরিয়ে এসে পুরন্দরবাবু কেঁদে ফেললেন হঠাৎ।

সন্ধ্যার সময় ডাক্তারবাবু এলেন এবং সব দেখে শুনে ভয় পেয়ে গেলেন। বললেন আমাকে আগেই খবর দেওয়া উচিত ছিল। মাত্র কাল থেকে জ্বর হয়েছে একথা বিশ্বাসই করতে চাইলেন না তিনি প্রথমে।

"আজ রাতটা কি ভাবে কাটে তারই উপর নির্ভর করছে সব—" অবশেষে এই সিদ্ধান্তে এসে অনেক রকম 'ইনস্ট্রাকশনস্' (ব্যবস্থা) দিয়ে বলে গেলেন যে কাল আবার আসবেন সকালেই। গতিক ভাল মনে হচ্ছে না তাঁর।

পুরন্দরবাবু রাতটা থাকতেন কিন্তু নীলিমা দেবী বললেন, "ওর বাপকে আর একবার আনবার চেষ্টা করুন। একথা শুনেও আসবেন না এমন পাষণ্ড কি হতে পারে মানুষ !"

'চেষ্টা !"—পুরন্দরবাবু হঠাৎ ক্ষেপে গেলেন যেন—"হাত পা বেঁধে টানতে টানতে নিয়ে আসব তাকে, যদি না আসতে চায় এবার !" যুগল পালিতকে হাত-পা বেঁধে নিয়ে আসার দৃশ্যটা ফুটে উঠল তাঁর মনে—হঠাৎ রাগ চড়ে গেল। হাত-পা বেঁধেই আনতে হবে, যা থাকে কপালে।

"কাল আমার দুঃখ হচ্ছিল—ভাবছিলাম অন্যায় করেছি লোকটার প্রতি। এখন কিছু দুঃখ হচ্ছে না—মানুষ নয়, একটা পশু !—"

ফেরবার ঠিক আগে নীলিমাকে এই কথাগুলি বলে পাপিয়ার ঘরে আবার ঢুকলেন তিনি।

পাপিয়া চোখ বুজে চুপ করে' শুয়েছিল, যেন ঘুমুচ্ছে। মনে হল একটু

ভাল আছে। পুরন্দরবাবু একটু ঝুঁকে আস্তে আস্তে মাথার উপর হাত রাখলেন, ঘুম ভাঙাবার চেষ্টা করলেন একবার—পাপিয়া ফিরে তাকাল হঠাৎ, যেন সে তাঁরই অপেক্ষায় ছিল এতক্ষণ।

"আমাকে নিয়ে চলুন এখান থেকে।"

অতিশয় করুণ স্বরে সে বললে কথা ক'টি, শান্ত মৃদু মিনতিভরা স্বরে। পুরন্দরবাবু যে তার অনুরোধ রাখবেন না এও যেন সে বুঝতে পেরেছিল—তার বলবার ভঙ্গী থেকেই বোঝা যাচ্ছিল তা। পুরন্দরবাবু অনেক করে' বোঝাতে লাগলেন তাকে।

নীরবে চোখ দু'টি বুজে সে পাশ ফিরে শুল, একটি কথাও আর বললে না। পুরন্দরবাবুর কোন কথা সে যে শুনতে পাচ্ছে তা মনে হল না।

কোলকাতায় পৌঁছে পুরন্দরবাবু সোজা যুগলের বাসায় গেলেন। তখন রাত্রি দশটা; যুগল তখনও বাড়ি ফেরে নি। পুরন্দরবাবু পুরো আধঘণ্টা তার জন্যে অপেক্ষা করলেন, অধীর চিত্তে পরিভ্রমণ করতে লাগলেন তার বাসার বারান্দায়। বাড়ি-ওলা বললেন, ভোরের আগে সে ফিরবে না, কেন বৃথা অপেক্ষা করছেন।

"বেশ ভোরেই আসব তাহলে"—পুরন্দরবাবু আর বেশী কিছু না বলে' বাড়ি ফিরে এলেন। তাঁর সমস্ত শরীরের রক্ত টগবগ করে' ফুটছিল যেন।

বাড়ি ফিরে তিনি অবাক হয়ে গেলেন। তাঁর চাকর বললে "কাল যে বাবু এসেছিলেন তিনি আজও এসেছেন আবার। অনেকক্ষণ থেকে অপেক্ষা করছেন। তাঁকে চা করে' দিলাম। আজও মদ আনবার জন্যে টাকা দিলেন। এনে দিয়েছি এক বোতল।"

৯

যুগল পালিত বেশ জুৎ করে' বসেছিল। আগের দিন যে চেয়ারটায় বসেছিল সেই চেয়ারেই বসে' মহানন্দে মদ খাচ্ছিল সে—হাতে জ্বলন্ত সিগারেট। তৃতীয় গ্লাস শেষ করে' চতুর্থ গ্লাস শুরু করেছিল। টি-পটটা আর আধকাপ চা পড়েছিল টেবিলের একধারে। গায়ের কোট খুলে বেশ বাগিয়ে বসেছিল যুগল। সমস্ত মুখ উদ্ভাসিত।

"আসুন, আসুন, আপনার অপেক্ষাতেই বসে আছি"—পুরন্দরবাবুকে দেখেই বলে উঠল সে—"গরম লাগছিল কোটটা খুলে ফেলেছি, আশা করি আপত্তি নেই আপনার তাতে।"

পুরন্দরবাবুর মুখ ভ্রূকুটি-কুটিল হয়ে উঠল।

"বোতলে আর কতটা আছে? ভদ্রভাবে আলাপ করবার মতো অবস্থা আছে কি আপনার এখন?"

যুগল একটু অপ্রতিভ হয়ে পড়ল।

"না ঠিক নেই। মৃত বন্ধুর স্মৃতিতর্পণ করছি, তবে ঠিক—"

"আমার কথা শুনবেন?"

"সেই জন্যেই তো এসেছি।"

"তাহলে শুনুন—প্রথমেই বলছি আপনি অতি অপদার্থ লোক, বুঝলেন!"

"আপনি যদি এই ভাবে শুরু করেন কি ভাবে শেষ করবেন তাতো বুঝতে পাচ্ছি না। বাবা।"

যুগল ব্যাপারটাকে যদিও লঘু পরিহাস ভরে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করলে কিন্তু মনে মনে একটু ভীত হয়ে পড়ল সে।

আপনার মেয়ে মরছে, ভয়ানক অসুখ তার, আপনি কি তাকে ত্যাগ করেছেন না কি ?”

“সত্যি মরছে ?”

“অসুখ, অসুখ—ভয়ানক অসুস্থ সে…”

“ফিট টিট ?”

“ভাঁড়ামি করবেন না। ভ—য়া—ন—ক অসুখ, হয়তো বাঁচবে না। আপনি গেলেন না কেন ? যাওয়া উচিত ছিল না আপনার ?”

“কেন, ওঁরা আমার মেয়েকে দয়া করে স্থান দিয়েছেন বলে' কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবার জন্যে ! উচিত ছিল। পুরন্দরবাবু, দরদী বন্ধু আমার”—হঠাৎ সে পুরন্দরবাবুর হাত দুটো জড়িয়ে ধরলে নিজের হাতের মধ্যে—“রাগ কোরো না দাদা, রাগ করে' কষ্ট পেও না। আমি যদি মরে যাই, কিম্বা মদের ঝোঁকে গঙ্গায় লাফিয়ে পড়ি দুনিয়ার কি এসে যায় তাতে—কিস্সু না। ভবেশবাবুর বাড়ি যাওয়ার যথেষ্ট সময় পাওয়া যাবে ভবিষ্যতে …যথেষ্ট—সময়ের অভাব কি !”

মৃগেনের অবস্থা দেখে আত্মসম্বরণ করলেন পুরন্দরবাবু।

“আপনি মদের ঝোঁকে কি বলছেন যা তা ! আপনার সঙ্গে একটা দরকারি বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে চাই—আপনি যদি এরকম করেন তাহলে কি করে' হবে তা' ? এ রকম করলে কিন্তু ভয়ানক রাগ করব বলে' দিচ্ছি—শুনুন, আজ রাত্রে থাকুন আপনি এখানে। সকালে দু'জনে যাওয়া যাবে এক সঙ্গে। সোজায় যদি না যান বেঁধে নিয়ে যাব, বুঝলেন ? বেঁধে নিয়ে যাব ! ওই সোফাটায় শুতে আপনার কষ্ট হবে কি—”

যে সোফাটায় তিনি নিজে শুতেন সেইটে দেখিয়ে বললেন “ওটাতে চলবে আপনার ?”

“খুব চলবে। যেখানে হোক শুলেই হ'ল।”

“এই নিন চাদর, তোষক বালিশ” পাশের ঘর থেকে পুরন্দরবাবু নিজেই

বয়ে আনলেন সব এবং যুগলের দিকে ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিতে লাগলেন—"বিছানা পেতে শুয়ে পড়ুন। এখুনি শুয়ে পড়ুন।"

বিছানার বোঝা দু'হাতে আঁকড়ে ধরে' ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে যুগল ইতস্তত করতে লাগল। মুখে মাতালের হাসি। পুরন্দরবাবু আর একবার ধমক দিতেই ব্যস্ত সমস্ত হয়ে টেবিলটা সরিয়ে শুয়ে শুয়ে বিছানা পাততে লাগল সে। পুরন্দরবাবুও সাহায্য করতে লাগলেন। লোকটার উপর আর রাগ হচ্ছিল না, তার ভীত ত্রস্তভাব দেখে করুণাই হচ্ছিল বরং।

"গ্লাসে যে মদটুকু ঢেলেছেন, খেয়ে ফেলুন সেটা। খেয়ে শুয়ে পড়ুন—আদেশের ভঙ্গীতে বললেন পুরন্দরবাবু।

"মদ আপনিই আনতে দিয়েছিলেন, না ?"

"হাঁ···আপনি যে আর আনিয়ে দেবেন না তা বুঝেছিলাম আগেই—"

"বুঝে ভালই করেছিলেন। আর একটা কথাও শুনুন, আপনার কোনরকম মাতলামি আর সহ্য করব না আমি। কালকের মতো যে বলবেন—চুমু খাব—সে সব আর চলবে না, বুঝলেন ?"

"বুঝেছি, ওসব কি আর বারবার হয়"—হঠাৎ ফিক করে' হেসে ফেললে' সে। হাসিটা পুরন্দরবাবু দেখতে পেলেন না। তিনি ঘরের চতুর্দিকে পরিক্রমণ সুরু করেছিলেন। উত্তরটা শুনে হঠাৎ থেমে গেলেন এবং যুগলের সামনে এসে গম্ভীরভাবে বললেন—"সরলভাবে ব্যাপারটা খুলে বলুন না সব। আপনাকে তো চিনি আমি—লোক তো আপনি খারাপ নন—ভুলপথে চলছেন কেন এ ভাবে ? সরলভাবে সমস্ত কথা অকপটে খুলে বলুন ; আমি কথা দিচ্ছি, আমাকে যা জিগ্যেস করবেন আমিও অকপটে তার উত্তর দেব।"

যুগল নীরবে সমস্ত দন্তগুলি বিকশিত করে' তাঁর দিকে চেয়ে রইল। পুরন্দরবাবুর মাথার শিরগুলো দপ দপ করে' উঠল আবার।

"ও কি!—চীৎকার করে' উঠলেন তিনি প্রায়—"ওরকম করে'

চেয়ে আছেন কেন! কি দরকার এ রকম লুকোচুরির? আমি কিছু বুঝতে পারছি না ভাবছেন? শুনুন, খুলে বলুন সব। আমি কথা দিচ্ছি—ওয়ার্ড অব অনার—আপনি যা জিগ্যেস করবেন আপনার প্রতিটি প্রশ্নের স্পষ্ট উত্তর পাবেন আমার কাছে। অদ্ভুত আজগুবি—যা খুশি জিগ্যেস করুন—যা খুশী। আমার যে কি হচ্ছে তা যদি বুঝতেন তাহলে এ রকম করতেন না কক্খনো। কি জানতে চান বলুন?"

যুগল পালিত ধীরে ধীরে এগিয়ে এল তার দিকে।

"এতই যখন প্রসন্ন হচ্ছেন তাহলে একটা কথার জবাব দিন দিকি। কাল রাত্রে যে বললেন—নিরীহ স্বামী—তার অর্থটা কি?"

পুরন্দরবাবু আবার পরিক্রমণ সুরু করলেন।

"রাগ করলেন? রাগ করবেন না। ওই কথাটার মানে জানবার ভারী কৌতূহল হচ্ছে—অত্যন্ত। সত্যিকথা বলতে কি—ওইটে জানবার জন্যেই বিশেষ করে' আমি আজ…দেখুন সব কথা গুছিয়ে বলবার ক্ষমতা আমার নেই। বেফাঁস যদি কিছু বলে বসি মাপ করবেন। জুলুমবাজ মানেই বা কি! পূর্ণ গাঙ্গুলী কোন টাইপ?

জুলুমবাজ স্বামী পূর্ণ গাঙ্গুলীর খাবারে বিষ মেশাত কিম্বা তার বুকে ছুরি বসাত—তার পশ্চাদ্গমন করত না, আপনি যেমন করলেন আজ। আচ্ছা ওই গুণ্ডাটার পিছু পিছু গেলেন কেন! কোন মতলব ছিল না কি? ছি, ছি, এ কি জঘন্য প্রবৃত্তি আপনার—

ক্রোধে আত্মহারা হয়ে বলে ফেললেন পুরন্দরবাবু।

"হ্যাঁ, যাওয়াটা উচিত হয় নি, তা ঠিক। কিন্তু আপনি বড় বেশী চটেছেন দেখছি—"

"এমন করে' বেড়ানো কি পুরুষমানুষের সাজে? নিজের দুঃখের কাহিনী বিনিয়ে বিনিয়ে চারদিকে বলে' বেড়ানো, একই কথা ঘ্যানঘ্যান করে' বারবার বলা আর তাই নিয়ে লোকের গায়ে পড়ে' নানা রকম চ'

করা—এসব কি ব্যাটাছেলের কাজ? আপনি গলায় দড়ি দিতে গিয়েছিলেন না কি?"

"মন খেপে অনেক রকম করে থাকি—কি করেছিনুম মনে নেই। আচ্ছা, কারও খাবারে বিষ মেশানোটা কি ঠিক? ছুরি মারাটাও কি খুব পৌরুষের লক্ষণ? কি জানি! দেখুন পুরন্দরবাবু, একটা কথা আপনার মনে রাখা উচিত। আমি মোটা মাইনের চাকরি করি, বিষয় আশয়ও আছে কিছু, বিয়েও করতে পারি আমি আবার।"

"তার চেয়ে চুলোয় যাওয়া ভাল নয়?"

"তা-ও বটে। একটা গল্প শুনবেন? আজ গাড়িতে যেতে যেতে গল্পটা মনে পড়ল, তখনি আপনাকে বলব ভেবেছিলাম। আপনি এখুনি লোকের গায়ে পড়ার কথা বলছিলেন না?—অশোক সেনকে মনে আছে আপনার? আপনি যখন বর্দ্ধমানে ছিলেন তখন সেও আসতো আমাদের বাড়ীতে প্রায়। তার এক ছোট ভাই ছিল—সে ছোকরাও খুব চালিয়াৎ—সেও গভর্ণমেণ্টের চাকরি করত। হঠাৎ সে এক বড় অফিসারের সঙ্গে ঝগড়া করে' বসল। বড় অফিসারটি বেশ জাঁদরেল গোছের ব্যাচিলার ছিলেন। তিনি কি করলেন জানেন?—তিনি একদিন এক সভায় ভদ্রমহিলা ও ভদ্রলোকদের সামনে অশোককে অপমান করে' বসলেন, সেখানে অশোকের হবু-স্ত্রী সবিতাও ছিল। শুধু তাই করেই ক্ষান্ত হলেন না; সবিতার বাপের কাছে গিয়ে সবিতাকে বিয়ে করতে চাইলেন—এবং যেহেতু তিনি অশোকের চেয়ে ঢের উঁচুদরের অফিসার, সবিতার বাপ মা এমন কি সবিতা নিজে পর্য্যন্ত অশোককে ত্যাগ করে' তাঁকে বরণ করতে রাজী হয়ে গেলেন। অথচ আমরা শুনেছিলাম সবিতা না কি প্রেমে পড়েছে অশোকের! আর অশোক কি করলে জানেন? সে সেই বিয়েতে বরযাত্রী গেল, তারপর, মানে বিয়ের পর একদিন খুন চেপে গেল তার—অফিসারটার পেটে ছুরি বসিয়ে দিলে সে

হঠাৎ। বসিয়ে দিয়েই কিন্তু হাহাকার করে উঠল—আঃ এ কি করলাম। কেঁদেই ফেললে। লোকের এমন কি [illegible] গায়ে পড়ে' বলে বেড়াতে লাগল ক্রমাগত—ছি ছি একি করে ফেললাম! ছি—ছি—ছি—খুব দেখালে একচোট অশোক। অফিসারটী অবশ্য মরল না, বেঁচে গেল শেষ পর্যন্ত, ছুরিটা ভাল করে' ঢোকেনি!"

"আমাকে এ গল্প বলার অর্থ তো বুঝতে পারছি না" পুরন্দরবাবু ভ্রূ-কুঞ্চিত করে' বললেন।

"আপনার কথাতেই মনে পড়ল গল্পটা। আপনার টাইপের সঙ্গে ঠিক মিলল কি? এ লোকটা ছুরিও মারলে, আর ঢং করে' লোকের গায়ে পড়ে' পড়ে' হাহাকারও করে' বেড়াল। শেষটা ভুলেছিল কিন্তু ঠিক—অ্যাঁ, কি বলেন আপনি!"

"আকার-ইঙ্গিতে আপনি কি বলতে চান?" ধৈর্যচ্যুতি ঘটল পুরন্দরবাবুর। চীৎকার করে' উঠলেন তিনি—"আপনি কি ভেবেছেন আমি ভয় পেয়ে যাব! একটা শিশুকে যন্ত্রণা দিচ্ছেন আমাকে ভয় খাওয়াবার জন্যে, পাজি নচ্ছার হারামজাদা কোথাকার—"

"কি বললেন?"

"হারামজাদা হারামজাদা, হারামজাদা—"

যুগলের ঠোঁট দুটো কেঁপে উঠল।

"আপনি, আপনি পুরন্দরবাবু—হারামজাদা বলছেন আমাকে!"

পুরন্দরবাবু আত্মস্থ হলেন। বুঝলেন যে বড্ড বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে।

"মাপ করুন আমাকে, রাগ সামলাতে পারি নি। আপনি এমন বাঁকা চোরা পথে চলেছেন কেন! যা বলবেন, বলুন না সোজাসুজি—"

"ক্ষমা চাইলেন তাহলে—"

"হ্যাঁ নিশ্চয়, শুধু এর জন্য নয় সমস্তর জন্য ক্ষমা চাইছি। [illegible] চুকে বুকে যাক।"

"ও—মানে—"

"আর মানে টানে নয়, মদটুকু শেষ করে' শুয়ে পড়ুন এবার।"

"ও মদটুকু…" যুগল ক্ষণকাল কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ল, তারপর চোঁ চোঁ করে' খেয়ে ফেলল মদটা। খানিকটা জামায় পড়ে গেল। হাত কাঁপছিল তার। সসম্ভ্রমে গ্লাসটা টেবিলের উপর রেখে শুতে গেল সে। কামিজটা খুলে ফেলল। তারপর একটা জুতো খুলে হঠাৎ সে বললে—"এখানে রাতটা কাটানো কি ভাল হচ্ছে ?"

পুরন্দরবাবু আবার পরিক্রমণ সুরু করেছিলেন, ঘাড় না ফিরিয়েই তিনি উত্তর দিলেন—"খুব ভাল হচ্ছে।"

যুগল শুয়ে পড়ল। মিনিট পনের পরে পুরন্দরবাবুও আলো নিবিয়ে শুলেন। একটা দুশ্চিন্তা নিয়ে শুয়ে পড়লেন তিনি। অপ্রত্যাশিতভাবে নূতন যে কাণ্ডটা ঘটল তাতে সমস্ত ব্যাপারটা আরও জটিল হয়ে পড়ল তো, মনে মনে লজ্জিত হয়ে পড়েছিলেন তিনি। নিজের অক্ষমতা যেন প্রকট হয়ে পড়ছিল নিজের কাছেই। একটা খস খস শব্দ শুনে হঠাৎ তন্দ্রাটা ভেঙে গেল তাঁর। ঘাড় ফিরিয়ে যুগলের বিছানার দিকে চেয়ে দেখলেন। অন্ধকার ঘর, তবু কিন্তু পুরন্দরবাবুর মনে হল যুগল বিছানায় উঠে বসেছে।

"কি হ'ল"—পুরন্দরবাবু জিগ্যেস করলেন।

"ভূত"—চুপি চুপি যুগল বললে।

"ভূত! কোথা ?"

'ওই যে পাশের ঘরে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে দেখতে পাচ্ছি।"

"কার ভূত ?"

"অপর্ণার।"

পুরন্দরবাবু উঠে বসলেন তাড়াতাড়ি। পাশের ঘরের দরজাটা খোলা ছিল, চেয়ে দেখলেন সেদিকে কিছুই চোখে পড়ল না তাঁর।

"কই, কিছু দেখতে পাচ্ছি না তো! ভূত নয়, হুইস্কি—শুয়ে পড়ুন আপনি।"

পুরন্দরবাবু শুয়ে আপদ মস্তক চাদর দিয়ে ঢাকা দিলেন।

যুগলও শুয়ে পড়ল, আর কোন উচ্চবাচ্য না করে'।

"ইতিপূর্ব্বে আর কখনও ভূত দেখেছেন আপনি?" মিনিট দশেক পরে হঠাৎ প্রশ্ন করলেন পুরন্দরবাবু।

"একবার দেখেছি বোধ হয়" ক্ষীণকণ্ঠে যুগল উত্তর দিল।

নীরবতা ঘনিয়ে এল আবার।

পুরন্দরবাবু ঘুমিয়ে পড়েছিলেন কি না কে জানে, কিন্তু ঘণ্টাখানেক পরে হঠাৎ আবার পাশ ফিরলেন তিনি···কোন খস খস শব্দ শুনেই তাঁর ঘুম ভেঙে গেল না কি? নির্ণয় করতে পারলেন না ঠিক—কিন্তু স্পষ্ট অনুভব করতে লাগলেন তাঁর বিছানার কাছে ঘরের মাঝখানে শাদা কি একটা যেন দাঁড়িয়ে রয়েছে। বিছানায় উঠে বসে পুরো একটি মিনিট চেয়ে রইলেন তিনি সেদিকে।

"যুগলবাবু না কি"—স্খলিত কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন।

অন্ধকারে নিজের কণ্ঠস্বরই অদ্ভুত শোনাল। কোন উত্তর নেই। কিন্তু কেউ যে একজন দাঁড়িয়ে আছে তাতেও সন্দেহ নেই কোন।

"কে—যুগলবাবু না কি"—আর একবার, আর একটু জোরে জিগ্যেস করলেন। এত জোরে যে যুগল ঘুমিয়ে থাকলেও জেগে উঠে সাড়া দেওয়া উচিত ছিল তার। কিন্তু এবারও কোন উত্তর এল না, কিন্তু মনে হল শাদা অস্পষ্ট মূর্ত্তিটা ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে তাঁর দিকে। এর পরই যা হল তা অদ্ভুত, পুরন্দরবাবুর মাথার মধ্যে একটা বিস্ফোরণ ঘটে গেল যেন—উন্মাদের মতো ভীষণ তারস্বরে চীৎকার করে উঠলেন তিনি সমস্ত শালীনতা বিস্মৃত হয়ে—

"ব্যাটাচ্ছেলে মাতাল আমাকে ভয় দেখাবে ভেবেছ। আমি দেওয়ালের

দিকে মুখ ফিরিয়ে আপাদমস্তক ঢেকে সমস্ত রাত শুয়ে থাকব—একবারও ফিরব না তোমার দিকে···দাঁড়িয়ে থাক সমস্ত রাত···থোড়াই কেয়ার করি আমি···ব্যাটা মাতাল কোথাকার—থুঃ—থুঃ—থুঃ—"

উন্মাদের মতো থুতু ফেলতে লাগলেন তার দিকে। তারপর বিছানায় শুয়ে দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে আপাদ মস্তক মুড়ি দিয়ে অনড় হয়ে রইলেন। আবার নীরবতা ঘনিয়ে এল চারদিকে। মূর্তিটা এগিয়ে আসছে, না এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে তা বুঝতে পারছিলেন না, যদিও কিন্তু বুকের ভিতরটা ধড়াস্ ধড়াস্ করছিল। পুরো পাঁচটি মিনিট কেটে গেল। তারপর বিছানার ঠিক পাশেই শোনা গেল যুগলের বিনীত মিনতিপূর্ণ কণ্ঠস্বর—"আমি দেশলাইটা খোঁজবার জন্যে উঠেছি। টেবিলে নেই, ভাবলাম আপনার বিছানার তলায় যদি থাকে।"

"আমি যে এত চেঁচালাম আপনি একটি কথা বললেন না—এর মানে কি" একটু পরে প্রশ্ন করলেন পুরন্দরবাবু।

"আপনি এত জোরে চীৎকার করে' উঠলেন যে, আমি ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম।"

"আপনার বিছানার পাশেই কুলুঙ্গিতে দেশলাই আছে। আলো জ্বালবেন ?

"না, সিগারেট ধরাব একটা। আলোর দরকার নেই। ছি, ছি, আপনার ঘুমটা ভাঙিয়ে দিলুম। সরি—"

কুলুঙ্গিটার দিকে ধীরে ধীরে সরে' গেল সে।

পুরন্দরবাবুও আর কথা কইলেন না। তখনও দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে শুয়েছিলেন তিনি এবং সমস্ত রাত তেমনি ভাবেই শুয়ে রইলেন। যুগলকে বলেছিলেম বলেই যে শুয়ে রইলেন, না অন্য কোন কারণ ছিল, তা নিজেও বুঝতে পারছিলেন না। তাঁর মানসিক অবস্থা এমন হয়েছিল যে, যেন বিকারের ঘোরে আচ্ছন্নের মতো পড়ে রইলেন, কখন যে ঘুমিয়ে

পড়লেন তা জানতেও পারলেন না। সকালে যখন ঘুম ভাঙল তখন ন'টা বেজে গেছে। তাড়াতাড়ি উঠে বসলেন বিছানায়, যেন কে ঠেলে তুলে দিলে তাঁকে। উঠে দেখলেন যুগল পালিত নেই—খালি বিছানা পড়ে আছে। "এ আমি আগেই জানতাম"—বলে' কপালে হাত দিয়ে বসে রইলেন তিনি।

১০

ডাক্তারবাবু যা ভয় করছিলেন তাই হল শেষকালে। পাপিয়ার অবস্থা দেখতে দেখতে খারাপ হয়ে গেল, হঠাৎ এমনটা যে হবে তা নীলিমা দেবী বা পুরন্দরবাবু একটুও বুঝতে পারেন নি আগের দিন। পুরন্দরবাবু সকালে এসে দেখলেন জ্ঞান আছে, এমন কি তাঁকে দেখে সে যেন হাত দুটি তাঁর দিকে বাড়িয়েও দিলে তাঁর মনে হ'ল। সত্যি বাড়িয়ে দিয়েছিল, না নিজেকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে পুরন্দরবাবু অজ্ঞাতসারে এটা কল্পনা করেছিলেন তা অবশ্য নিজেও তিনি ঠিক করতে পারছিলেন না পরে। সন্ধ্যার দিকে ক্রমশ সে অজ্ঞান হয়ে পড়ল। শেষ পর্যন্ত অজ্ঞানই ছিল। ভবেশবাবুর বাড়িতে আসবার ঠিক দশদিন পরে মারা গেল সে।

পুরন্দরবাবু এত বিচলিত হয়ে পড়লেন যে তাঁর জন্যে ভবেশবাবুদের চিন্তা হল। পাপিয়ার শেষ সময়টা তিনি তাদের বাড়িতেই ছিলেন দিনরাত। ঘরের কোণে চুপ করে' বসে থাকতেন অসাড় হয়ে। কারও সঙ্গে কথা কইতে প্রবৃত্তি হত না, নীলিমা দেবী নানা কথা পেড়ে তাঁর মনটা অন্যদিকে নিয়ে যাবার চেষ্টা করতেন, কিন্তু কোন ফল হত না, কোনও উত্তরই দিতেন না তিনি। পাপিয়ার জন্যে যে পুরন্দরবাবু এতটা ভেঙে পড়বেন তা ভাবতেই পারে নি কেউ। বাড়ির ছেলেমেয়েরা এসে নানাভাবে ভোলাতে চেষ্টা করত, তাদের সঙ্গেই যা' দু'একবার হেসে কথা কইতেন তিনি। কিন্তু প্রায়ই পা টিপে টিপে উঠে যেতেন পাপিয়ার বিছানার পাশে। চুপ করে' দাঁড়িয়ে থাকতেন। মাঝে-মাঝে মনে হত পাপিয়া যেন চিনতে পারছে তাঁকে। পাপিয়া যে বাঁচবে এ আশা তিনি করেন নি, কেউ করে নি।

কিন্তু পাপিয়াকে ফেলে রেখে কিছুতেই চলে যেতে পারতেন না। পাশের ঘরটায় বসে থাকতেন চুপ করে'।

হঠাৎ একদিন কোলকাতায় চলে গেলেন। সমস্ত বড় বড় ডাক্তারদের ডেকে নিয়ে এলেন। ডাক্তারদের আলোচনা সভা বসল। পুরন্দরবাবু পাগলের মতো রোজ আসতে অনুরোধ করতে লাগলেন সবাইকে। আর একবার এবং সেই শেষবার এসেছিলেন তাঁরা, পাপিয়ার মৃত্যুর আগের দিন। নীলিমা দেবী বললেন—ওর বাবাকে একবার খবর দেওয়া দরকার। কারণ, যদি কিছু হয়—শ্মশানে নিয়ে যাওয়া যাবে না তিনি না এলে। পুরন্দরবাবু আমতা আমতা করে' বললেন—"আচ্ছা, চিঠি লিখছি একটা। কিন্তু চিঠি লিখলে কি আসবে?" ভবেশবাবু এ কথা শুনে বললেন "বলেন তো পুলিশ দিয়ে ধরিয়ে আনাবার ব্যবস্থা করি, অনায়াসেই করা যায় তা। অবশ্য আপনার যদি আপত্তি না থাকে।" পুরন্দরবাবু চিঠিই লিখলেন শেষে একটা এবং সেটা নিয়ে নিজে চলে গেলেন তার বাসায়। যুগল বাসায় ছিল না, থাকবে না তা অনুমানই করেছিলেন - পুরন্দরবাবু চিঠিখানা রেখে এলেন বাড়িওলার কাছে। তিনি যন্ত্রের মতো কর্তব্য করে যাচ্ছিলেন যেন।

অবশেষে পাপিয়া মারা গেল। সন্ধ্যাবেলা ধুনা আগুন জ্বালছিল তখন। একটা রূঢ় আঘাতে তাঁর আচ্ছন্নভাবটা চুরমার হয়ে গেল—হঠাৎ যেন ঘুম থেকে জেগে উঠলেন তিনি। নীলিমা দেবী সুন্দর একটি শাড়ি পরিয়ে ফুল দিয়ে চমৎকার করে' সাজিয়ে দিলেন পাপিয়াকে। পুরন্দরবাবুর চোখ দুটো জ্বলে উঠল হঠাৎ—দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করে' বলে' উঠলেন—"শূওরটাকে যেমন করে' পারি ধরে' আনব আমি।" কারও বারণ না শুনে তৎক্ষণাৎ কোলকাতার দিকে ছুটলেন।

যুগলকে কোথায় পাওয়া যাবে তার আভাস তিনি একটা পেয়েছিলেন। যখন ডাক্তার ডাকতে গিয়েছিলেন তখন যুগলকেও খুঁজেছিলেন তিনি। কারণ তাঁর আশা ছিল যে যুগল এলে যুগলকে দেখলে পাপিয়া হয়তো

ভাল হয়ে যাবে। সুতরাং যুগলকে খুঁজেছিলেন তিনি প্রাণপণে। যুগল বাসা বদলায়নি, কিন্তু বাসায় গেলে পাওয়া যেত না তাকে। বাড়িওলা প্রতিবারই এক কথা বলত—"গত তিন দিন তিনি বাসাতে ফেরেন নি। আজ যদি ফেরেনও মাতাল হয়েই ফিরবেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই, আর ঘন্টাখানেক থেকেই বেরিয়ে যাবেন আবার। একেবারে গোল্লায় গেল মশাই, কি আর বলব।"

চাকরটা চুপি চুপি বললে তিনি সোনাগাছিতে পড়ে থাকেন। ঠিকানা চান তো জোগাড় করে' দিতে পারি আমি।

কোলকাতায় এসেই পুরন্দরবাবু সোনাগাছির ঠিকানাটা জোগাড় করলেন। সেখানে গিয়ে যা দেখলেন তাতে তাঁর চক্ষুস্থির হয়ে গেল। ডাকিনীর মতো দুটো মাগী যুগলকে টানতে টানতে নিয়ে চলেছে রাস্তা দিয়ে, যুগল এত মদ খেয়েছে যে আর দাঁড়াতে পারছে না, আর তাদের পিছনে পিছনে বলিষ্ঠকায় ভীষণ দর্শন একটা লোক অশ্রাব্য ভাষায় গাল দিচ্ছে তাকে। শুধু গাল দিচ্ছে নয়, টাকা না দিলে জুতিয়ে লম্বা করে দেবে বলে' ভয়ও দেখাচ্ছে। পুরন্দরবাবুকে দেখেই যুগল আর্তকণ্ঠে বলে' উঠল—গুণ্ডার হাত থেকে বাঁচান আমাকে।

পুরন্দরবাবুকে দেখেই গুণ্ডাটা সরে' পড়ল, যুগল তার দিকে মুষ্টি আস্ফালন করে' চীৎকার করে' উঠল বিজয়-উল্লাসে। পুরন্দরবাবু সোজা গিয়ে যুগলের কোটের কলারটা ধরে' ঝাঁকাতে লাগলেন তাকে, ক্রমাগত ঝাঁকাতে লাগলেন, তাঁর যেন খুন চেপে গিয়েছিল। যুগলের চীৎকার থেমে গেল সঙ্গে সঙ্গে, আতঙ্ক ফুটে উঠল চোখের দৃষ্টিতে, দাঁতে দাঁতে ঠক ঠক শব্দ হতে লাগল। ফুটপাথের উপর বসে পড়ল সে। একটা মাগী তাড়াতাড়ি ঝুঁকে ধরলে তাকে। "পাপিয়া মারা গেছে," পুরন্দরবাবু বললেন অবশেষে। ফ্যাল ফ্যাল করে' চেয়ে রইল যুগল। মনে হল যেন বুঝল কথাটা, চিবুকটা ঠোঁট দুটো কেঁপে উঠল একবার।

"মারা গেছে···" অদ্ভুত স্বরে ফিস ফিস করে' বললে সে। সমস্ত মুখখানা কেমন যেন কুঁচকে গেল, একটা দন্ত-সর্ব্বস্ব হাসি ফুটে উঠল মুখে। খানিকক্ষণ বসে' রইল, তারপর মাগীটার কাঁধের উপর ভর দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে চলতে সুরু করল সোজা—যেন পুরন্দরবাবুর সঙ্গে দেখা হয় নি।

"যাচ্ছেন কোথা, আপনি না গেলে যে তার সংকার হবে না এটা মাথায় ঢুকছে না, খাতলামির একটা সীমা থাকা উচিত।"

"আমি না গেলে সংকার হবে না কেন"—ঘাড় ফিরিয়ে যুগল বলল।

"আপনি আইনত তার বাবা।"

"না আমি নই, সেই পুলিশ অফিসারটি। মনে নেই আপনার তাকে? আপনি চলে আসবার ঠিক আগে যে এসেছিল—সেই যে বিলেত ফেরং ছোকরা।"

"তার মানে"—চীৎকার করে' উঠলেন পুরন্দরবাবু, সমস্ত বুকটা মুচড়ে উঠল যেন—"কি বললেন?"

"ঠিকই বলেছি, সেই ওর বাবা। সংকারের জন্যে তার খোঁজ করুন গিয়ে।"

"মিছে কথা! আমার উপর শোধ তোলবার জন্যে এই মিছে কথাটা তৈরি করেছেন আপনি। পাষণ্ড কোথকার—"

যুগলকে মারবার জন্যে তিনি ঘুঁসি তুললেন, হয় তো মেরেই ফেলতেন তাকে, কিন্তু পারলেন না—মাগী দুটো চীৎকার করে উঠল তার-স্বরে। যুগল কিন্তু এক-পা নড়ল না। খানিকক্ষণ নির্নিমেষে তাঁর দিকে চেয়ে থেকে সঙ্গিনী দুটির কাঁধে ভর দিয়ে টলতে টলতে অদৃশ্য হয়ে গেল গলির মোড়ে। পুরন্দরবাবু আর তার অনুসরণ করলেন না। করতে প্রবৃত্তি হল না।

তার পরদিন একটি ভদ্রগোছের গভর্ণমেন্ট ক্লার্ক ভবেশবাবুদের বাড়িতে

নীলিমা দেবীর হাতে একটি খামের চিঠি দিলেন। যুগল পালিতের চিঠি। খামের ভিতর পাঁচশ টাকার একটা চেক এবং পালিতার শবদাহ করবার আইন সঙ্গত অনুমতি ছিল। ভবেশবাবু অবশ্য শবদাহের ব্যবস্থা আগেই করেছিলেন, সেজন্য অসংখ্য ধন্যবাদও জানিয়েছিল যুগল। লিখেছিলেন—"আপনার স্নেহের ঋণ শোধ করবার স্পর্দ্ধা আমার নেই। তার অসুখের জন্য এবং শবদাহ প্রভৃতির জন্য যে খরচ সেই বাবদ সামান্য কিছু পাঠালাম। যদি কিছু বাঁচে কোন সৎকার্যে তা খরচ করে' দেবেন। আমার শরীর খুব খারাপ বলে' যেতে পারলাম না। এজন্য ক্ষমা করবেন। ভগবান আপনাদের মঙ্গল করুন।"

যে ভদ্রলোক চিঠি এনেছিলেন তিনি আর বিশেষ কিছু বলতে পারলেন না। যুগলবাবুর অনুরোধে তিনি চিঠিটা বহন করে' এনেছেন শুধু বোঝা গেল। টাকা পাঠিয়ে দেওয়াতে ভবেশবাবুরা ক্ষুণ্ণ হলেন খুব। চেকটা ফেরত দিচ্ছিলেন কিন্তু নীলিমা দেবী বল্লেন—কাঙালী ভোজন করানো হোক। শেষে তাই ঠিক হল।

সব শেষ হয়ে যাবার পর পুরন্দরবাবু যাদবপুর থেকে চলে এলেন। সমস্ত দিন রাস্তায় ঘুরে বেড়াতেন অন্যমনস্কভাবে, গাড়ীচাপা পড়তে পড়তে বেঁচে গেলেন একদিন। কখনও বা নিজের বাসায় চুপ চাপ শুয়ে থাকতেন দিনের পর দিন, কোথাও বেরুতেন না, দৈনন্দিন কর্তব্য করতেন না কিছু। ভবেশবাবুরা মাঝে মাঝে আসতেন, খাবার জন্যে নিমন্ত্রণ করে' যেতেন, তিনি যাব বলে' প্রতিশ্রুতি দিতেন—কিন্তু সে কথা আর মনে থাকত না। নীলিমা দেবী নিজে এসেছিলেন কয়েকবার, কিন্তু দেখা পান নি। তাঁর উকীলও তাঁর সঙ্গে দেখা করবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন, তাঁর মকোদ্দমার বেশ সুরাহা হয়েছে, শত্রুপক্ষ মিটমাট করতে চাইছে, পুরন্দরবাবুর সম্মতি পেলেই ব্যাপারটা নির্ব্বিঘ্নে চেপে যায়, কিন্তু কিছুতেই তাঁর নাগাল পাচ্ছিলেন না তিনি। অবশেষে নাগাল যখন পেলেন তখন তাঁর ঔদাসীন্য

দেখে অবাক হয়ে গেলেন। তাঁর মতো বখেড়াবাজ মক্কেল যে হঠাৎ কি করে' একটা নিষ্ক্রিয় হয়ে যেতে পারে তা ভেবে পেলেন না তিনি।

অসহ্য গরম পড়েছিল, কিন্তু পুরন্দরবাবুর খেয়াল ছিল না কিছু। দার্জিলিং যাবার কথা মনেই ছিল না আর। একটা অব্যক্ত যন্ত্রণা অহরহ ভোগ করছিলেন, তিনি, একটা প্রকাণ্ড ফোড়া যেন পর নিয়ে পেড়ে উঠছিল ক্রমশ। তাকে ভালো করে' জানবার পূর্ব্বেই, তিনি যে এত অল্প সময়ে তাকে ভালোবেসেছিলেন—তা না বুঝেই পাপিয়া জন্মের মতো চলে' গেল—এইটেই তাঁকে কষ্ট দিচ্ছিল সব চেয়ে বেশী। যে আনন্দময় জীবনের সামান্য আভাসমাত্র তিনি পেয়েছিলেন, হঠাৎ তা অন্ধকারে মিলিয়ে গেল চিরকালের মতো। জীবনের একটা অবলম্বন খুঁজে পেয়েছিলেন, হারিয়ে গেল সেটা। চুপ করে' ভাবতেন কেবল বসে'—আমার এই ছন্নছাড়া অপবিত্র জীবনটা পাপিয়াকে ভালবেসে শুদ্ধ করে'—নেব ভেবেছিলাম, সারা জীবনের ক্লেদ আর বিষ অমৃতে রূপান্তরিত হয়ে যেত, ওই পবিত্র নিষ্পাপ জীবনের সংস্পর্শে এসে। তাকে মানুষ করতে পেলে বেঁচে থাকার অর্থ থাকত একটা, আর তাহলে ভগবান আমার সমস্ত দুষ্কৃতিও ক্ষমা করতেন বোধ হয়।"

একদিন ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ শ্মশানে গিয়ে হাজির হলেন। যে জায়গায় তার চিতাটা সাজানো হয়েছিল সেখানে গিয়ে বসলেন খানিকক্ষণ। হেঁট হয়ে চুমু খেলেন। অনেকটা শান্তি পেলেন যেন। সূর্য্য অস্ত যাচ্ছিল, পশ্চিম দিগন্তে মেঘস্তূপে আগুন জ্বলছে, সার বেঁধে পাখী উড়ে চলেছে, অন্ধকার নামছে ধীরে ধীরে। সমস্ত মনটা শান্ত হয়ে গেল অনেকদিন পরে। সমস্ত অন্তর পূর্ণ করে' একটা আশ্বাস জেগে উঠল ধীরে ধীরে। মনে হল—পাপিয়াই বোধ হয় কাছে এসে আশ্বাস দিচ্ছে আমাকে।

শ্মশান থেকে যখন উঠলেন তখন বেশ অন্ধকার হয়েছে। শ্মশানের কাছেই চায়ের দোকান ছিল একটা। তাঁর মনে হল সেই দোকানের

একটা জানলায় যুগল বসে আছে এবং তাঁর দিকে চেয়ে রয়েছে নির্নিমেষে। তিনি সেদিকে আর না চেয়ে চলতেই লাগলেন। কিছুক্ষণ পরে মনে হল কে যেন তাঁর অনুসরণ করছে। ঘাড় ফিরিয়ে দেখলেন যুগল। কিছু বললেন না, দাঁড়িয়ে রইলেন শুধু। কাছাকাছি এসে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে যুগল হাসল একটু। মাতালের হাসি নয়, ভদ্রলোকের হাসি। যুগল সত্যিই মদ খায় নি তখন।

"নমস্কার।"

"নমস্কার।"

১১

ভদ্রভাবে প্রতি-নমস্কার করে' নিজেই বিস্মিত হয়ে গেলেন তিনি। একে দেখে আর রাগ হল না তাঁর। শুধু তাই নয়, একটা নূতন দৃষ্টি নূতন মনোভাব জাগল যেন। যুগল তাঁর মুখের দিকে চেয়ে আর একটু হেসে বললে—

"চমৎকার হাওয়া দিচ্ছে আজ। গরম মোটে নেই।"

"আপনি এখনও যান নি দেখছি"—চলতে চলতে উত্তর দিলেন পুরন্দরবাবু।

"না। একটা না একটা বাধা উপস্থিত হচ্ছে। আমার প্রোমোশন হয়েছে, জানেন, মাইনেও বেড়েছে। পরশু নাগাদ যাচ্ছি নিশ্চয়।"

"প্রোমোশন হয়েছে ?"

"হবে না কেন"—ভ্রূযুগল উত্তোলন করে' যুগল বললে।

"না, তাই জিগ্যেস করছি···"পুরন্দরবাবু ভ্রূকুঞ্চিত করে' আড়চোখে চাইলেন একবার তার দিকে। লক্ষ্য করলেন যুগলের পোষাক পরিচ্ছদ আর আগেকার মতো নেই, বেশ একটু পারিপাট্য দেখা দিয়েছে।

চায়ের দোকানে বসে' কি করছিল ওখানে—পুরন্দরবাবু ভাবছিলেন মনে মনে।

"আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে গিয়ে ভালই হ'ল। একটা শুভসংবাদ আছে।"

"শুভসংবাদ ?"

"আমি আবার বিয়ে করছি।"

"সে কি!"

"দুঃখের পরে সুখ আসে, এই তো জীবন; আমি ভারী খুশী হতাম পুরন্দরবাবু যদি আপনি—কিন্তু না থাক, এখন বোধ হয় ব্যস্ত আছেন আপনি।"

"হ্যাঁ ব্যস্ত আছি, শরীরও ভাল নেই আমার।"

হঠাৎ মনে হল লোকটাকে এড়াতে পারলে যেন বাঁচেন! তার সম্বন্ধে যে নূতন মনোভাব জেগেছিল তা নিমেষে অবলুপ্ত হয়ে গেল।

"আমি ভারী খুশী হতাম যদি…"

কিসে সে খুশী হ'ত তা যুগল বললে না খুলে—পুরন্দরবাবু চুপ করে' রইলেন।

"তাহলে পরে হবে"—তার দিকে না চেয়েই পুরন্দরবাবু উত্তর দিলেন এবং চলতেই লাগলেন। যুগলও সঙ্গে সঙ্গে চলতে লাগল। কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটল।

"আচ্ছা তাহলে নমস্কার, আবার দেখা হবে আশা করি।"

"নমস্কার।"

পুরন্দরবাবু যখন বাড়ি ফিরলেন তখন তাঁর মনের সমস্ত শান্তি নষ্ট হয়ে গেছে। ওই লোকটার সংস্পর্শ কিছুতেই সহ্য করতে পারেন না তিনি। বিছানায় যখন শুতে গেলেন তখনও তাঁর আবার মনে হল—লোকটা শ্মশানের কাছে কি করছিল?

তার পরদিন সকালে উঠে তিনি ঠিক করলেন ভবেশবাবুর ওখানে যাবেন। নিতান্ত কর্তব্যবোধেই ঠিক করলেন, যাবার আন্তরিক ইচ্ছে ছিল না। কারও সহানুভূতি, এমন কি ভবেশবাবুদের সহানুভূতিও, বিরক্তিকর হয়ে উঠেছিল তাঁর পক্ষে। কিন্তু ভবেশবাবুরা একবার এসে তাঁর খোঁজ করেছেন, না গেলে অভদ্রতা হয়। তাঁর কেমন একটু সঙ্কোচ হতে লাগল তবু। চা খাওয়া শেষ করে' যাবেন কি যাবেন না ভাবছেন এমন সময়ে সবিস্ময়ে দেখলেন যুগল পালিত প্রবেশ করছে। পুরন্দরবাবু কল্পনাও করতে

পারেন নি যে লোকটা আবার আসবে। নির্ব্বাক হয়ে চেয়ে রইলেন কি বলবেন ভেবে পেলেন না। যুগল কিন্তু বেশ সপ্রতিভ। হেসে নমস্কার করে' চেয়ার টেনে বসল। যে চেয়ারটায় ইতিপূর্ব্বে বসেছিল ঠিক সেই চেয়ারটাতেই বসল। পুরন্দরবাবুও প্রতি-নমস্কার করে' বসলেন। প্রথম যেদিন যুগল এসেছিল সেইদিনের ছবিটা হঠাৎ স্পষ্ট ফুটে উঠল পুরন্দরবাবুর মনে।

"আপনি আশ্চর্য্য হচ্ছেন ?" পুরন্দরবাবুর মুখের ভাবান্তর লক্ষ্য ক'রে যুগল বলল। যুগলের আচরণে যদিও আপাতদৃষ্টিতে লেশমাত্র জড়তা ছিল না কিন্তু কোনও কারণে তার মনের ভিতর যে একটা তোলপাড় হচ্ছিল তা' সে ঢাকতে পারছিল না। বেশবাসও বিচিত্র করে' এসেছিল। সিল্কের আদ্দির পাঞ্জাবী, কোঁচানো জরি-পাড় শান্তিপুরের ধুতি, জরিদার উড়ুনি, অনামিকায় হীরের আংটি, পায়ে পাম্‌শু, চোখে রিমলেস চশমা, এসেন্সের গন্ধ ভুর ভুর করছে গায়ে। চশমাটা খুব সম্ভবত অলঙ্কারই, কারণ ইতিপূর্ব্বে তার চোখে চশমা ছিল না।

"আশ্চর্য্য হবারই কথা" একটু থেমে থেমে যুগল সুরু করলে আবার— "এমন ভাবে আসাটা প্রত্যাশা করেন নি, বুঝতে পারছি। কিন্তু দেখুন মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কটা অত ঠুনকো হওয়া উচিত কি ? পরস্পরের মধ্যে একটা দৃঢ়তর এবং মহত্তর বন্ধন থাকাটা কি বাঞ্ছনীয় নয় সমস্ত তুচ্ছ মনোমালিন্য সত্ত্বেও ? কি বলেন আপনি" ?

"ভণিতা না করে' যা বলতে এসেছেন তাড়াতাড়ি বলে ফেলুন" ভ্রূকুঞ্চিত করে' পুরন্দরবাবু বললেন।

"তাহলে সংক্ষেপে বলি শুনুন। কালই বলেছি তো আমি আবার বিয়ে করব। এখন আমি আমার ভাবী সহধর্ম্মিণীকে দেখতে যাচ্ছি। তারা বালীগঞ্জে থাকেন। যদি অভয় দেন তো একটা প্রস্তাব করি।"

"কি বলুন" ?

"আপনার সঙ্গে তাদের পরিচয় করিয়ে দিতে চাই এবং এখন যদি আপনি আমার সঙ্গে যেতে পারেন তাহলে কৃতার্থ হই"।

"আপনার সঙ্গে যাব! কোথায়?"

পুরন্দরবাবুর চক্ষুর্দ্বয় বিস্ফারিত হয়ে পড়ল।

"তাদের বাড়ি। মাপ করবেন, আমার মাথার ঠিক নেই, মনের ভাব ঠিক প্রকাশ করতে পারছি না হয় তো, আমার ভয় হচ্ছে আপনি পাছে 'না' বলে' বসেন"।

অতিশয় করুণ দৃষ্টিতে সে চেয়ে রইল পুরন্দরবাবুর মুখের দিকে।

"এখনই আপনার সঙ্গে আপনার ভাবী-সহধর্ম্মিণীকে দেখতে যাব—এই বলছেন আপনি?"

পুরন্দরবাবু ভ্রুকুঞ্চিত করে' সবিস্ময়ে চেয়ে রইলেন যুগলের দিকে। নিজের চক্ষু কর্ণকে বিশ্বাস করতে পারছিলেন না তিনি।

"হ্যাঁ" সলজ্জ কণ্ঠে যুগল বললে—"রাগ করবেন না, পুরন্দরবাবু। পরিহাস করছি না আমি, অনুনয় করছি, সত্যিই বলছি কৃতার্থ হব। আমার আশা আছে আমার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ উপেক্ষা করতে পারবেন না আপনি"।

"দেখুন, প্রথমত জিনিসটা অত্যন্ত অহেতুক"।

পুরন্দরবাবু অধীর ভাবে প্রতিবাদ করলেন।

"আমার প্রবল আগ্রহ, আর কিছু নয়" যুগল সানুনয়ে সুরু করল আবার—

"তাছাড়া কারণও আছে। আপনার কাছে গোপন করব না কিছু—কিন্তু সেটা ঠিক এখন, এই মুহূর্ত্তে বলতে চাই না। এখন আমার অনুরোধটুকু রাখুন শুধু..."

"কিন্তু আপনি নিজেই কি বুঝতে পারছেন না যে ব্যাপারটা কতদূর অশোভন?"

পুরন্দরবাবু দাঁড়িয়ে উঠলেন। যুগলও দাঁড়িয়ে উঠল সঙ্গে সঙ্গে।

"কিছু অশোভন নয়। আমি আপনাকে আমার একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু

হিসাবে নিয়ে যাব—এতে অশোভন কি আছে! তাছাড়া আপনি তাদের চেনেনও। বালীগঞ্জের বিশ্বস্তর বোস—নামজাদা উকীল—কর্পোরেশনের মেম্বার—"

"তাই না কি!"

একমাস আগে এঁকে ধরবার জন্যই তিনি কি চেষ্টাটাই না করেছেন নিজের মকোর্দ্দমার সুবিধে হবে বলে'। কিছুতেই নাগাল পান নি। তাঁর বিরুদ্ধপক্ষের দিকে ছিলেন ইনি বরাবর।

"হ্যাঁ হ্যাঁ সেই লোক" পুরন্দরবাবুর মুখভাব লক্ষ্য করে' সুগম বলে উঠল —"সেই বার পাশে পাশে আপনি রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে গল্প করছিলেন আর আমি দাঁড়িয়ে আপনাদের দেখছিলাম. আপনার কথা শেষ হয়ে গেলে আমিও তাঁকে ধরব ভেবেছিলাম সেদিন। কুড়ি বছর আগে আমরা এক অফিসে চাকরি করতাম কি না। সেদিন অবশ্য যখন আপনার কথা শেষ হবার পর তাঁকে ধরব ভাবছিলাম—তখন বিয়ের কথা ভাবিই নি। হঠাৎ সাতদিন আগে কথাটা মনে হল!"

"কিন্তু, কি মুশকিল, তাঁরা যে ভদ্রলোক"—কথাটার সম্যক অর্থ হৃদয়ঙ্গম না করেই পুরন্দরবাবু সবিস্ময়ে বলে' ফেললেন।

"হলই বা" সুগমের চোখে শাণিত দৃষ্টি ফুটে উঠল একটা।

"না না মানে আমি বলছি যে যখন আমি তাদের বাড়ি গিয়েছিলাম তারা—"

"সব মনে আছে তাদের। আপনার কথা বলছিলেন, আপনাকে শ্রদ্ধা করেন তিনি। কিন্তু আপনি বাড়ির সবাইকে দেখেন নি, তারা এত—"

"তিন মাস যেতে না যেতেই বিয়ে করবেন আপনি!"

"না, বিয়ে অত তাড়াতাড়ি হবে না। তার এখনও বছর খানেক বাকী। না, না আপনি যা ভাবছেন তা নয়, তাঁরা আমাকে অনেকদিন থেকে চেনেন। আমার স্ত্রীকেও চিনতেন। সব জানেন আমার। তাছাড়া সম্পত্তি আছে

আমার, চাকরিও পেয়েছি ভাল একটা, মাইনেও বাড়ল—আপত্তি নেই কিছু তাদের"।

"তাঁর মেয়ের সঙ্গে ?"

"সে সব বলব এখন" এঁকে বেঁকে বিগলিত হয়ে পড়ল যেন যুগল "আগে একটা সিগারেট ধরাই। আজই দেখবেন তাকে। একটা কথা কি জানেন, বিশ্বম্ভর বাবু রোজগার করছেন খুব কিন্তু রাখতে পারেন নি তেমন কিছু। আজকালকার খরচ তো জানেনই, তাছাড়া বালীগঞ্জে বাড়ি করতে গিয়ে জমানো টাকাটা খরচ করে' ফেলেছেন সব। বিরাট পরিবার, মেয়েই আটটি—ছেলে একটিমাত্র, সে ছেলেও মানুষ হয়নি এখনও। কাল যদি চোখ বোজেন দু'বেলা অন্ন জুটবে কিনা সন্দেহ। আটটা মেয়ে—তাদের কাপড় চোপড়ের খরচেই তো ফতুর হবার কথা—তাদের পড়িয়েছেন প্রত্যেককে। এদের মধ্যে পাঁচটি বেশ প্রাপ্তযৌবনা, বড়টির বয়স চব্বিশ পঁচিশ হবে, খাসা মেয়ে, আলাপ করে' দেখবেন। ষষ্ঠটির বয়স বছর পনেরো হবে—স্কুলে পড়ে। আগের পাঁচটির বিয়ে হয় নি কারও, আজকাল, মেয়ের বিয়ে মানে বুঝতে পারেন তো, কি ব্যাপার! নানা জায়গায় পাত্র খুঁজছিলেন ভদ্রলোক এমন সময় আমি গিয়ে হাজির। আমার মতো পাত্র একটিও জোটে নি ইতিপূর্বে। জানাশোনা ঘর, লেখাপড়া জানে, খেতে পরতে পাবে এরকম ছেলে খুব সুলভ তো নয়—আত্মপ্রশংসা করছি না—কিন্তু আমার মতো পাত্র বিনাপণে পাওয়া অসম্ভব হবে ওঁর পক্ষে"।

সোচ্ছ্বাসে বলে চলেছিল যুগল।

"আপনি বড়টিকে বিয়ে করেছেন ?"

"না মানে, বড়টিকে না। আমি ষষ্ঠটি মানে যেটি স্কুলে পড়ছে তার কথাই বলেছি"।

"সে কি !" হেসে ফেললেন পুরন্দরবাবু, "তার বয়স মোটে পনেরো বলছেন !"

"হ্যাঁ, এখন পনরো, আর ন'মাস পরেই ষোলয় পড়বে। তাতে হয়েছে কি! এখন বিয়ে করাটা দৃষ্টিকটু হবে অবশ্য, কথাটা পাকাপাকি হয়ে থাকবে শুধু—আহা আপনি আমাকে এতই অবুঝ মনে করেছেন!"

"ও, তাহলে এখনও কিছুই ঠিক হয় নি—"

"হ্যাঁ, ঠিক হয়েছে বৈকি।"

"সে মেয়েটি একথা জানে?"

"মেয়ের বাবা মা তাকে হয়তো বলেন নি কিছু, একটা ইয়ে আছে তো, কিন্তু আমার মনে হয় সে জানে ঠিক" চোখ কুঁচকে হেসে ফেললে যুগল পালিত। তারপর বললে—

"এখন বলুন কি বলছেন—"

"আমি সেখানে গিয়ে করব কি!"

"পুরন্দরবাবু—"

"এ তো অদ্ভুত আবদার দেখছি আপনার।"

রাগে ঘৃণায় পুরন্দরবাবুর মুখ দিয়ে কথা বেরুচ্ছিল না।

একি অদ্ভুত বেহায়া লোক!

"চলুন, বুঝলেন, আমি বলছি, ভালই লাগবে আপনার।"

গদগদকণ্ঠে অনুরোধ করতে লাগল যুগল—"না, না, না, শুনুন" পুরন্দরবাবুর অধীর ভাব লক্ষ্য করে' ব'লে উঠল সে আবার, "শুনুন, সব কথা তারপর ঠিক করলেন যা হয়। আপনি আমাকে ভুল বুঝেছেন বোধ হয়। আপনার বন্ধুত্ব দাবী করবার স্পর্দ্ধা আমার নেই, আমি একটা অনুগ্রহ চাইছি শুধু। আর এতে আপনি ভবিষ্যতে বিপন্নও হবেন না কোন রকমে তাও শপথ করে' বলতে পারি। তাছাড়া পরশুদিন তো চলেই যাচ্ছি আমি, আপনাকে আর বিরক্ত করতে আসব না, শুধু আজকের দিনটি দয়া করুন একটু। আপনার মহত্ত্বে বিশ্বাস করি বলে' অনেক আশা করে এসেছি! হয়তো ইদানীং আমার প্রতি একটু করুণাও হয়ে থাকবে আপনার—আমার মতো

হতভাগার প্রতি যে কোন লোকেরই করুণা হওয়া উচিত, আপনার মতো উদার লোকের তো···সব কথা গুছিয়ে বলতে পারছি না—"

হঠাৎ যুগলের গলা কেঁপে গেল, আর কিছু বলতে পারলে না সে। পুরন্দরবাবু সবিস্ময়ে চাইলেন তার দিকে।

"আপনি আমাকে ঠিক যে কি করতে বলছেন তাও তো বুঝতে পারছি না, সাধ্যাতীত না হলে আমি তা—"

"আপনি এখন আমার সঙ্গে চলুন, তাহলেই উপকৃত হব। তারপর ফেরবার পথে, বিশ্বাস করুন, সমস্ত খুলে বলব আমি—বিশ্বাস করুন।"

পুরন্দরবাবু তবু রাজি হলেন না, বিশেষ করে' নিজেরই অন্তরে দুষ্ট বাসনার গোপন সঞ্চরণ অনুভব করছিলেন বলে' আরও হলেন না। যুগল আবার বিয়ে করছে শোনামাত্রই মনের সুপ্ত অজগরটা নড়াচড়া সুরু করেছিল অনেক আগে থেকেই। হয়তো কৌতূহল, কিম্বা হয়তো নিগূঢ় আরও কিছু—রাজি হয়ে যেতে লোভ হচ্ছিল এবং যতই লোভ হচ্ছিল ততই দমন করবার চেষ্টা করছিলেন তিনি। টেবিলের উপর দুই কুনুইয়ের ভর দিয়ে চুপ করে বসে রইলেন এবং মনে মনে ইতস্ততঃ করতে লাগলেন। যুগল ক্রমাগত খোসামোদ করে' যেতে লাগল।

"বেশ চলুন"—হঠাৎ ঠিক করে' ফেললেন তিনি, মনের ভিতরটা কেমন করতে লাগল যদিও। উঠে দাঁড়ালেন চেয়ার ঠেলে। যুগলের আনন্দের সীমা রইল না।

জামা কাপড় বদলাতে হবে কিন্তু, এই বেশে যাবেন না কি—তা হবে না। ভাল কাপড় জামা বার করুন, চুলটা আচড়ান, আনন্দে উৎফুল্ল যুগল ব্যস্ত হয়ে উঠল।

আমি কি পরে যাব তা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে কেন লোকটা—পুরন্দরবাবুর মনে হল একবার।

একটু পরেই বেরিয়ে পড়লেন তিনি যুগলের সঙ্গে। যুগল প্রশংসমান দৃষ্টিতে

তাঁর পোষাকের পারিপাট্য দেখতে লাগল বারবার ; শ্রদ্ধা যেন উপচে উঠতে লাগল আরও। পুরন্দরবাবু বিস্মিত হচ্ছিলেন, শুধু তার আচরণে নয়, নিজের আচরণেও। বাইরে চমৎকার গাড়ি অপেক্ষা করছিল একখানা।

"ও আমার জন্যে গাড়িও আপনি আগে থাকতেই ঠিক করে এনেছিলেন ?"

"গাড়ি আমি নিজের জন্যেই ঠিক করেছিলাম। কিন্তু আপনি যে যাবেন সে বিষয়ে সন্দেহ ছিল না আমার" একমুখ হেসে যুগল বললে।

"আপনাকে নিয়ে জালাতন" গাড়িতে চড়ে হেসে অনুযোগ করলেন পুরন্দরবাবু।

"প্রশ্রয় দিয়েছেন বলেই জালাতন করি" গাঢ়কণ্ঠে যুগল উত্তর দিল।

গাড়ি চলতে সুরু করল।

"আর পাপিয়া ?" কথাটা একবার মনে হল কিন্তু জোর করে' সেটাকে মন থেকে তাড়াবার চেষ্টা করতে লাগলেন পুরন্দরবাবু। তাঁর মনে হতে লাগল একটা পবিত্র জিনিস অশুচি হয়ে গেল যেন। সহসা নিজেকে অত্যন্ত হীন, অত্যন্ত ক্ষুদ্র মনে হ'তে লাগল। ইচ্ছে করতে লাগল গাড়ি থেকে লাফিয়ে পড়ি এবং যুগল যদি বাধা দেয় তার গালে ঠাস করে চড় বসিয়ে দিই একটা। কিন্তু কিছুই হল না। যুগল মনের আনন্দে বকর বকর করতে লাগল ; প্রলোভনটা আবার তাঁর মন জুড়ে বসল।

"আচ্ছা পুরন্দরবাবু, দামী পাথরের সম্বন্ধে কোনও ধারণা আছে আপনার ?"

"কি পাথর ?"

"হীরে।"

"আছে কিছু কিছু।"

"আমার একটা উপহার নিয়ে যেতে ইচ্ছে করছে। নেব ?"

"এখন ওসব কেন !"

"ক্ষতি কি তাতে। কি কিনি বলুন ত ? ব্রোচ, দুল, ব্রেসলেট—একটা 'সেট' নিলে কেমন হয়, না শুধু একটা জিনিসই নেব ?"

"কত টাকা খরচ করবেন আপনি ?"

"হাজার দুই আড়াই।"

"এত ?"

"বেশী মনে হচ্ছে আপনার ?" অপ্রতিভ হয়ে গেল যুগল একটু।

"একটা ব্রোচ কিম্বা একটা দুল নিয়ে যান বড় জোর, এত খরচ ক'রে কি হবে এখন ?"

যুগল মুষড়ে গেল। অনেক টাকা খরচ করে' একটা 'হোল সেট' কিনে দেবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল সে। একটা গয়নার দোকানে গাড়ি দাঁড়াল। পুরন্দরবাবু আবার বেশী টাকা খরচ করতে মানা করলেন। শেষে একজোড়া ব্রেসলেট কেনা হ'ল—তাও যুগল যেটা পছন্দ করছিল সেটা নয়, পুরন্দরবাবু ওর মধ্যে সস্তা দেখে একজোড়া বেছে দিলেন। দাম মাত্র ৩০০৲ টাকা শুনে যুগলের মন আরও দমে' গেল। বেশী দামী কিনলে কি ক্ষতি ছিল!

"ভাল একটা জিনিস কিনে দিলেই হ'ত" গাড়িতে চড়ে' যুগল বলতে লাগল—"অতবড় সংসার, অতগুলি মেয়ে, বেচারারা গয়না কি পরতে পায়।" একটু পরে ফিক করে হেসে আবার সুরু করলে সে—'পনের বছর বয়স শুনে আপনি হাসছিলেন। কিন্তু ওই কম বয়স বলেই আমি আরও মজেছি। বেণী দুলিয়ে বই খাতা বগলে নিয়ে এখনও স্কুলে যায়,—হি-হি। মানে নিষ্পাপ, ওইতেই মুগ্ধ করেছে আমাকে, রূপে নয়। স্কুলে যায়, হুড়োহুড়ি করে, কথায় কথায় হেসে লুটিয়ে পড়ে, সে কি হাসি—আর কি নিয়ে হাসি শুনবেন, বেরালটা সিন্দুক থেকে লাফিয়ে পড়ে' কেমন বলের মতো চলে গেল, সংসারের কিছু জানে না এখনও—একবারে কচি—হি—হি।"

পুরন্দরবাবু নিস্তব্ধ হয়ে বসেছিলেন।

মাঝে মাঝে তাঁর মনে হচ্ছিল—"আমাকে জোর করে' নিয়ে যাচ্ছে কেন ? কোনও মতলব নেই তো! ফাঁদে ফেলবে না কি ? সত্যি আমার মহত্বের উপর এখনও বিশ্বাস আছে ওর! লোকটা কি! ভাঁড়, বেকুব, পাগল—না আর কিছু!"

১২

পুরন্দরবাবু যা বলেছিলেন বিশ্বম্ভরবাবুরা সত্যিই ভদ্র পরিবার। বিশ্বম্ভরবাবু নিজে একজন পদস্থ এবং সম্মানিত লোক, সকলে তাঁকে খাতির করে। তাঁর আয়ের সম্বন্ধেও সুশীল যা বলেছিল তা ঠিক। এতদিন তিনি রোজকার করছেন স্বচ্ছন্দে চলে' যাচ্ছে বেশ, কিন্তু তিনি চোখ বুজলেই সংসার অচল হয়ে পড়বে।

বিশ্বম্ভরবাবু পুরন্দরবাবুকে বেশ সবিনয় ভদ্রতাসহকারে অভ্যর্থনা করলেন। মকোর্দ্দমা নিয়ে তাঁর সঙ্গে যে প্রচ্ছন্ন শত্রুতাটা হয়েছিল সেটা কর্পূর হয়ে গেল যেন।

"খুব ভাল হয়েছে" প্রথমেই আরম্ভ করলেন তিনি, "আপোষে যে আপনারা মিটমাট করে' ফেলেছেন খুব ভাল হয়েছে এটা। আমারও তাই ইচ্ছে ছিল, আর আপনার উকীল পরেশবাবু তো অসাধারণ লোক এসব বিষয়ে। ভাল হয়েছে। কোন হাঙ্গামার মধ্যে না গিয়ে সরাসরি আপনি তিন লক্ষ টাকা পেয়ে যাবেন। মকোর্দ্দমা চালালে অন্তত তিনটি বছর নাকানি চোবানি খেতে হ'ত আপনাদের দুজনকেই। এ খুব ভাল হয়েছে—"

বিশ্বম্ভরবাবু আলোক-প্রাপ্ত সমাজের লোক, তাঁর পিতা ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম গ্রহণ করেছিলেন। সুতরাং পর্দার বালাই নেই। একটু পরেই বিশ্বম্ভরবাবুর স্ত্রীর সঙ্গে পুরন্দরবাবুর আলাপ হয়ে গেল। শ্রীযুক্তা হেমাঙ্গিনী দেবী স্থূলকায়া প্রবীণা। চোখে মুখে একটা ক্লান্তির ছাপ পড়েছে। দেখলেই মনে হয় যেন অবসন্ন তিনি। আলাপ করলে মার্জ্জিতরুচির পরিচয় পাওয়া যায়। একটু

পরেই তাঁর মেয়েরাও এল একে একে। পুরন্দরবাবু দিশাহারা হয়ে পড়লেন। একটি দুটি নয়, দশ বারোটি যুবতী সমবেত হলেন একে একে এসে। চলেও গেলেন। তাঁরা বিশ্বম্ভরবাবুর মেয়েদের বান্ধবী বোঝা গেল। পাড়ায় থাকেন। বিশ্বম্ভরবাবুর বাড়িটা বিশাল, নানাসময়ে জোড়া-তাড়া দিয়ে তৈরি। সামনে অনেকখানি জমি, প্রকাণ্ড বাগান। কথাবার্ত্তা থেকে বোঝা গেল যে তাঁরা পুরন্দরবাবুর আগমন প্রত্যাশা করছিলেন এবং যুগলের বন্ধু হিসেবেই বিশেষ করে' সম্বর্দ্ধনা করলেন তাঁর। তিনি আসাতে সকলেই উল্লসিত হয়ে উঠল খুব।

পুরন্দরবাবু অভিজ্ঞ লোক। একটা জিনিস সন্দেহ হ'তে লাগল তাঁর। এই অত্যুচ্ছ্বসিত সম্বর্দ্ধনায়, মেয়েদের বেশবিন্যাসের পারিপাট্যে তাঁর মনে হতে লাগল যে যুগল বোধ হয় আকারে ইঙ্গিতে এদের কাছে প্রকাশ করেছে যে তিনি এখনও বিয়ে করেন নি, তাঁর বিষয় সম্পত্তি আছে, বনেদি বংশের ছেলে তিনি, অজস্র সময় এবং সম্পত্তি নিয়ে কি করবেন, ভেবে পাচ্ছেন না, সুতরাং এইবার বোধ হয় বিয়ে করে' সংসারী হতে পারেন—বিশেষতঃ এত বড় মকোর্দ্দমাটা নির্ব্বিবাদে মিটে গিয়ে অতগুলো টাকা পেয়ে গেলেন যখন। বড় মেয়ে সুস্মিতা—যাকে যুগল 'খাসা মেয়ে' বলে' বর্ণনা করেছিল—তার আচরণে সন্দেহটা আরও বদ্ধমূল হতে লাগল পুরন্দরবাবুর মনে। তার শাড়ি, ব্লাউস, চুল বাঁধবার ধরণ, সলজ্জ দৃষ্টি প্রভৃতি অন্যগুলির থেকে একটু স্বতন্ত্র বলে' ঠেকল তাঁর কাছে। তার বোনেদের এবং তাদের বান্ধবীদের ধরণ থেকেও প্রতীয়মান হতে লাগল যেন সুস্মিতার দৌলতেই তারা পুরন্দরবাবুর সঙ্গে আলাপ করবার সুযোগ পেয়েছে—অর্থাৎ যেন তিনি সুস্মিতাকে "দেখতে এসেছেন" এবং এরা সবাই তা আগে থাকতে জানে। তাদের ব্যবহার এবং মাঝে মাঝে দু' একটা কথাও বা প্রকাশ করতে লাগল তার অন্য কোন মানে হয় না আর। সুস্মিতা মেয়েটি লম্বা, ফরসা। তন্বী নয়, দোহারা। মুখখানি ভারী মিষ্টি। বেশ শান্ত শিষ্ট ভদ্র। পুরন্দরবাবুর মনে হতে লাগল এরকম

মেয়ের বিয়ে হয়নি কেন এখনও? আশ্চর্য্য তো। পণের জন্যে আটকেছে সম্ভবত। এখনও দেখতে বেশ সুশ্রী আছে, কিন্তু এর পর দেখতে দেখতে মোটা হয়ে যাবে, তখন…"। বিশ্বম্ভরবাবুর অন্য মেয়েগুলিও দেখতে বেশ। তাদের বান্ধবীদের মধ্যেও অনেক রূপসী ছিল। পুরন্দরবাবু সুস্মিতার দিকেই মনটাকে একাগ্র রাখতে পারলেন না। তাছাড়া বিশেষ একটা উদ্দেশ্য ছিল তাঁর।

পারুল—ষষ্ঠী ভগ্নীটি, যে স্কুলে পড়ে, যুগল পছন্দ করেছে যাকে—সে অনেকক্ষণ পরে এল। পুরন্দরবাবু যে কতটা আগ্রহভরে তার আগমন প্রতীক্ষা করছিলেন তা আবিষ্কার করে' নিজেই বিস্মিত হলেন, ধিক্কারও দিলেন নিজেকে তার জন্যে। কিন্তু আগ্রহটা কমল না। পারুলের আবির্ভাবে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হল বেশ। পারুলের সঙ্গে এল কল্পনা—ছিপছিপে শ্যামবর্ণের মেয়েটি, তীক্ষ্ণ মুখশ্রী, চোখের দৃষ্টি চকমক করছে, বুদ্ধির দীপ্তি ফুটে বেরুচ্ছে মুখভাবে। তাকে দেখে যুগল একটু শশব্যস্ত হয়ে পড়ল। কল্পনার বয়স বছর তেইশ হবে। তার নাম করবার ক্ষমতা নাকি অসাধারণ। স্কুলে মাষ্টারি করে, পাশের বাড়িতে থাকে; কিন্তু সে বিশ্বম্ভরবাবুদের বাড়িরই একজন হয়ে গিয়েছিল প্রায়। বাড়ির সব মেয়েরা 'কল্পনা দি' বলতে অজ্ঞান। পারুলের তো তাকে ছাড়া চলতই না। কিছুক্ষণের মধ্যেই পুরন্দরবাবু বুঝতে পারলেন যে একটি মেয়েও যুগলের উপর প্রসন্ন নয়; পাড়ার মেয়েরাও নয়। পারুলের ভাবভঙ্গী থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল যে সে যুগলকে ঘৃণা করে। পুরন্দরবাবু এও লক্ষ্য করলেন যে যুগল এ সম্বন্ধে নির্ব্বিকার। হয় সে ব্যাপারটা বুঝতে পারছে না, কিংবা বুঝতে চাইছে না।

সবগুলির মধ্যে পারুলই সব চেয়ে দেখতে ভাল। রং তত ফরসা নয় কিন্তু অপরূপ। একটা বন্যশ্রী তার সর্ব্বাঙ্গে যেন মূর্ত্ত হয়ে রয়েছে এখনও পোষ মানে নি, মানবার কোন লক্ষণও নেই। উজ্জ্বল চোখের দৃষ্টিতে দুষ্টুমি মাখানো, মুখের হাসিতে ছোট্ট একটু মিষ্টি খোঁচ, চমৎকার ঠোঁট দুটি, চকচকে

দাঁত, তন্বী দেহটি গেলব বন্তবল্লরীর মতো, মুখভাবে শিশুর সাপল্যের সঙ্গে মিশেছে আসন্ন যৌবনের পূর্ণাভাষ। তার বয়স যে পনেরোর বেশী নয় তার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছিল তার প্রতি পদক্ষেপে, প্রতি কথায়।

যুগলের উপহার দেওয়া ব্যাপারটা মোটেই জমল না, হাস্যকর হয়ে উঠল। একটু অপ্রীতিকরও। পারুল ঘরে ঢুকতেই দৈত্যো হাসি হেসে যুগল এগিয়ে গেল এবং পকেট থেকে ব্রেসলেটের বাক্সটা বার করে বললে—"এর আগের দিন তোমার গান শুনে এত ভাল লেগেছিল যে তোমার জন্যে প্রাইজ এনেছি একটা—হেঁ—হেঁ।" আর বলতে পারল না, কথাটা আটকে গেল, অসহায়-ভাবে বাক্সটা বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে রইল সে। পারুল নেবার জন্যে হাত বাড়াল না দেখে জোর করে' তার হাতে গুঁজে দিতে গেল। রাগে লজ্জায় চোখ মুখ লাল হয়ে উঠল পারুলের, সে হাত সরিয়ে নিয়ে মায়ের দিকে ফিরে বললে—আমি নেব না।

বিশ্বম্ভরবাবু গম্ভীরভাবে বললেন—"নাও না, তাতে কি হয়েছে, এনেছেন যখন তোমার জন্যে, নাও। নিয়ে ধন্যবাদ দাও।" কিন্তু তাঁর মুখ চোখ দেখে মনে হল তিনিও অসন্তুষ্ট হয়েছেন। যুগলের দিকে চেয়ে বললেন "কি দরকার ছিল এসবের—"

পারুল যখন দেখলে না নিয়ে উপায় নেই, তখন নিতেই হল তাকে। "ধন্যবাদ"টা কোনক্রমে উচ্চারণ করে' মুখ টিপে মায়ের পাশে গিয়ে বসল সে, নাকের ডগাটা কাঁপতে লাগল তার। তার এক বোন উঠে গেল কি দিয়েছে দেখবার জন্যে। বাক্সটা না খুলেই পারুল তাকে দিয়ে দিলে সেটা। যুগলকে দেখিয়ে দিলে যে তার দেওয়া উপহারকে গ্রাহ্যই করে না সে। ব্রেসলেট জোড়া হাতে হাতে ঘুরতে লাগল, কেউ বিশেষ কিছু মন্তব্য করলেন না, ব্যঙ্গের হাসি ফুটে উঠল কারো কারো চোখের দৃষ্টিতে। হেমাঙ্গিনী দেবীই কেবল মৃদুস্বরে প্রশংসা করলেন একটু। যুগল শরমে মরে গেল। পুরন্দরবাবুই আবহাওয়াটাকে স্বচ্ছ করে' তুললেন শেষে। কথা কইতে আরম্ভ করলেন,

যা মনে এল তাই নিয়েই সুরু করলেন, পাঁচ মিনিটের মধ্যে সব ঠিক হয়ে গেল, সবাই মন দিয়ে তাঁর কথা শুনতে লাগল। ওস্তাদ আড্ডাধারী ছিলেন পুরন্দরবাবু এককালে, আড্ডা জমানোর কৌশল জানা ছিল তাঁর ভাল করেই। যা হোক কিছু একটা কায়দা করে' সুরু করলেই জমে যায়। কখনও সরসতা, কখনও সরলতা, কখনও পরচর্চা, কখনও রাজনীতি, দুচার লাইন কবিতা, দুচারটে রসিকতা নানা মন্ত্র জানা ছিল তাঁর। কিন্তু এক্ষেত্রে নিজের অন্তর থেকেই একটা বিশেষ প্রেরণা পাচ্ছিলেন তিনি, অপরকে আকর্ষণ করবার শক্তি যে তাঁর আছে তা যেন সচেতন ভাবে অনুভব করছিলেন এবং তারই মাদকতায় উৎফুল্ল হয়ে উঠছিলেন ক্রমশ। এখনই যে সকলে তাঁর দিকে ফিরে তাকাবে, সাগ্রহে তাঁর কথাই শুনবে, তাঁর সঙ্গে ছাড়া আর কারও সঙ্গে আলাপ করবে না, তাঁর রসিকতাতেই হাসবে কেবল—এ বিষয়ে তাঁর বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। সত্যিই বেশ জমে উঠল একটু পরে। আরও তিন চারজন যোগ দিলে গল্পগুজবে হাসি ঠাট্টায়। পরকে আপন করে' দলে টেনে নেবারও অসাধারণ ক্ষমতা ছিল পুরন্দরবাবুর। হেমাঙ্গিনী দেবীর মুখ থেকেও ক্লান্তির ছায়া অপসারিত হয়ে হাসির আলো ফুটল। সুমিতার তো কথাই নেই, মন্ত্রমুগ্ধবৎ বসে পুরন্দরবাবুর কথা শুনছিল সে। পারুল কিন্তু একটু সন্দেহের চক্ষে দেখছিল পুরন্দরবাবুকে, তার ভ্রূভঙ্গী থেকেই বোঝা যাচ্ছিল তা। এতে পুরন্দরবাবুর উৎসাহ আরও বেড়ে যাচ্ছিল যেন। কল্পনাও যোগ দিয়েছিল আলাপে, পুরন্দরবাবুকে ঠাট্টা করতেও ছাড়ে নি একটু। "যুগলবাবু বলছিলেন আপনি তাঁর বাল্যবন্ধু, তাহলে আপনার বয়সও তো নিতান্ত কম নয়! পঞ্চাশের উপর তো হবেই, নয়? অথচ আপনাকে কত কমবয়সী মনে হচ্ছে"—মাথা দুলিয়ে মিছে কথাটা বানিয়ে বলেছিল সে, কিন্তু তারও পুরন্দরবাবুকে ভালই লাগছিল। যুগল কিন্তু একেবারে মুষড়ে গিয়েছিল। পুরন্দরবাবুর ক্ষমতা অবশ্য জানা ছিল তার এবং এখানে তাঁর সাফল্যে সে উল্লসিতও হচ্ছিল

প্রথম প্রথম, যোগ দেবারও চেষ্টা করছিল তাঁর রসিকতায়, কিন্তু পুরন্দরবাবুর স্বতোৎসারিত আবেগের কাছে দাঁড়াতে পারছিল না সে। ক্রমশ সে গম্ভীর হয়ে পড়ল। শেষে তার মুখ দেখে মনে হতে লাগল অত্যন্ত দমে গেছে বেচারা।

"আপনি তো ঘরের লোক হয়ে গেলেন, আপনার সঙ্গে আর ভদ্রতার ভান করবার দরকার নেই। আমার একটু কাজ আছে, উঠি এবার। ছুটির দিনেও নিস্তার নেই মশাই, মকোর্দ্দমার কাগজপত্তর জমে' আছে এক গাদা। আপনার সম্বন্ধে কি ভুল ধারণাই ছিল আমার—ভেবেছিলাম অহঙ্কারী গোমড়া-মুখো ছিটগ্রস্ত লোকটা—এখন দেখছি ঠিক উলটো। মানুষ কত ভুলই করে। আচ্ছা, চলি আমি।"

বিশ্বম্ভরবাবু চলে গেলেন। ঘরের কোনে পিয়ানো ছিল একটা। পুরন্দরবাবু প্রশ্ন করলেন—"এ যন্ত্রটি বাজায় কে ?"

তারপর পারুলের দিকে হঠাৎ ফিরে বললেন—"তুমি নিশ্চয় গাইতে পার।"

"কে বললে আপনাকে" ফোঁস করে' উঠল যেন পারুল।

"এক্ষুণি তো যুগলবাবু বললেন।"

"ওটা মিছে কথা। আমার গানের গলা নেই।"

"আমারও গানের গলা নেই। তবু আমি গাই মাঝে মাঝে।"

"আপনি গাইবেন ? আমিও গাইব তাহলে"—হঠাৎ পারুলের চোখ দুটোতে আলো ঝলমল করে' উঠল—"কিন্তু এখন নয়, খাবার পরে। গান খুব ভালো লাগে না আমার, জানেন—দিন রাত প্যান প্যান—বিচ্ছিরি—পিয়ানোটার জ্বালায় অস্থির—দিদি তো সকাল নেই সন্ধে নেই টুংটাং করছেই। দিদির গান অবশ্য শোনবার মতো—"

পুরন্দরবাবু এ সূত্র ছাড়লেন না। সুমিতা সত্যই রোজ পিয়ানো সাধে। পুরন্দরবাবু সুমিতাকে অনুরোধ করাতে সবাই পুলকিত হল—হেমাঙ্গিনী

দেবী তো গদগদ হয়ে পড়লেন একেবারে। একটু মুচকি হেসে সুস্মিতা উঠে পিয়ানোর কাছে গেল। হঠাৎ ভয়ানক লজ্জা হল তার, চোখ মুখ লাল হয়ে উঠল, নিজের কাছেই অপ্রতিভ হয়ে পড়ল সে এতে—চব্বিশ বছরের বুড়ো ধাড়ি মেয়ে সে, কচি খুকীর মতো একি অশোভন লজ্জা তার, এ অপ্রতিভ ভাবটাও ফুটে উঠল মুখে। কোনক্রমে আত্মসম্বরণ করে' টুলটার উপর বসে' পড়ল সে। দু'চারটে গামুলি গৎ গামুলিভাবেই বাজালে। ভারী লজ্জা করছিল তার। পুরন্দরবাবু কিন্তু উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন প্রশংসায়। গৎগুলোরই প্রশংসা করলেন বেশী, বাদিকার তত নয়। কিন্তু সুস্মিতা এত সূক্ষ্ম প্রভেদ ধরতে পারল না। সে হৃষ্ট হয়ে উঠল খুব এবং এমন তন্ময় হয়ে পুরন্দরবাবুর সঙ্গীতবিষয়ক আলোচনা শুনতে লাগল যে পুরন্দরবাবুও তার প্রতি একটু আকৃষ্ট না হয়ে পারলেন না। "বাঃ বেশ মেয়েটি তো"—ফুটে উঠল তাঁর দৃষ্টিতে এবং তা সবাই বুঝতেও পারল, বিশেষ করে' সুস্মিতা নিজে।

"আপনাদের বাগানটা তো চমৎকার" হঠাৎ জানলা দিয়ে চেয়ে পুরন্দরবাবু বললেন—"চলুন না বাগানেই যাওয়া যাক, ঘরের ভেতর কেন, এমন বাগান থাকতে।"

"হ্যাঁ হ্যাঁ চলুন" প্রায় সবাই বলে' উঠল সমস্বরে, যেন সকলের মনের কথাটা পুরন্দরবাবুর মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়েছে।

সবাই বাগানে নেমে গেল এবং সন্ধ্যে পর্য্যন্ত রইল সেখানে। হেমাঙ্গিনী দেবীর যদিও একটু ঘুমিয়ে নেবার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু পাছে পুরন্দরবাবু কিছু মনে করেন এই ভেবে তিনি আর ঘুমুতে গেলেন না। কিন্তু বাগানে নেমে হুড়োহুড়ি করতেও প্রবৃত্তি হল না তাঁর, তিনি বারান্দায় বেরিয়ে একটা চেয়ারে বসে' ঢুলতে লাগলেন। পুরন্দরবাবু বাগানে গিয়ে খুব জমিয়ে ফেললেন মেয়েদের সঙ্গে। কিছুক্ষণ পরেই পাড়ার আরও কয়েকটি ছোকরা এসে জুটল। একজন কলেজে পড়ে, আর একজন ম্যাট্রিকের গণ্ডী

পেরোয় নি। তাদের দেখে তাদের বান্ধবীরা অভ্যর্থনা করে' নিলে। নীল চশমা-পরা উসকো-খুসকো চুল তৃতীয় আর একটি ছোকরা এল। সে এসেই পারুল আর কল্পনাকে একটু দূরে ডেকে নিয়ে গিয়ে পুরন্দরবাবুর দিকে চেয়ে চেয়ে ভুরু কুঁচকে ফুসফুস গুজগুজ করতে লাগল। বোঝা গেল পুরন্দরবাবুর অভ্যাগমে অসন্তুষ্ট হয়েছে সে এবং বাগে পেলে তাঁকে এক হাত দেখিয়ে দিতেও ছাড়বে না।

"আসুন কিছু খেলা যাক"—অনেকগুলি মেয়ে বললে।

"কি খেলবে? কি তোমরা খেল রোজ?"

"সব রকম। লুকোচুরি, কানামাছি, ব্যাডমিন্টন। সন্ধ্যের সময় কিন্তু আমরা নতুন খেলা খেলি একটা—কিম্বদন্তী।"

"সে আবার কি?"

"আমরা সবাই মিলে বসব একটা ঘরে। একজন বাইরে চলে যাবে। তারপর আমরা একটা কিম্বদন্তী ঠিক করব—এই যেমন ধরুন 'অতি দর্পে হত লঙ্কা'! তারপর যে বাইরে চলে গেছে তাকে ডাকা হবে। আর আমরা তাকে এক একটা বাক্য বলব। একজন মনে করুন বললে 'অতিশয় লোভ ভাল নয়' এর মধ্যে 'অতি' কথাটা আছে, আর একজন বললে 'দর্পনারায়ণ ঠাকুর বড়লোক ছিলেন, এর মধ্যে 'দর্প' কথাটা আছে। সকলের কথা শুনে তাকে কিম্বদন্তীটা বার করতে হবে।"

"বাঃ বেশ মজার তো" পুরন্দরবাবু বললেন।

"না, মোটেই মজার নয়। খানিকক্ষণ পরে বিরক্ত ধরে' যায়" বলে' উঠল দু'তিনজন।

"কিম্বা আমরা থিয়েটার থিয়েটার খেলি অনেক সময়'—পারুল বললে—"ওই যে বড় বটগাছটা দেখছেন—যার সামনে চৌতারা আছে একটা—ওইখানে। বটগাছের পেছনটা আমাদের গ্রীনরুম। ওইখানে কেউ রাজা, কেউ রাণী, কেউ মন্ত্রী সেজে বসে থাকি। যার যা খুশী। তারপর গ্রীনরুম

থেকে যখন যার খুশী বেরিয়ে এসে যা মনে আসে বলে যেতে হয়। আর সবাই বসে শোনে—"

"এটাও তো বেশ" পুরন্দরবাবু বললেন।

"যত বেশ ভাবছেন তত নয়" পারুলই প্রতিবাদ করলে ঠোঁট উলটে—"ভারী বিরক্তিকর হয়ে যায় মাঝে মাঝে। কেউ কিছু বলতে পারে না ভাল করে'। তবে আপনি যদি নাবেন হয় তো ভাল হবে। জানেন, আমরা প্রথমে ভেবেছিলাম সত্যিই বুঝি আপনি যুগলবাবুর বন্ধু। এখন দেখছি সেটা বাজে কথা। বানিয়ে গল্প করেছিলেন ভদ্রলোক।"

"আমার ওপর রাগ নেই তাহলে তো আর?"

"আমার তো খুব ভাল লাগছে"—মুচকি হেসে ছুটে চলে গেল পারুল কল্পনার কাছে।

অপরিচিতা একটি মেয়ে এগিয়ে এসে পুরন্দরবাবুর কাণে কাণে বললে "আজ সন্ধ্যেবেলা আমরা 'কিম্বদন্তী' খেলব। যুগলবাবুকে জব্দ করতে হবে, আপনি আমাদের দিকে, বুঝলেন?"

আর একটি মেয়েকেও ইতিপূর্ব্বে ভাল করে' লক্ষ্য করেন নি পুরন্দরবাবু। কটা চুল, কটা চোখ, মুখে ব্রণের দাগ—এগিয়ে এসে আলাপ করলে পুরন্দরবাবুর সঙ্গে। ধপধপে ফরসা রং—মুখ লাল হয়েছে রোদের তাতে। একমুখ হেসে বললে—"আপনি এসেছেন, বেশ হয়েছে। সময়টা কাটবে ভাল। এমন একঘেয়ে লাগে রোজ।"

যুগল পালিতের অবস্থা ক্রমশই খারাপ হচ্ছিল। খানিকক্ষণ পরেই পুরন্দরবাবুর সঙ্গে পারুলের ভাব হয়ে গেল বেশ। তার চোখে আর সে সন্দিগ্ধ দৃষ্টি রইল না। সে স্বচ্ছন্দে হাসছিল, লাফাচ্ছিল, চীৎকার করছিল, পুরন্দরবাবুর হাত ধরে টেনেও ছিল বার দুই, আনন্দ উথলে পড়ছিল যেন তার সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে। যুগলকে কিন্তু সে গ্রাহ্যের মধ্যেই আনছিল না, তার ব্যবহার দেখে মনে হচ্ছিল যেন যুগলের অস্তিত্বকেই সে স্বীকার করছে না।

যুগল যেন নেই। পুরন্দরবাবু বেশ বুঝতে পারলেন যে সবাই মিলে যুগলের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করেছে একটা। পারুল এবং আরও কয়েকটি মেয়ে পুরন্দরবাবুকে টেনে নিয়ে একদিকে চলে গেল, আর একদল মেয়ে যুগল পালিতকে ভুলিয়ে ভালিয়ে নিয়ে গেল ঠিক বিপরীত দিকে। কিন্তু যুগল হঠাৎ ছটকে বেরিয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে চলে এল পারুলরা যেখানে ছিল এবং এসেই পারুল ও পুরন্দরবাবুর মাঝখানে নিজের টেকো মাথাটা হঠাৎ গুঁজে দিয়ে একটা অস্বস্তির হাসি হাসতে লাগল হাঁপাতে হাঁপাতে। আদব-কায়দা শোভনতা-অশোভনতা কোন কিছুরই তোয়াক্কা করছিল না আর সে যেন। সমস্ত আবরণ উড়িয়ে দিয়ে নিজের মনোভাবটা স্পষ্ট করবার চেষ্টা করছিল কেবল প্রাণপণে। পুরন্দরবাবু পারুলকে ছেড়ে সুস্মিতার দিকে যদি একটু মন দেন তাহলে বেচারা বেঁচে যায় যেন। সুস্মিতাকে একবার লেলিয়ে দেবারও চেষ্টা করলে সে। হাত মুখ নেড়ে একটু ধমকের সুরেই সুস্মিতাকে বললে—

"আপনি সরে'সরে' বেড়াচ্ছেন কেন, আলাপ করুন না পুরন্দরবাবুর সঙ্গে।"

সুস্মিতা হাসিমুখে এগিয়ে এল একটু। পুরন্দরবাবু যে তাকে দেখতে আসেন নি একথা সে এতক্ষণে বুঝেছিল, তার সঙ্গর চেয়ে পারুলের সঙ্গই যে বেশী পছন্দ করছেন তিনি—এ-ও অস্পষ্ট ছিল না তার কাছে, তবু হাসি-মুখে এগিয়ে গেল একটু সে। পুরন্দরবাবুর কথাবার্ত্তা সম্পূর্ণরূপে বোঝাবার মতো বুদ্ধি ছিল না তার, তবু সে শুনে যাচ্ছিল মুখের হাসিটুকু বজায় রেখে। তার মনে যে কোন দুঃখ হয়েছে তা তার মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছিল না। সকলের আনন্দের মাঝখানে সে যে থাকতে পেয়েছে এতেই যেন সে চরিতার্থ।

· "তোমার দিদি ভারী চমৎকার লোক, নয়?" পুরন্দরবাবু পারুলকে বললে চুপি চুপি।

"কে দিদি? নিশ্চয়! দিদির মতো মেয়ে আছে! এতো ভালো লাগে দিদিকে" সোচ্ছ্বাসে বলে উঠল পারুল।

বিশ্বম্ভর-গৃহিণী আহারের আয়োজন করেছিলেন সাহেবী-কায়দায়।

বেশ বোঝা গেল যে তাঁদেরই জন্যে বিশেষ আয়োজন এটা। খাওয়ার পর বৈঠকখানায় গিয়ে জমায়েত হলেন সবাই।

আহারান্তে বিশ্বম্ভরবাবু বেশ প্রসন্ন হয়ে উঠেছিলেন। পুরন্দরবাবুর আলাপ খুব উপভোগ করতে লাগলেন তিনি, তাঁর প্রতি কথায় হাসতে লাগলেন। পুরন্দরবাবুরও প্রাণে যেন জোয়ার এসেছিল। অনুপ্রাসে, অলঙ্কারে, কবিতায়, রসিকতায় মাতিয়ে তুললেন তিনি সবাইকে। যুগল পালিতের আর সহ্য হল না। সেও রবিঠাকুরের দু' লাইন কবিতা আউড়ে দিলে...মেয়ের দল কলস্বরে হেসে উঠল, কারণ কবিতাটা একটু বেমানান হয়ে গেল। "ও মা, যুগলবাবুও কবিতা জানেন তাহলে" বলে উঠল একজন।

বিশ্বম্ভরবাবু ঘাড় ফিরিয়ে হাসিমুখে চাইলেন যুগলের দিকে।

"কি কবিতা—"

তাঁর চতুর্থী কন্যা একমুখ হেসে বললে—"উনি বললেন, আজি রজনীতে হয়েছে সময় এসেছি বাসবদত্তা?"

"বাসবদত্তা? ও, তার মানে—ও"

কঙ্কনা বললে—"রবি ঠাকুরের 'অভিসার' কবিতাটা—"

"অভিসার? ও—"

বিশ্বম্ভর ভ্রূকুঞ্চিত করলেন একটু।

কঙ্কনা নিম্নকণ্ঠে যুগলকে বললে—"আপনার বরং বলা উচিত ছিল 'নগরীর দীপ নিবেছে পবনে, দুয়ার রুদ্ধ পৌর ভবনে'—ও কি আপনার চোখে কিছু পড়ল না কি?"

যুগল চোখ কচলাচ্ছিল।

বিশ্বম্ভরবাবু শঙ্কিত হয়ে পড়লেন—"কি হল চোখে?"

"চোখের নীচের পাতাটা ওপরের পাতার তলায় ঢুকিয়ে দিন—"

"হাঁচুন, হাঁচুন—"

"ঘাড়ে থাপ্‌পড় মারুন—"

নানা উপদেশ বর্ষিত হতে লাগল।

"খেয়ে এখন ঘুমুবেন না কি। চলুন বাগানে যাওয়া যাক,—একজন বলে' উঠল।

"আমার কিন্তু ঘুম পাচ্ছে"—বিশ্বম্ভরবাবু হাই তুললেন।

"আপনি শুয়ে পড়ুন গিয়ে। আমরা এখন হল্লোড় করব, আপনি কতক্ষণ থাকবেন। আপনি শুয়ে পড়ুন।"

"ও, আচ্ছা।"

"চল, তোমার মশারীটা ফেলে দিই গে—"

স-গৃহিণী বিশ্বম্ভরবাবু ওপরে চলে যেতেই বাগানে নেমে পড়ল আবার সবাই।

যুগল হঠাৎ পুরন্দরবাবুর কাছে গিয়ে চুপি চুপি বললে "শুনুন একবার—"

একটু দূরে সরে' গিয়ে সে বলে উঠল' "না, দেখুন, মাপ করবেন, এবার আমি কিছুতেই, এবার আমি কিছুতেই—মানে—"

"মানে, কি ? সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলেন পুরন্দরবাবু।

যুগল আর কিছু বলতে পারলে না—ঠোঁট দুটো নড়ে উঠল শুধু—জোর করে' হাসবার চেষ্টা করতে লাগল সে।

"কোথা—কোথা গেলেন আপনারা—আমরা সব 'রেডি'।"

মেয়েদের কলকণ্ঠ শোনা গেল দূরে: পুরন্দরবাবু স্কন্ধদ্বয় উত্তোলন করে' 'শ্রাগ্' করলেন, তারপর মেয়েদের দিকে ফিরে গেলেন। যুগলও ছুটতে লাগল পিছু পিছু।

"নিশ্চয় রুমাল চাইছিলেন আপনার কাছে" করুনা বললে পুরন্দরবাবুকে—

"গতবার রুমাল আনতে ভুলেছিলেন।"

"প্রতিবারই ভুলবেন উনি" টিপ্পনি কাটলে পারুলের সেজদিদি।

"না, যুগলবাবু এবারও রুমাল ফেলে এসেছেন, না যুগলবাবু রুমাল ফেলে এসেছেন" চীৎকার করে' উঠল একসঙ্গে সবাই।

হেমাঙ্গিনী দেবী দ্বিতলের বারান্দায় বেরিয়ে এলেন—"ও, আচ্ছা, পাঠিয়ে দিচ্ছি" ভিতরে ঢুকে গেলেন তিনি।

"না, না আমার দুটো রুমাল আছে, "চীৎকার করে' উঠল যুগল।

কিন্তু সে কথা হেমাঙ্গিনী দেবী শুনতে পেলেন না, একটু পরেই একটা চাকর একটা রুমাল নিয়ে ছুটতে ছুটতে নেবে এল। হো হো করে' হেসে উঠল সবাই।

"এবার কিন্তু কিম্বদন্তী খেলব আমরা" মেয়েরা সবাই বলে উঠল। একটা জায়গা ঠিক করে' বসে' পড়ল সবাই। কল্পনা প্রথমে যাবে ঠিক হল। কল্পনা দল ছেড়ে অনেক দূরে চলে গেল, যেন কিছু শুনতে না পায়। একটা 'কিম্বদন্তী বাছা হল, কিম্বদন্তীর কোন্ কোন্ কথা দিয়ে কে কি বাক্য তৈরি করবে তা ঠিক হল, তারপর ডাকা হল কল্পনাকে। কল্পনা ঠিক ধরে' ফেললে কিন্তু। প্রবাদটা ছিল—যার ধন তার ধন নয় নেপোয় মারে দই।

এর পর নীল-চশমা-পরা উসকো খুসকো চুল সেই ছোকরাটির পালা। এর সম্বন্ধে সবাই আরও সাবধান হ'ল—একে আরও দূরে ওই বটগাছটার কাছে গিয়ে দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হল। ছোকরা চটল খুব, কিন্তু যেতেই হল তাকে। ফিরে এসে 'কিম্বদন্তী'টাও সে ধরতে পারলে না। প্রত্যেকের জন্য দু'বার দু'বার শুনলে তবু পারলে না। লজ্জিত হয়ে পড়ল বেচারা। প্রবাদটা ছিল—অতি বড় হ'য়ো না ঝড়ে পড়ে যাবে, অতি ছোট হ'য়ো না ছাগলেতে খাবে।

"বাজে সব" বলে উঠল ছোকরা।

এর পর গেলেন পুরন্দরবাবু, তাঁকে আরও দূরে পাঠানো হ'ল তিনিও হেরে গেলেন।

"বড্ড একঘেয়ে লাগছে" বললে কেউ কেউ।

"আচ্ছা এবার আমি সঙ্গে যাই" পারুল বললে।

"না, যুগলবাবু যাবেন এবার, এবার যুগলবাবুর পালা" সকলে চীৎকার করে' উঠল একযোগে।

১৩

যুগলবাবুকে একেবারে বাগানের শেষ সীমা পর্যন্ত যেতে হল, গিয়ে দেওয়ালের দিকে মুখ করে' দাঁড়াতে হ'ল একটি কোনে এবং যাতে ঘাড় ফিরিয়ে এদের দিকে না তাকায় তার জন্যে কটা-চুল সেই মেয়েটিকে পাহারা পাঠানো হল। যুগল সামলে নিয়েছিল এবং যথাসাধ্য চেষ্টা করছিল ওদের মতো করে' ওদের আনন্দে যোগ দিতে। সুতরাং সে অনড় হয়ে দেওয়ালের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল। কটাচুল মেয়েটি একটু দূরে দাঁড়িয়ে পাহারা দিতে দিতে আর সকলের সঙ্গে ইশারায় ইঙ্গিতে বলতে লাগল কি যেন সব। সকলেই রুদ্ধশ্বাসে প্রতীক্ষা করছিল এইবার মজার কিছু একটা হবে, ষড়যন্ত্র চলছে একটা। হঠাৎ কটাচুল মেয়েটি হাত নাড়তেই সবাই উঠে পালিয়ে গেল ঊর্দ্ধশ্বাসে।

"চলুন, চলুন আপনিও আসুন" অনেকে চুপি চুপি বললে পুরন্দরবাবুকে।

"কেন, ব্যাপার কি—"

"আঃ চেঁচাবেন না। উনি দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে থাকুন না যতক্ষণ পারেন, আমরা পালাই চলুন। শিমুল আসছে ওই দেখুন" কটা-চুল মেয়েটিও ছুটে পালিয়ে এল নিঃশব্দে! সকলে ছুটে পুকুরের ওধারে চলে গেল। অর্থাৎ যুগল যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেখান থেকে অনেক দূরে বিপরীত দিকে একেবারে। পুরন্দরবাবু সেখানে গিয়ে দেখলেন সুমিতা খুব রাগ করে' কঙ্কনা আর পারুলকে বকছে খুব।

"রাগ কোরো না দিদি, লক্ষ্মীটি"—পারুল তোলাবার চেষ্টা করছে তাকে।

"আচ্ছা বেশ, মা-কে আমি বলব না, কিন্তু আমি আর থাকছি না এখানে। ভদ্রলোককে দেওয়ালের ধারে দাঁড় করিয়ে এমনভাবে পালিয়ে আসাটা কি ভদ্রতা! কি মনে করবেন ভদ্রলোক, ছি, ছি, ছি।"

সুস্মিতা চলে গেল। সুস্মিতা যুগলের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হয়েছিল, কিন্তু আর কেউ হল না, বরং আরও নিষ্ঠুর হয়ে উঠল সবাই। ঠিক হ'ল যুগল ফিরে এলে কেউ যেন তাকে লক্ষ্য না করে। পুরন্দরবাবুও না।

"আসুন কানামাছি খেলা যাক"—কটাচুল মেয়েটি বললে।

মিনিট পনের পরে যুগল ফিরে এল। সত্যি অনেকক্ষণ সে দেওয়ালের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়েছিল। কানামাছি খেলা খুব জমে উঠেছে, চীৎকার হাসি হুল্লোড়ে মেতে উঠেছে সবাই। যুগল রাগে কাঁপতে কাঁপতে সোজা চলে গেল পুরন্দরবাবুর কাছে। তাঁর কামিজের হাতাটায় টান দিয়ে বললে— "শুনুন একবার।"

"কি মুশকিল, বার বার কত শুনবেন উনি আপনার কথা। আবার রুমাল চাই নাকি?"

যুগল পুরন্দরবাবুকে টেনে নিয়ে গেল একধারে।

"এবার নিশ্চয় আপনি, মানে আপনি ছাড়া—"

যুগলের দাঁতগুলো কড়মড় করে উঠল।

পুরন্দরবাবু শান্তকণ্ঠে বললেন—"ওরকম করবেন না আপনি, তাহলে ওরা আরও ক্ষেপে যাবে। আপনি চটছেন বলেই না ওরা চটাচ্ছে আপনাকে। বেশ সহজভাবে মিশুন না, সব ঠিক হয়ে যাবে।"

পুরন্দরবাবুর কথাগুলো যুগলের প্রাণে লাগল মনে হল, সে আর কোন উচ্চবাচ্য না করে' দলের মধ্যে ফিরে গিয়ে কানামাছি খেলায় যোগ দিলে, যেন কিছু হয় নি। মেয়েরাও আর তাকে বিশেষ বললে না কিছু। বিশ্বাসহন্ত্রী শিমুলের (কটা-চুল মেয়েটির) সঙ্গেও সে বেশ সহজভাবে মেশবার চেষ্টা করতে লাগল। পুরন্দরবাবু এটা কিন্তু লক্ষ্য করলেন যে যুগল পাকলের

সঙ্গে কথা কইতে সাহস করছে না, যদিও তার আশেপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে ছোঁক ছোঁক করে'। মনে হ'ল পারুলের ঘৃণা এবং অবজ্ঞাটা সে যেন তার প্রাপ্য বলেই মেনে নিয়েছে—এ নিয়ে প্রতিবাদ করার সাহস বা সামর্থ্য কোনটাই তার আর নেই যেন। কিন্তু এ সত্ত্বেও আবার তারা শেষকালে তাকে আর একটা খোঁচা দিতে ছাড়লে না।

লুকোচুরি খেলা হচ্ছিল। যুগল একটা ঝোপের আড়ালে গিয়ে লুকিয়ে ছিল। তারপর তার কি মনে হল সে দৌড়ে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে একটা ঘরে গিয়ে আলমারির পিছনে লুকোল। দেখতে পেয়ে গেল সবাই সেথা! শিমুল তার পিছু পিছু গিয়ে আস্তে আস্তে ঘরটায় শিকল তুলে দিয়ে পালিয়ে এল। তারপর সবাই চলে গেল আবার সেই বটগাছটার দিকে। যুগল অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে যখন দেখল কেউ তাকে খুঁজতে আসছে না, তখন সে জানালা দিয়ে মুখ বাড়াল। কাছে-পিঠে কাউকে দেখতে পেলে না। কপাট খুলতে গিয়ে দেখে কপাট বাইরে থেকে বন্ধ! চীৎকার করবার উপায় নেই—বিশ্বম্ভরবাবুর ঘুম ভেঙে যেতে পারে। কাছে-পিঠে চাকরবাকরও দেখতে পাওয়া গেল না একটিও। স্মিতাও ফিরে এসে ঘুমিয়ে পড়েছিল। সুতরাং বেচারাকে বন্দী হয়েই বসে থাকতে হল খানিকক্ষণ। অনেকক্ষণ পরে এক একে ফিরে এল সব।

যুগলবাবু আপনি এখানে বসে' কি করছেন? কি মজা হল এতক্ষণ। আমরা থিয়েটার থিয়েটার খেলছিলাম। পুরন্দরবাবু কি চমৎকার বক্তৃতা দিলেন! যুবকের পার্ট করলেন, এমন সুন্দর হয়েছিল।

"আপনি বসে' আছেন কেন? আসুন আপনাকে দেখেও মুগ্ধ হওয়া যাক একটু।"

"এখনও খেলা শেষ হয় নি নাকি?" হেমাঙ্গিনী দেবীর ঘুম ভেঙে গিয়েছিল, বাগানে বসে' মেয়েদের সঙ্গে চা খাবেন বলে' বেরিয়ে এলেন তিনি।

"কি হচ্ছে সব ?"

"দেখুন না, যুগলবাবু ওপরে বসে আছেন"—মেয়েরা আঙুল দিয়ে যুগলবাবুকে দেখিয়ে দিলে। রেগে টং হয়ে' গিয়ে তিনি জানালার ধারে দাঁড়িয়েছিলেন।

"তোমাদের সঙ্গে সমানে দাপাদাপি করতে কে পারে বল ?"

হেসে তিনি চাইলেন যুগলের দিকে। যুগলও হাসবার চেষ্টা করলে একটু। পুরন্দরবাবু আসাতে পারুল বিশেষ করে' কেন যে খুশী হয়েছে তা একটু পরে সে নিজেই প্রকাশ করলে পুরন্দরবাবুর কাছে—অবশ্য গোপনে।

কল্পনা পুরন্দরবাবুকে একটু আড়ালে ডেকে নিয়ে গেল। পারুল সেখানে অপেক্ষা করছিল তাঁর জন্য। পুরন্দরবাবুকে পারুলের কাছে রেখে কল্পনা চলে গেল।

পারুল তাঁকে বললে—"আমার একটি উপকার করবেন ? আপনি ছাড়া আর কেউ পারবে না, সেইজন্তে আপনি আসাতে বিশেষ করে' খুশী হয়েছি আমি।"

"কি উপকার ?"

"যুগলবাবু যতই বলুন আপনি যে তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু নন তা আমার বুঝতে বাকী নেই। আপনি একটি কাজ করুন দয়া করে', এইটি ফেরত নিয়ে যান, ওঁকে দিয়ে দেবেন কোন সময়ে। আমিও ওঁকে দিতে পারতুম, কিন্তু আমি আর জীবনে ওঁর সঙ্গে বাক্যালাপ করতে চাই না। আপনি একথাও জানিয়ে দিতে পারেন। সঙ্গে সঙ্গে এ-ও বলে' দেবেন ভবিষ্যতে উনি যেন জোর করে' কোন উপহার দিতে না আসেন কিম্বা আমার সঙ্গে মেশবার চেষ্টা না করেন। করলে অপমানিত হবেন শুধু। এই উপকারটি আমার করবেন ?"

ব্রেসলেটের বাক্সটা আঁচলের তলা থেকে বার করলে পারুল।

"আমাকে আর এর মধ্যে জড়িয়ো না, দোহাই" পুরন্দরবাবু সকাতরে বললেন।

"নড়াব না? কেন? আচ্ছা বেশ! বেশী করতে হবে না কিছু আপনাকে—"

হঠাৎ পারুলের গলা কেঁপে গেল, ঠোঁট ফুলে উঠল, জল এসে পড়ল চোখে। পুরন্দরবাবু বিব্রত হয়ে পড়লেন।

"না, না, আমি তা বলছি না—আচ্ছা দাও দাও—আমারও একটা বোঝাপাড়া আছে ওর সঙ্গে।"

"আমি জানি আপনার সঙ্গে ওর ভাব নেই" সুর বদলে গেল পারুলের, "হতেই পারে না ওরকম লোকের সঙ্গে ভাব। উনি এসেছেন আমাকে বিয়ে করতে! আস্পর্দ্ধা কম নয়। আপনি আজই ফিরিয়ে দেবেন এটা, কেমন? এ নিয়ে বাবার কাছে যদি কাঁদুনি গাইতে যান উনি, মজাটা দেখিয়ে দেব তাহলে।"

হঠাৎ পিছনের ঝোপটা থেকে নীল-চশমা-পরা সেই ছোকরা বেরিয়ে এল। "ওটা ফিরিয়ে দেওয়া আপনার কর্ত্তব্য"—ছোকরা বললে—"বুঝলেন, মানে নারীদের প্রতি কিছুমাত্র সম্মানবোধ থাকলে এরকম অবনমস্তির প্রতিবাদ করা প্রত্যেক ভদ্রলোকেরই কর্ত্তব্য" কিন্তু তার কথা শেষ হবার আগেই পারুল হ্যাঁচকা টান মেরে তাকে দূরে সরিয়ে নিয়ে গেল।

"মা গো মা! কি আক্কেল তোমার অজিত। স'রে যাও এখান থেকে! আড়ি পেতে কথা শুনতে লজ্জা করে না? তোমাকে দূরে দাঁড়িয়ে থাকতে বললাম—এ কি কাণ্ড—যাও এখান থেকে।"

পা ঠুকে এক ধমক দিতেই অজিত সরে' পড়ল। তবু পারুলের রাগ যায় না। রাগে গরগর করতে লাগল সে।

"এমন জালাতন করে এরা" হঠাৎ পুরন্দরের দিকে ফিরে সে বললে "আপনি বুঝবেন না ঠিক। ভারী অবুঝ সব। আপনার হয়তো মজা লাগছে, কিন্তু এমন লজ্জা করে' আমার—"

"একেই বিয়ে করবে ঠিক করেছ না কি" হেসে পুরন্দরবাবু জিগ্যেস করলেন।

"কক্ষনো না! এবে? আচ্ছা, কি করে ভাবতে পারলেন আপনি!"

হঠাৎ লজ্জায় চোখ মুখ লাল হয়ে উঠল তার; এ তার বন্ধু একজন। কি রকম অদ্ভুত সব বন্ধু দেখুন তো···বন্ধুত্ব করবার লোক পায় নি আর। দেখুন, আপনাকে ছাড়া আর কাউকে আমি এ কথা বলতে পারি না—এটা ফিরিয়ে দেবেন তো!"

"বেশ দেব।"

"বড্ড ভাল লোক আপনি, খুব ভাল লোক।"

দুচোখে আলো ঝলমল করে' উঠল তার। খাতাটা পুরন্দরবাবুকে দিয়ে বললে—"আজ অনেক গান গেয়ে শোনাব আপনাকে। অনেক—অনেক। সত্যি খুব ভাল গাইতে পারি আমি, জানেন? তখন মিথ্যে কথা বলেছিলাম। আবার আসবেন ত? আর একবার অন্তত আপনাকে আসতেই হবে—খুব খুশী হব তাহলে। আপনাকে সব কথা বলব পরে—সমস্ত খুলে বলব। আর কাউকে বলবেন না যেন—"

মুচকি হেসে ভুরু নাচিয়ে ছুটে চলে গেল সে।

পারুল তার কথা রেখেছিল, চা খাবার সময় দুটো গান তাঁকে শুনিয়েছিল। সুন্দর মিষ্টি চড়া গলা। চা খাবার জন্যে ভিতরে এসে পুরন্দরবাবু দেখলেন যুগল গম্ভীরভাবে বিশ্বম্ভরবাবু ও হেমাঙ্গিনীর সঙ্গে বসে কি কথা কইছে—হয়তো বিবাহপ্রসঙ্গেই আলোচনাটা সে শেষ করছে। দু'দিন পরে তো তাকে চলে যেতে হবে ম'মাসের জন্য। সবাই যখন ঢুকল সে কারও দিকে ফিরে তাকাল না, পুরন্দরবাবুর দিক থেকে বিশেষ করে' মুখটা ঘুরিয়ে নিল।

কিন্তু পারুল গান আরম্ভ করতেই উৎকর্ণ হয়ে উঠে দাঁড়াল সে। পারুলকে একটা কি জিগ্যেস করলে একটু হেসে, পারুল কোন উত্তর দিলে না। এতে কিন্তু এতটুকু দমল না যুগল, কিছুমাত্র ইতস্তত না করে' এমনভাবে সে সোজা গিয়ে পারুলের চেয়ারের পিছনে দাঁড়াল যেন ন্যায়তঃ ওইটেই তার স্থান এবং কোন কারণেই সেখান থেকে সে একচুল নড়বে না।

পারুলের গান শেষ হয়ে গেলে সে পুরন্দরবাবুর দিকে চেয়ে বললে—"আপনি একটা গান করুন না।"

"আগে গাইতাম, অনেকদিন গাই নি। আচ্ছা, দেখি চেষ্টা করে—"

পিয়ানোর কাছে গিয়ে বসলেন তিনি।

"মা, পুরন্দরবাবু গান গাইছেন" মেয়েরা আনন্দে কলরব করে' উঠল। কর্ত্তা গিন্নি বারান্দা থেকে ভিতরে এসে বসলেন। পুরন্দরবাবু রবীন্দ্রনাথের সেই গানটা ধরলেন—

মম যৌবন-নিকুঞ্জে গাহে পাখী

সখী, জাগো জাগো

পারুল তাঁর কাছেই এসে দাঁড়িয়েছিল। তার দিকে চেয়ে চেয়েই তিনি আবেগভরে গাইতে লাগলেন। আগেকার মতো গলা আর ছিল না, কিন্তু যা ছিল তাইতেই ব্যক্ত করে' দিলেন। সমস্ত প্রাণ ঢেলে গাইছিলেন তিনি—অন্তরের কামনা যেন মূর্ত্ত হয়ে উঠতে লাগল প্রতি ছত্রে ছত্রে। প্রতি কথায় ফুটে উঠতে লাগল আকুতিময় আবেগ, মর্ম্মের আবেদন, বাসনার রক্তোচ্ছ্বাস। প্রদীপ্ত চোখে পারুলের দিকে চাইতে চাইতে তিনি গাইতে লাগলেন

জাগো আকুল ফুল সাজে

জাগো মৃদু কম্পিত লাজে

মম হৃদয়-শয়ন মাঝে

শুন মধুর মুরলী বাজে

মম অন্তরে থাকি থাকি

সখী জাগো জাগো।

পারুলের সর্ব্বাঙ্গে একটা শিহরণ জাগল, ভয়ে একটু পিছিয়ে গেল সে, চোখ মুখ লাল হয়ে উঠল এবং সেই মুহূর্ত্তে পুরন্দরবাবুর মনে হল তার চোখে যেন সলজ্জ আমন্ত্রণের একটা আভাস দেখতে পেলেন তিনি। অন্য শ্রোতারাও মুগ্ধ ও বিস্মিত হয়ে গিয়েছিল। গান থেমে যাবার পর একটা নিবিড় স্তব্ধতা

যেন ঘনিয়ে এল ক্ষণকালের জন্য—সবাই যেন রুদ্ধশ্বাসে একটা কিসের প্রতীক্ষা করতে লাগল। পুরন্দরবাবু হঠাৎ লক্ষ্য করলেন স্মিতার চোখ দুটো যেন জল জল করছে।

বিশ্বম্ভরবাবু নীরবতা ভঙ্গ করলেন।

"গানটা বেশ, কিন্তু একটু, ওর নাম কি, যাকে বলে" গলা খাঁকারি দিয়ে থেমে গেলেন ভদ্রলোক। রবিঠাকুরের গানের বিরুদ্ধে কিছু বলবার সাহস সংগ্রহ করতে পারলেন না তিনি।

"পুরন্দরবাবুর গলা তো চমৎকার" হেমাঙ্গিনী দেবী সুরু করতে যাচ্ছিলেন কিন্তু যুগল তাঁকে কথা শেষ করতে দিলে না। সে এক কাণ্ড করে' বসল। হঠাৎ ছুটে গিয়ে পারুলের হাত ধরে হিড় হিড় করে' তাকে পুরন্দরবাবুর কাছ থেকে টেনে সরিয়ে নিয়ে এল, তারপর পুরন্দরবাবুর কাছে গিয়ে বললে—

"এক মিনিট, বাইরে চলুন তো একবার।"

ঠোঁট দুটো কাঁপছিল তার।

পুরন্দরবাবু দেখলেন বাইরে না গেলে এখনই হয়তো সে যা তা একটা কাণ্ড করে' বসবে। তাড়াতাড়ি তাকে নিয়ে বারান্দায় বেরিয়ে গেলেন।

"আপনাকে এখনই এই মুহূর্তে আমার সঙ্গে চলে যেতে হবে, বুঝলেন ?"

"কেন ? বুঝতে পারছি না ঠিক।"

উত্তেজিত কণ্ঠে যুগল বলতে লাগল, "মনে আছে, আপনি আমাকে সব কথা খুলে বলতে বলেছিলেন তখন আমি বলিনি, সময় হলে বলব বলেছিলাম ; এখন সময় হয়েছে, বুঝলেন, চলুন যাই। আর এখানে থাকা চলবে না।"

পুরন্দরবাবু ক্ষণকাল ভাবলেন, যুগলের মুখের দিকে চাইলেন একবার, তারপর রাজি হয়ে গেলেন।

"আচ্ছা বেশ, চলুন তবে।"

হঠাৎ চলে যাওয়ার প্রস্তাবে কর্তাগিন্নি ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়লেন, মেয়েরা আপত্তি করতে লাগল।

"আর এক কাপ করে' চা খেয়ে যান অন্তত" হেমাঙ্গিনী দেবী অনুরোধ করলেন।

যুগল একধারে মুখ কালো করে' দাঁড়িয়েছিল। বিশ্বম্ভরবাবু তার কাছে গিয়ে কাঁধে হাত দিয়ে প্রশ্ন করলেন, "হঠাৎ হ'ল কি ?"

"যুগলবাবু, কেন আপনি পুরন্দরবাবুকে নিয়ে যাচ্ছেন" মেয়েরা অনেকেই ক্ষুণ্ণকণ্ঠে প্রশ্ন করতে লাগল। পারুল যুগলবাবুর দিকে এমন একটা অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করলে যে সে সঙ্কুচিত হয়ে পড়ল, কিন্তু গোঁ ছাড়লে না।

পুরন্দরবাবু হেসে বললেন, যুগলবাবুর দোষ নেই। আমারই জরুরি একটা এনগেজমেণ্ট আছে এখন—আমি ভুলে গিয়েছিলাম—যুগলবাবু মনে করিয়ে দিলেন সেটা। আমাকে যেতেই হবে।"

পুরন্দরবাবু হাসিমুখে প্রত্যেকের কাছ থেকে বিদায় নিলেন। সুস্মিতাকে নমস্কার করলেন বিশেষ করে'।

"আপনি আসাতে ভারী আনন্দে কাটল দিনটা। আবার আসবেন" বিশ্বম্ভরবাবু বললেন ভদ্রতা করে'।

"এলে সত্যিই ভারী খুশি হব" হেমাঙ্গিনী দেবীও বললেন হেসে।

"পুরন্দরবাবু, আবার কবে আসবেন"—মেয়েরা অনেকে বলে উঠল।

গাড়ীতে যখন চড়েছেন তখন একটি কণ্ঠস্বরে একটা বিশেষ মিনতি যেন ধ্বনিত হয়ে উঠল—পুরন্দরবাবুর মনে হল।

"আসবেন আবার পুরন্দরবাবু, লক্ষ্মীটি—আসবেন নিশ্চয়।"

পুরন্দরবাবু মুখ বাড়িয়ে দেখলেন সেই কটা-চুল মেয়েটি।

১৪

কটা-চুল মেয়েটির মুখখানা বার বার মনে পড়তে লাগল, কিন্তু তবু পুরন্দরবাবুর মনের অন্ধকার যেন ঘুচল না। সমস্ত দিনটা যদিও হল্লা করেই কেটেছে—খেলা, হাসি, গান, অতগুলি মেয়ের সঙ্গ—অন্তরের গ্লানি কিন্তু এক মুহূর্তের জন্যেও অপসারিত হয় নি মন থেকে। গান গাইবার লোভটা কিছুতেই দমন করতে পারলেন না তিনি এবং সেই জন্যেই বোধহয় অত আবেগভরে গাইলেন।

"ছি ছি কি কাণ্ডটাই করলাম—এমনভাবে চলে আসাটা" মনে মনে আফশোষ হচ্ছিল কিন্তু তখনই নিজেকে সম্বরণ করলেন। অনুতাপ করাটা আত্মসম্মানহানিকর বলে' মনে হতে লাগল—তার চেয়ে বরং রাগ করা ঢের ভাল।

"গাড়োল!" যুগলের দিকে আড়চোখে চেয়ে মনে মনে বললেন তিনি।

যুগল নিস্তব্ধ হয়ে বসেছিল। একটি কথাও বলে নি—যা বলবে তার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিল বোধহয়। মাঝে মাঝে রুমাল দিয়ে ঘাড় মুখ মুছছিল। "ঘামছে ব্যাটা"—পুরন্দরবাবু স্বগতোক্তি করলেন।

একবার শুধু যুগল গাড়োয়ানকে জিগ্যেস করলে—"ঝড়টড় করবে না কি, মেঘ করেছে দেখছি—"

"উঠবে ঠিক। যা গুমোট করেছে সমস্ত দিন।"

ঈশান কোণে সত্যিই মেঘ উঠেছিল, একটা বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল।

বাড়ি পৌঁছতে বেশ রাত হয়ে গেল।

"আমি আপনার বাসাতেই যাব এখন কিন্তু" যুগল আগে থাকতে বলেই রেখেছিল।

"আসতে পারেন, কিন্তু আমার শরীরটা ভাল নেই।"

"আমি বেশীক্ষণ থাকব না।"

গাড়ি থেকে নেবেই যুগল চাকরটার খোঁজ করতে ভিতরে ঢুকে গেল।

"কেন, চাকর কি করবে এখন?"

যুগল কোন উত্তর দিলে না। পুরন্দরবাবু আলো জ্বালতেই যুগল চেয়ারে বসল। পুরন্দরবাবু জকুঞ্চিত করে' তার সামনে দাঁড়িয়ে রইলেন। মনের বিরক্তি যথাসাধ্য গোপন করে' শেষে বললেন—"দেখুন, সব কথা আমি জানতে চেয়েছিলাম বটে, কিন্তু আর আমার কিছু জানবার প্রবৃত্তি নেই। আমাদের মধ্যে জানাজানির আর কোন প্রয়োজন আছে বলে'ই মনে হচ্ছে না। সুতরাং আপনি এখন বাড়ি যান, আমি খিল বন্ধ করে শুয়ে পড়ি। রাত হয়ে গেছে।"

"আমাদের মধ্যে বোঝাপড়াটা কিন্তু হওয়া দরকার যে" পুরন্দরবাবুর মুখের দিকে চেয়ে যুগল বেশ শান্তভাবেই কথাগুলো বললে।

"বোঝাপড়া! কিসের বোঝাপড়া? এই বলবার জন্তে আপনি ডেকে নিয়ে এলেন আমাকে?"

'হ্যাঁ—এই।"

"বোঝাপড়া করবার কিছু নেই তো—বোঝাপড়া অনেকদিন আগেই হয়ে গেছে।"

"ও, তাই না কি" বলে যুগল চুপ করে' গেল।

পুরন্দরবাবুও কোন উত্তর না দিয়ে পরিক্রমণ শুরু করলেন। পাপিয়ার মুখখানা মনে পড়ছিল বারবার। অনেকক্ষণ নীরবতার পর হঠাৎ তিনি প্রশ্ন করলেন—"কি বোঝাপড়া করতে চান আপনি?"

যুগল চেয়ে চেয়ে দেখছিল তাঁকে এতক্ষণ।

"আর ওখানে আপনি যাবেন না" সহসা করুণ কণ্ঠে বলে' উঠল সে এবং চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

"ও, আপনি ওই সব ভাবছেন নাকি" পুরন্দরবাবু হেসে ফেললেন, "আচ্ছা, আজ সমস্ত দিন আপনি কি কাণ্ডটা করলেন বলুন দেখি" খুব একটা উপদেশাত্মক বক্তৃতার সুরে আরম্ভ করতে যাচ্ছিলেন কিন্তু হঠাৎ সুরটা বদলে অনুতপ্ত কণ্ঠে বললেন—"আজ আমিও নিজেকে যতটা হীন করেছি এতটা হীন বোধহয় জীবনে কখনও করি নি—প্রথমত আপনার সঙ্গে যেতে রাজি হ'য়ে—দ্বিতীয়ত ওখানে ওদের সঙ্গে যা হ'ল...এত ছেলেমানুষি যা তা কাণ্ড সব...নিজেকে ওসবের সঙ্গে জড়িয়ে লজ্জা হচ্ছে আমার...ছি ছি... আত্মবিস্মৃতি ঘটেছিল...আর আপনিও যে কাণ্ডটা করলেন তা কি কোন ভদ্রলোক করে'—আমাকে অমনভাবে অপ্রস্তুত করবার মানে কি—কিন্তু আপনাকে কিছু বলছি না আমি সে জন্যে—আমার দুর্বুদ্ধির জন্যে শাস্তি পাওয়া উচিত—ভয় নেই আমি আর যাব না সেখানে...ওদের সম্বন্ধে কোন আগ্রহ নেই আমার।"

সদম্ভে বক্তব্য শেষ করলেন তিনি।

"সত্যি? সত্যি বলছেন?" যুগল তার আনন্দ যেন আর চাপতে পারছিল না। পুরন্দরবাবু তার দিকে ঘৃণাব্যঞ্জক একটা দৃষ্টি নিক্ষেপ করে' আবার পদচারণা সুরু করলেন।

"আপনি তাহলে আবার বিয়ে করে' সুখী হবেন ঠিক করে' ফেলেছেন?"

"হ্যাঁ।"

"তাতে আমার কি" পুরন্দরবাবু ভাবছিলেন," ও যদি বোকামি করে' উচ্ছন্ন যায় আমার কি এসে যায় তাতে! আমি বড় জোর ঘৃণা করতে পারি, যদিও ঘৃণারও উপযুক্ত ও নয়।"

"স্বামীর ভূমিকায় অভিনয় করাই তো আমার কাজ" কাচুমাচু হ'য়ে

একটু হেসে যুগল বললে, "আপনিই তো একথা বলেছিলেন একদিন। আপনার একটি কথাও ভুলি না আমি, যা বলেন সব মনে থাকে।"

এক বোতল মদ এবং দুটো গ্লাস নিয়ে চাকরটা ঘরে ঢুকল।

"ও ওই জন্যেই চাকরের খোঁজ হচ্ছিল! এখন আপনাকে মদ খেতে দেব না আমি—"

"মাপ করবেন পুরন্দরবাবু, না খেলে পারব না আমি। আমাকে ছোটলোক বলে' ভাবুন ক্ষতি নেই—কিন্তু খেতে দিন আমাকে।"

"আমার শরীর ভাল নেই, এখন আমি শুতে যাই।"

"হ্যাঁ এই যে—এখনি এখনি—গলাটা ভিজিয়ে নি শুধু একটু।"

তাড়াতাড়ি সে আধ গ্লাসটাক খেয়ে ফেল্লে চোঁ করে' দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই, বাকী অর্দ্ধেকটা শেষ করলে বসে'। তারপর সস্নেহে চাইলে সে পুরন্দরবাবুর দিকে। চাকরটা বেরিয়ে গেল।

"আঃ—" পুরন্দরবাবু অস্ফুট কণ্ঠে বিরক্তি প্রকাশ করলেন।

"দেখুন, ওর মেয়ে-বন্ধুগুলোই ওকে" যুগল বাগিয়ে সুরু করল আবার!

"কি? ও, তাদের কথাই ভাবছেন এখনও!"

"ওর মেয়ে-বন্ধুগুলোই ভাংচি দিচ্ছে! ওর বয়সই বা কি...তা ছাড়া মেয়েদের একটু আধটু আদিখ্যেতা তো থাকবেই। ভারী চমৎকার! আমি কেনা গোলাম হয়ে থাকব ওর! তবু মন পাব না বলছেন? গাড়ি, বাড়ি, গয়না, সামাজিক সম্মান এসব পেলেও বদলাবে না? নিশ্চয় বদলাবে।"

"ওকে ব্রেসলেট্ জোড়া ফেরত দিতে হবে মনে পড়ল পুরন্দরবাবুর! ভ্রূকুঞ্চিত করে' পকেটে হাত দিয়ে দেখলেন সেটা আছে কিনা।

"আপনি বলছেন আমি সুখী হব ঠিক করেছি কি না? না ঠিক করে উপায় কি! আর বিয়ে না করলে সুখী হবই বা কি করে! বলুন, আপনিই বলুন"—করুণকণ্ঠে বলতে লাগল সে—"আমার গতি কি হবে, তাহলে ভেবে দেখুন"—বোতলটা দেখিয়ে বললে—"এতেই ডুবে যেতে হবে শেষে, কিন্তু

এ তো কিছু নয়, যে নরক আমাকে টানছে তার শতাংশের একাংশও নয়। বিয়ে করে' অন্য একটা জীবনকে যদি আঁকড়ে ধরতে না পারি তাহলে ডুবে যাব আমি। নূতন একটা আদর্শ পেলেই ঠেলে উঠব আবার দেখবেন।"

"কিন্তু এসব কথা আপনি আমাকে বলছেন কেন শুধু শুধু" বলেই পুরন্দরবাবু হেসে ফেললেন। তার পর বললেন, "আচ্ছা আমাকে ওখানে টেনে নিয়ে গেলেন কেন আপনি! উদ্দেশ্যটা কি ছিল আপনার?"

"পরখ করা..." বলেই যুগল বিব্রত হয়ে পড়ল!

"কি পরখ করা?"

"ফলাফলটা।...মানে, এই হপ্তাখানেক থেকে ওখানে যাচ্ছি তো," একটু বিব্রত হয়ে পড়ল সে—"আপনাকে দেখে সেদিন হঠাৎ মনে হল পর-পুরুষের সঙ্গে ও কি রকম ব্যবহার করে' তা তো জানা নেই! পরীক্ষা করে' দেখলে হয় একদিন। বোকামি আর কি। কোন দরকার ছিল না। অত্যন্ত বেশী আশা করে ছিলাম...আমার চরিত্র এমনই—কি আর বলব বলুন...মানে—"

হঠাৎ মুখ তুলে চাইলে সে। পুরন্দরবাবু দেখলেন—চোখ মুখ লাল হয়ে উঠেছে তার।

"সত্যি কথা বলছে তো" পুরন্দরবাবু ভাবলেন এবং মনে মনে বিস্মিত হ'য়ে গেলেন—

"বুঝতে পারছি না ব্যাপারটা ভাল করে'—"

"ছেলেমানুষি আর কি! তাছাড়া ওর ওই মেয়ে বন্ধুগুলো! ঝোঁকের মাথায় আপনার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে' ফেলেছি মাপ করবেন। আর কখনও এমন হবে না।"

"আমি সেখানে আর যাবই না।"

"হ্যাঁ, সেইজন্যেই আশা করছি যে এ রকমটা আর কখনও ঘটবে না।"

পুরন্দরবাবু হেসে বললেন—"কিন্তু আমি ছাড়া আরও পুরুষ আছে তো সংসারে—তাদের সামলাবেন কি করে?"

যুগলের মুখ লাল হয়ে উঠল।

"আপনার মুখে একথা শুনে দুঃখিত হলাম পুরন্দরবাবু। পারুলের সম্বন্ধে আমার ধারণা মোটেই হীন নয়।"

"ক্ষমা করবেন, আমি এমনি ঠাট্টা করছিলাম। একটা ব্যাপারে খুব আশ্চর্য্য লাগছে কিন্তু। আমার আকর্ষণী শক্তি সম্বন্ধে আপনার ধারণা যেমন প্রচণ্ড, আমার চরিত্রের ওপর আপনার বিশ্বাসও তেমনি অগাধ দেখছি।"

হ্যাঁ ঠিকই তাই···অতীতে এর প্রমাণ পেয়েছি যে—"

"আপনি এখনও তাহলে আমাকে একজন চরিত্রবান পুরুষ বলে' মনে করেন!"

অন্য সময়ে নিজের এ প্রশ্নে নিজেই চমকে উঠতেন পুরন্দরবাবু।

"আমি বরাবরই তাই ভেবেছি আপনাকে"—চোখ নীচু করে' যুগল বললে।

"হ্যাঁ, তাতো ঠিকই—তা আমি বলছি না,—আমি বলছিলাম যে অতীতে আমার সম্বন্ধে যে ধারণা ছিল তা এখনও—মানে—"

"হ্যাঁ এখনও তা ঠিক আছে।"

"আপনি এবার যখন কোলকাতায় এসেছিলেম তখনও আমার সম্বন্ধে ভাল ধারণা ছিল আপনার?"

পুরন্দরবাবু কৌতূহল দমন করতে পারলেন না কিছুতেই।

"হ্যাঁ। আমি বরাবরই আপনাকে শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি বলেই জানি।"

যুগল চোখ তুলে অত্যন্ত সপ্রতিভভাবে চাইলে পুরন্দরবাবুর দিকে। পুরন্দরবাবুই ভয় পেয়ে গেলেন হঠাৎ—কিছু একটা হয়ে পড়ুক এ তিনি চান না—যে ভদ্র আবরণটা দু'জনের মধ্যে এখনও আছে তা সরিয়ে দেবার

যোটে ইচ্ছে নেই তাঁর। ভয়ে হ'তে লাগল আবরণটা খসে' পড়ে বুঝি!

"আমি আপনাকে ভালবাসতাম পুরন্দরবাবু" যেন এইবার সমস্ত খুলে বলবে এই রকম একটা ভাব করে' যুগল স্থরু করলে "বর্দ্ধমানে যখন ছিলেন আপনি, সত্যিই আমি আপনাকে ভালবাসতাম। আপনি হয়তো লক্ষ্য করেন নি।"

যুগলের গলা কাঁপতে লাগল, পুরন্দরবাবুর আরও ভয় হ'ল—"আপনার তুলনায় সত্যিই নগণ্য ছিলাম আমি, লক্ষ্য করবার কথাও নয়। তাছাড়া প্রয়োজনও ছিল না কোন। গত ন বছর আপনার কথা কিন্তু বার বার মনে পড়েছে আমার, কারণ আমার জীবনে ওই বছরটাই সব চেয়ে সুখের ছিল। ওর চেয়ে ভাল সময় আর আসে নি" (যুগলের চোখ দুটো চক চক করতে লাগল) "আপনার অনেক রসিকতা, অনেক কবিতার লাইন, অনেক জিনিস মনে পড়ত আমার। আপনি যে একজন উদার-হৃদয় শিক্ষিত ব্যক্তি—শুধু শিক্ষিত নয়, উচ্চশিক্ষিত চিন্তাশীল ব্যক্তি—এ সম্বন্ধে আমার কোন সন্দেহ ছিল না—আপনিই একবার বলেছিলেন—"মহৎ প্রেরণার উৎস মহৎ প্রতিভা নয়, মহৎ হৃদয়"—আপনি হয়তো ভুলে গেছেন—কিন্তু আমি ভুলি নি। আপনারও হৃদয় যে মহৎ সে সম্বন্ধে নিঃসংশয় ছিলাম আমি তাই সমস্ত সত্ত্বেও আপনার উপর বিশ্বাস হারাই নি।"

হঠাৎ তার থুতনিটা কাঁপতে লাগল। পুরন্দরবাবু অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়লেন। যেমন করে' হোক কথার মোড়টা ফেরাতে হবে। কিন্তু সহসা নিজেই সংযম হারিয়ে ফেললেন তিনি।

"থাক থাক হয়েছে হয়েছে, কি বকছেন যা তা" এই কথা বলতে বলতেই হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন "এ সব কথা বলবার মানে কি—বারবার বলছি শরীর ভাল নেই আমার—তবু আপনি ক্রমাগত ভ্যান ভ্যান করে' বকেই চলেছেন—বকে' বকে' আমাকে উন্মাদ প্রায় করে তুলেছেন, তবু আপনার তৃপ্তি হচ্ছে না—ইঙ্গিতে ইশারায় ঠারে ঠোরে এক অজানা অন্ধকারে ক্রমাগত

ঠেলে নিয়ে চলেছেন আমাকে—অথচ সব মিথ্যে, ধাপ্পাবাজি, জুয়াচুরি বাড়াবাড়ি—এইটেই সব চেয়ে মারাত্মক—বাড়াবাড়ি—বাড়াবাড়ি। একটুও সত্যি নয়—সব বাজে মিথ্যে কথা। দুজনেই সমান পাজি আমরা, দুজনেই অন্ধকারের ঘৃণ্য জীব। একটুও ভালবাসেন না আপনি আমাকে, সমস্ত অন্তর দিয়ে ঘৃণা করেন—বলেন তো এখুনি প্রমাণ করিয়ে দিতে পারি সে কথা। আপনি মিছে কথা বলছেন। আপনি যে আমাকে আজ ওখানে জোর করে' টেনে নিয়ে গেলেন তা আপনার ভবিষ্যৎ স্ত্রীর সতীত্ব পরীক্ষ করবার জন্যে নয়—বাঁকা পথে প্রতিশোধ নেবার জন্যে। ওই মেয়েটাকে দেখিয়ে আমার হিংসা প্রবৃত্তিটাকে উত্তেজিত করে আপনি উপভোগ করতে চাইছিলেন সেটা—"দেখেছেন কি রকম খাসা মেয়ে জোগাড় করেছি এবার। আমারই হবে ও। কি করতে পারেন এবার করুন"—এই ছিল আপনার মনোভাব! আপনার অজ্ঞাতসারেই আপনি দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করেছিলেন আমাকে। ঘৃণা না করলে কেউ কাউকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করে না, সুতরাং আপনি যে আমাকে ঘৃণাই করেন তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই আমার।"

চীৎকার করতে করতে সমস্ত ঘরে যেন ছুটোছুটি করতে লাগলেন তিনি। আত্মসংযম হারিয়ে যুগলের কাছে নিজেকে যে এমনভাবে হীন করে' ফেললেন এই ভেবে অত্যন্ত খারাপও লাগছিল তাঁর কিন্তু সামলাতে পারছিলেন না নিজেকে।

"আপনার সঙ্গে মিটমাট করে' ফেলাই উদ্দেশ্য ছিল আমার পুরন্দরবাবু!"

প্রায় অস্ফুট কণ্ঠে যুগল বলে' উঠল হঠাৎ তার থুত্নিটা কাঁপতে লাগল।

ভয়ঙ্কর রাগ হল পুরন্দরবাবুর—তাঁর মনে হল এত অপমান বুঝি তাঁকে জীবনে কেউ কখনও করে নি।

"আবার আমি আপনাকে বলছি আমার শরীর ভাল নেই—এমন করে' লাগবেন না আমার পিছু। আপনি কেন লাগছেন তাও জানি, আপনি

আশা করছেন যে আমাকে ক্ষেপিয়ে তুলে একটা ভয়ঙ্কর স্বীকারোক্তি বার করে' নেবেন আমার মুখ থেকে। কিন্তু জেনে রাখুন ভিন্ন জগতের লোক আমরা এবং···এবং আমাদের দুজনের মাঝখানে একটা চিতা প্রসারিত রয়েছে" —হঠাৎ বলে' ফেললেন তিনি এবং বলেই বুঝলেন কি করে' ফেলেছেন।

"আপনি জানেন" হঠাৎ যুগলের মুখখানা বিবর্ণ ও বিকৃত হয়ে গেল— "আপনি জানেন আমার কাছে সে চিতার অর্থ কি—"

হাস্যকর অথচ ভয়ঙ্কর একটা ভঙ্গীতে পুরন্দরবাবুর দিকে এগিয়ে গিয়ে নিজের বুক চাপড়ে সে বলে উঠল "এইখানে জ্বলছে সে চিতা, আমরা দুজনেই সে চিতার ধারে দাঁড়িয়ে আছি তা ঠিক, কিন্তু আমার দিকেই আঁচটা লাগছে বেশী"—পাগলের মতো বুক চাপড়াতে চাপড়াতে বলতে লাগল—"অনেক বেশী, অনেক বেশী—"

হঠাৎ অত্যন্ত জোরে ইলেকট্রিক ঘণ্টাটা বেজে ওঠাতে দুজনেই প্রকৃতিস্থ হল। এত জোরে বাজতে লাগল যেন কেউ ঘণ্টাটা ভেঙে ফেলতে চায়।

"কে এলো? আমার কাছে যারা আসে তারা কখনও এত জোরে ঘণ্টা বাজায় না তো—"

পুরন্দরবাবু চকচকিয়ে গেলেন একটু।

"আমার কাছেও" মৃদুকণ্ঠে যুগলও বললে, একটু ভয়ে ভয়ে। ঘণ্টার আওয়াজের চোটে সে-ও আত্মস্থ হয়েছিল।

ভ্রূকুঞ্চিত করে' পুরন্দরবাবু এগিয়ে গেলেন এবং কপাটটা খুললেন।

"আপনিই কি পুরন্দরবাবু?" কনকনে জোর গলায় প্রশ্ন করলে কে একজন।

"হ্যাঁ, কি চাই?"

"যুগল পালিত এখানে আছেন শুনলাম। তাঁর সঙ্গে এখনি দেখা করতে চাই আমি।"

পুরন্দরবাবু কম বয়সী ছোকরাটিকে আপাদমস্তক দেখলেন একবার। যদিও তাঁর ইচ্ছে করছিল শাসিয়ে ছোকরাকে দূর করে' দিতে —কিন্তু তা আর করলেন না।

"আসুন, এই যে যুগলবাবু এখানেই আছেন—"

ছোকরাটির বয়স সত্যিই কম, উনিশ কুড়ির বেশী হবে না, কমও হতে পারে। তার মুখের কিশোর শ্রী, স্বচ্ছ চোখের দৃষ্টি, দৃপ্ত উন্নত মস্তক দেখলে তাই মনে হয়। সাধারণ ধুতি পাঞ্জাবীতেই চমৎকার মানিয়েছিল তাকে। একটু লম্বা ধরণের, মাথায় কোঁকড়ান চুল, বড় বড় কালো চোখে নির্ভীক দৃষ্টি। সুশ্রী ছেলেটি। খুব গম্ভীর ভাবে ঘরে এসে ঢুকল সে।

"আপনিই যুগলবাবু? ও—"

বেশ গম্ভীর ভাবে সে যুগলবাবুর আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করলে। "ও" কথাটাও এমনভাবে বললে যে যুগল ভড়কে গেল একটু।

পুরন্দরবাবু আভাসে যেন ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন, যুগলের মনেও কিসের যেন ছায়াপাত হল একটা। চোখে মুখে আশঙ্কা ঘনিয়ে এল তার। আচরণে কিন্তু সে কোন বিচলিতভাব প্রকাশ করলে না। বেশ গম্ভীরভাবেই বললে—"আপনার সঙ্গে পরিচয়ের সৌভাগ্য আমার ইতি-পূর্ব্বে হয়েছে বলে তো মনে হচ্ছে না। আমার সঙ্গে আপনার কি দরকার থাকতে পারে? ভুল করেন নি তো?"

"আগে আমার কথাটা শুনে নিন, তারপর যা বলবার বলবেন"— বেশ একটু অভিভাবকী ভঙ্গিতে কথা ক'টি বলে ছেলেটি টেবিলে মদের বোতল ও গ্লাস দুটোর দিকে চেয়ে রইল খানিকক্ষণ। বেশ খানিকক্ষণ সে দিকে চেয়ে থাকবার পর যুগলের দিকে ফিরে শান্ত কণ্ঠে বললে— "দিলীপ হালদার—"

"দিলীপ হালদার মানে?

"আমিই। আমার নাম শোনেন নি ?"

"না।"

"ও, শোনবার কথাও নয় আপনার। একটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কথা আছে আপনার সঙ্গে। বসব ? বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।"

"বসুন বসুন।"

পুরন্দরবাবু বলে' উঠলেন, কিন্তু তার আগেই ছোকরা একটা চেয়ার টেনে বসেছিল। পুরন্দরবাবুর বুকের ব্যথা যদিও বাড়ছিল ক্রমশঃ, কিন্তু এই ছেলেটীর আকস্মিক আগমন, সপ্রতিভ ব্যবহার বেশ লাগছিল তাঁর। তার তরুণ সুন্দর মুখশ্রীতে পারুলকে মনে পড়ছিল।

"আপনিও বসুন না" যুগলের দিকে চেয়ে ছেলেটি বললে এবং মাথা নেড়ে একটা চেয়ার দেখিয়ে দিলে।

"না, আমি বেশ আছি।"

"ক্লান্ত হয়ে পড়বেন। পুরন্দরবাবু, আপনি যদি থাকতে চান থাকুন।"

"আমি আর যাব কোথায় নিজের বাসা থেকে—"

"আপনার যা খুশী। সত্যি কথা বলতে কি, আপনি থাকলে বরং ভালই হয়। পারুলের কাছে আপনার সম্বন্ধে যা শুনেছি তাতে—"

"পারুলের কাছে ? বাঃ ! কখন শুনলেন এর মধ্যে ?"

"আপনারা চলে আসবার ঠিক পরেই। আমি সেখান থেকেই সোজা আসছি। যুগলবাবুকে একটা কথা বলতে চাই—" যুগলের দিকে ফিরে তারপর বললে—"আমরা—মানে পারুল আর আমি—ছেলে বেলা থেকে পরস্পরকে ভালবেসে আসছি এবং ঠিক করেছি যে আমরা বিয়ে করব। আপনি হঠাৎ আমাদের দুজনের মাঝখানে এসে হাজির হয়েছেন, আমি বলতে এসেছি যে আপনি সরে পড়ুন। আমাদের এ অনুরোধ রক্ষা করতে কি আপত্তি আছে আপনার ?"

"নিশ্চয় ! বিশেষ আপত্তি আছে।"

"ও, বাবা, তাই না কি ?"

ছেলেটি গম্ভীর ভাবে চেয়ারে ঠেস দিয়ে পায়ের উপর পা তুলে দিলে।

"আমি আপনাকে চিনি না, সুতরাং আপনার সঙ্গে এসব আলোচনার কোন মানে নেই।"

এই বলে' যুগল বসে পড়াটাই সমীচীন মনে করলে।

"বলেছিলাম আপনি ক্লান্ত হয়ে পড়বেন। এখনি তো আপনাকে বললাম যে আমার নাম দিলীপ হালদার—পারুল আর আমি দুজনেই দুজনের কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সুতরাং আমি আপনাকে চিনি না' বলে' ব্যাপারটাকে উড়িয়ে দেওয়াটা কি ঠিক হচ্ছে ? আমার সব বক্তব্যও শোনেন নি আপনি এখনও। তাছাড়া আমার কথা না হয় ছেড়েই দিন—আপনি পারুলকে যে এমন বেহায়ার মতো জ্বালাতন করছেন রোজ—এই কথাটাই তো বিশেষ করে আলোচনাযোগ্য।"

একটি একটি করে' মুখ টিপে টিপে কথাগুলি এমন ভাবে সে বললে যে মনে হল যেন নিতান্ত বাধ্য হয়েই অপ্রিয় কথাগুলো বলতে হচ্ছে তাকে।

"দেখ ছোকরা"—আত্মবিস্মৃত যুগল চেঁচিয়ে উঠল। কিন্তু ছোকরা তৎক্ষণাৎ থামিয়ে দিলে তাকে।

"দেখুন, অন্য সময় হ'লে আপনার ওই "ছোকরা" কথায় আপত্তি করতুম আমি। এখন করব না, কারণ একথা আপনাকেও মানতে হবে যে কম বয়সটাই আমার একমাত্র মূলধন এক্ষেত্রে। আজ সকালে যখন পারুলকে ব্রেসলেট উপহার দিচ্ছিলেন তখন আপনিও ছোকরা হতে পারলে বেঁচে যেতেন।"

"মহা ফাজিল তো" পুরন্দরবাবু মনে মনে বললেন।

"যাই হোক" যুগল উত্তর দিলে "আপনার সঙ্গে তর্ক করব না আমি। আমার মনে হচ্ছে আপনি যে সব কারণ দেখাচ্ছেন তা আপনার মনগড়া,

ও সব নিয়ে কোন কথা আর আমি কইব না আপনার সঙ্গে, কইলে নিতান্ত ছেলেমানুষি হবে তা আমার পক্ষে। কাল আমি বিশ্বম্ভরবাবুর কাছে গিয়ে খোঁজ করব। আপনি এখন যেতে পারেন।"

"দেখছেন কি রকম লোক" বলে' দিলীপ পুরন্দরবাবুর দিকে চাইলে। "আজ এত অপমানিত হয়েও লজ্জা হয় না ওঁর। উনি আমাদের নামে নালিশ করতে ওই বৃদ্ধ ভদ্রলোকের কাছে যেতে চান আবার! এর থেকে কি প্রমাণ হয়? প্রথমত প্রমাণ হয় যে আপনি অত্যন্ত আত্মসম্মানহীন একগুঁয়ে লোক, দ্বিতীয়ত প্রমাণ হয় যে আপনি এই বর্ব্বর সমাজের নিষ্ঠুরপ্রথার সুযোগ নিয়ে টাকার লোভ দেখিয়ে জোর করে' পারুলকে বিয়ে করতে চাইছেন তার মতের বিরুদ্ধে। পারুল আপনাকে ঘৃণা করে এইটুকু জানামাত্রই থেমে যাওয়া উচিত আপনার, সে তো আপনার ব্রেসলেট পর্য্যন্ত ফেরত দিয়েছে—এর পরেও যাবেন আপনি?"

"ব্রেসলেট আমাকে ফেরত দেয় নি সে। ওসব একদম বাজে কথা।"

"ফেরত দেয় নি! আপনি বলতে চান পুরন্দরবাবুর কাছ থেকে আপনি ব্রেসলেট ফেরত পান নি?"

"আঃ, ডোবালে দেখছি" মনে মনে কথাগুলো উচ্চারণ করে' পুরন্দরবাবু ভ্রূকুঞ্চিত করে' বললেন—হ্যাঁ, পারুল আমাকে এইটে ফেরত দিতে দিয়েছিল যুগলবাবু, আমি নিতে চাই নি, কিন্তু সে কিছুতেই ছাড়লে না···এই নিন··· এমন মুস্কিলে ফেলেছেন আমাকে আপনারা।"

ব্রেসলেটের বাক্সটা বার করে' পুরন্দরবাবু টেবিলের উপর রাখলেন। যুগল বজ্রাহতবৎ নিস্পন্দ হয়ে বসে রইল।

"আপনি এটা এতক্ষণ দেন নি যে" একটু রূঢ়কণ্ঠেই দিলীপ বলে' উঠল।

"হয়ে ওঠে নি। মনেই ছিল না।"

"অদ্ভুত কাণ্ড।"

"কি বললেন?"

"একটু অদ্ভুত নয় ? যাক গে…"

পুরন্দরবাবুর ইচ্ছে করতে লাগল উঠে ছোঁড়ার কান মলে' দেন, কিন্তু তিনি হেসে ফেললেন, ছোকরাও হাসতে লাগল। যুগল কিন্তু একটুও হাসল না, তার অবস্থা ভয়ানক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। পুরন্দরবাবু যখন দিলীপের দিকে চেয়ে হেসে ফেললেন তখন যদি তিনি যুগলের দিকে দৃষ্টি ফেরাতেন তাহলে বুঝতে পারতেন কি ভয়াবহ কাণ্ড হচ্ছে তার মনের ভিতর। কিন্তু তবুও পুরন্দরবাবুর মনে হল, এই দুঃসময়ে যুগলের পক্ষ নেওয়া উচিত।

"দেখুন দিলীপবাবু, একটা কথা শুনুন আমার" বন্ধুভাবে আরম্ভ করলেন তিনি "এ বিষয়ে অন্য কোন আলোচনা না করেও একটা কথা বলতে চাই শুধু আমি। পারুলের পাণি-প্রার্থী হিসেবে যুগলবাবুর একাধিক যোগ্যতা আছে—প্রথমত ওঁরা যুগলবাবুকে আগে থাকতে চেনেন, ওঁর সম্বন্ধে সব জানেন, দ্বিতীয়ত উনি বড় চাকরি করেন একটা, তৃতীয়ত ওঁর বিষয়সম্পত্তিও যথেষ্ট আছে—সুতরাং আপনার মতো একজন প্রতিদ্বন্দ্বীর আকস্মিক আবির্ভাবে উনি আশ্চর্য্য হয়ে গেছেন একটু। আপনিও হয়তো খুব উপযুক্ত পাত্র—কিন্তু আপনার বয়স এত কম যে উনি আপনার কথা বিশ্বাস করতে ইতস্তত করছেন…তাই এ বিষয়ে আপনার সঙ্গে আলোচনা করতে না চাওয়াটা স্বাভাবিক ওঁর পক্ষে।"

"আপনার বয়স এত কম—মানে কি বলতে চান আপনি! আমি উনিশ বছরে পড়েছি…আইনত আমার বিয়ে করবার বয়স হয়েছে।"

"তা হয়েছে। কিন্তু কোন্ মেয়ের বাবা আপনার হাতে কন্যাসম্প্রদান করবে বলুন? আপনি ভবিষ্যতে হয়তো কোটিপতি হবেন, কিম্বা মানব-জাতির মুক্তির পথ আবিষ্কার করবেন কিন্তু এখন আপনাকে দেখে কোন মেয়ের বাপই পাত্র হিসেবে পছন্দ করবে কি না সন্দেহ। উনিশ বছর বয়সে লোকে নিজের দায়িত্বই নিতে পারে না, আর আপনি আর একজনের দায়িত্ব

নিতে যাচ্ছেন এবং সেও আপনার মতো ছেলেমানুষ। এইটেই কি উচিত? আমার যা মনে হচ্ছে খোলাখুলি বলছি বলে' রাগ করবেন না, আপনি নিজেই আমাকে মধ্যস্থতা করতে ডাকলেন বলে' বলছি।"

'দিলীপ একটু বিস্ময়ে চেয়ে রইল পুরন্দরবাবু দিকে। তারপর বলল "আপনার মুখ থেকে এসব কথা শুনব প্রত্যাশা করিনি। পারুল যা বললে আপনার সম্বন্ধে তাতে আমার একটু অন্য রকম ধারণা হয়েছিল এখন দেখছি আপনারা সবাই একরকম, সব শিয়ালেরই এক রা। আপনাদের ওসব জ্ঞানগর্ভ যুক্তি অনেকই শুনেছি কিন্তু তা মানবার উপায় নেই, কারণ একটা প্রবলতর যুক্তি আমাদেরও আছে।"

"কি সেটা?'

"আমরা পরস্পরকে ভালবাসি এবং অনেকদিন থেকে বাসছি। সুতরাং আপনার ওসব যুক্তি শুনব না আমরা। আপনার বয়স কত হল—পঞ্চাশ?"

"সে জেনে আর কি হবে আপনার। যা বলবেন বলুন।"

"মাপ করবেন, কৌতুহলটা সামলাতে পারলাম না। যাক্ গে—হ্যাঁ—দেখুন আপনি যে এখনই বলছিলেন—আমি কোটিপতি বা মহামানব কিছুই হব না হয় তো—কিন্তু বিয়ে করে যে সংসার চালাতে পারব সে বিষয়ে আমার কিছু সন্দেহ নেই। এখন অবশ্য আমি নিঃস্ব, পারুলদের বাড়িতেই মানুষ হয়েছি—বিশ্বম্ভরবাবুকে জ্যাঠামশাই বলি।"

"ও, তাই নাকি?"

"আমার বাবা আর বিশ্বম্ভরবাবু খুব বন্ধু ছিলেন। আমরা পশ্চিমে থাকতাম। একবার প্লেগে আমাদের বাড়ির সবাই মারা গেল—এক আমি ছাড়া। জ্যাঠামশাই আমাকে মানুষ করেছেন—বি, এ পর্যন্ত পড়িয়েছেন আমাকে। জ্যাঠামশাই লোক খুব ভাল, বুঝলেন—"

"জানি।"

"কিন্তু ওঁর মতামত বড় সেকেলে ধরণের। এখন অবশ্য আমি

আর ওঁদের বাড়ি থাকি না, আলাদা মেসে থেকে রোজকারের চেষ্টা করছি।”

“কতদিন থেকে?”

“চার মাস।”

“চাকরি পেয়েছেন ?”

“পেয়েছি একটা ছোটখাট গোছের। পঁচাত্তর টাকা মাইনে, তার আগে আর একটা পেয়েছিলাম, মাত্র পঁয়ত্রিশ টাকা পেতাম, তখনই আমি বিয়ের কথা বলেছিলাম।”

“কাকে ?”

“জ্যাঠামশাইকে।”

“তিনি প্রথমে হেসেই উঠলেন, তারপর চটে গেলেন। পারুলকে আমার সঙ্গে দেখাই করতে দিতেন না। আসল কি কারণ জানেন ? উনি আমাকে ওকালতি পড়তে বলেছিলেন—কিন্তু উকীল হয়ে কি হবে বলুন তো ! তার চেয়ে রোজকার করাই তো ভাল এখন থেকে। তাই ওঁর রাগ। আমি সেইজন্যে আর যাই না বড় সেখানে। পারুল কিন্তু ঠিক আছে এসব সত্ত্বেও। আমি জানি সে তার প্রতিজ্ঞা রাখবেই।”

“আপনি ওদের বাড়ি যান না বলছেন, তাহলে পারুলের সঙ্গে কথা হল কি করে ?”

“কেন, ওদের বাগানের বেড়ার ধারে দাঁড়িয়ে। সেই কটা মেয়েটিকে মনে আছে ? সে আমাদের দিকে,—কল্পনা দিদিও। ওকি ! আপনি অমন করলেন যে ? বাজের শব্দে ভয় করে না কি আপনার—বাইরে আকাশে মেঘ ঘনিয়ে আসছিল।

“না, আমার বুকের কাছটা ব্যথা করছে অনেকক্ষণ থেকে।”

সত্যিই পুরন্দরবাবু ব্যথায় কাতর হয়ে পড়ছিলেন। একটু কুঁজো হয়ে তিনি দাঁড়ালেন।

"ও, তাহলে আমি যাই। আপনি শুয়ে পড়ুন, আমি থাকতে অসুবিধে হচ্ছে আপনার।"

"না, কিছু অসুবিধে নেই।"

"চললাম তবু। হ্যাঁ, দেখুন অখিলবাবু—ও, যুগলবাবু বুঝি আপনার নাম? দেখুন যুগলবাবু কি ঠিক করলেন আপনি তাহলে?"

হাস্যদীপ্ত দৃষ্টিতে যুগলের দিকে চাইলে সে।

"পারুলকে রেহাই দিচ্ছেন তো? দিন, বুঝলেন। দিলেন তো?"

"না—" যুগল অধীরভাবে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াল। প্রায় ক্ষেপে যাবার মতো অবস্থা হয়েছিল তার—"আপনি দয়া করে' আমাকে রেহাই দিন"! তর্জ্জনী আস্ফালন করে দিলীপ বললে—"ভুল করছেন আপনি কিন্তু তা বলে' দিচ্ছি। পারুলকে আমি চিনি, সে মরে যাবে তবু আপনাকে বিয়ে করবে না। হিসেবে ভুল করবেন না। ন' মাস পরে ফিরে এসে দেখবেন খাঁচা খালি, পাখী উড়ে গেছে। এরকম 'ডগ্ ইন দি ম্যানজার' পলিসির মানেটা কি বুঝতে পারছি না। মাপ করবেন, উপমার খাতিরে কথাটা বললাম। জিনিষটা ভেবে দেখুন না, চেষ্টা করুন অন্তত।"

"দেখুন আপনার বক্তৃতা শোনবার ইচ্ছে নেই আমার। আপনি যা যা বলে গেলেন সব মনে থাকবে আমার। আপনি যে সব অভদ্র ইঙ্গিত করলেন তা নিয়ে এখন প্রতিবাদ করতে চাই না। কাল এর ব্যবস্থা করব।"

"অভদ্র ইঙ্গিত? তার মানে! আমার কথাগুলো যদি আপনার অভদ্র ইঙ্গিত বলে' মনে হয় তাহলে আপনার মনই অভদ্র বুঝতে হবে। আচ্ছা বেশ, কালকের জন্যে প্রস্তুত থাকব আমি। কিন্তু যদি···আঃ আবার বাজ পড়ল একটা···আচ্ছা চলি। নমস্কার। আপনার সঙ্গে আলাপ করে ভারী খুসী হলাম" পুরন্দরবাবুর দিকে চেয়ে হেসে মাথা নেড়ে দিলীপ বেরিয়ে গেল। বাইরে ঝড় উঠল একটা।

১৫

"দেখলেন ? দেখলেন কাণ্ডটা ? দিলীপ চলে যেতেই যুগল পুরন্দরবাবুর দিকে এগিয়ে গেল।

"আপনার কপালটাই খারাপ" পুরন্দরবাবু উত্তর দিলেন—অর্থাৎ যা মনে এল বলে ফেললেন। বুকের ব্যথাটা এমন বেড়ে উঠছিল যে ভেবে চিন্তে উত্তর দেবার ধৈর্য্য থাকছিল না তাঁর আর।

"আমার প্রতি সহানুভূতিবশতঃই আপনি ব্রেসলেটটা ফেরত দেন নি নিশ্চয় !"

"সময় পেলাম কোথা..."

"আপনার কষ্ট নিশ্চয়ই হয়েছিল, আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু আপনি।"

"হ্যাঁ, কষ্ট হয়েছিল বই কি" বাধ্য হয়ে পুরন্দরবাবুকে বলতেই হল। তিনি সংক্ষেপে ব্যাপারটা বর্ণনা করলেন—পারুলের আগ্রহাতিশয্যেই যে ব্রেসলেটটা নিয়ে এসেছেন তাও বললেন।

"পারুল অত জোর না করলে কিছুতেই নিতাম না আমি...এমনিতেই তো নানা ঝঞ্ঝাটে পড়ে গেছি।"

"পারুল আপনাকে সম্মোহিত করে' ফেলেছিল, সোজা কথা বলুন না।"

"কি যা তা বলছেন। এখনই তো দেখলেন যে পারুলের আপনার উপর বিরাগের কারণ আমি নই। ভিতরে অন্য লোক আছে।"

"আছে। কিন্তু আপনিও সম্মোহিত হয়েছিলেন।"

যুগল চেয়ারে বসে' গ্লাসে মদ ঢালতে লাগল।

"আপনি কি ভাবছেন ছোঁড়াটার ভয়ে ভড়কে যাব আমি ? কালই চাটনি বানিয়ে ফেলব ব্যাটাকে, বুঝলেন ? ধোঁয়া দিয়ে যেমন করে মশা তাড়ায়, ঝাঁটা দিয়ে ধুলো ঝাড়ে—তেমনি করে' বিদেয় করব।"

এক চুমুকে গ্লাসটা নিঃশেষ করে' আবার ঢাললে। বেশ 'মাই ডিয়ার' হয়ে উঠল দেখতে দেখতে।

"পারুলবালা দিলীপকুমার, মাণিকজোড় আমার, মরি মরি—হি—হি—হি" রাগে বুকটা পুড়ে যাচ্ছিল তার। আর একটা বাজ পড়ল খুব জোরে—এক ঝলক বিদ্যুতের আলো জানালা দিয়ে ঢুকল। বৃষ্টিও সুরু হল মুষলধারে। যুগল উঠে জানালাটা বন্ধ করে' দিলে।

"আপনাকে জিগ্যেস করছিল বাজ পড়লে আপনি ভয় পান কি না' হি—হি—হি। আপনার বয়সও পঞ্চাশ টাউরেছে—অ্যাঁ—খিঃ খিঃ—"

পৈশাচিক ভাব ফুটে উঠল তার চোখে মুখে।

"মনে হচ্ছে রাতটা এখানেই কাটাবেন আপনি" খণ্ডিত কণ্ঠে পুরন্দরবাবু কথাগুলো উচ্চারণ করলেন। ব্যথাটা বেশ বেড়ে উঠেছিল—"আমি শুয়ে পড়ছি, আপনি যা খুশী করুন।"

"এই বৃষ্টিতে বেরুই কি করে' বলুন!"

"বেশ তো থাকুন না, যত খুশী মদ গিলুন, গিলে শুয়ে পড়ুন।"

পুরন্দরবাবু সোফাটায় লম্বা হয়ে শুলেন এবং মৃদু আর্তনাদ করলেন।

"রাত্রে থাকতে বলছেন আমাকে ? ভয় করবে না আপনার ?"

"কিসের ভয় ?" মাথা তুলে প্রশ্ন করলেন পুরন্দরবাবু।

"না কিছু নয়। সেবার ভয় পেয়েছিলেন না ? তাই বলছি—"

"এত বাজে কথাও বলতে পারেন।"

পুরন্দরবাবু রেগে দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে শুলেন।

যুগলের মুখে একটা অদ্ভুত নীরব হাসি ফুটে উঠল।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে পুরন্দরবাবু ঘুমিয়ে পড়লেন। সমস্ত দিনের মানসিক

ও দৈহিক উত্তেজনায় অবসন্ন হয়ে পড়েছিলেন তিনি। কিন্তু ব্যথার চোটে ঘুমুতে পারলেন না বেশীক্ষণ, ঘণ্টাখানেক পরে ঘুম ভেঙে গেল। আস্তে আস্তে উঠলেন তিনি বিছানা থেকে। ঝড় বৃষ্টি থেমে গেছে, সমস্ত ঘরটা সিগারেটের ধোঁয়ায় ভরতি টেবিলের উপর খালি বোতলটা পড়ে রয়েছে, আর একটা সোফায় যুগল ঘুমুচ্ছে! চিৎ হয়ে ঘুমুচ্ছে, জামা জুতো কিছু খোলে নি। পুরন্দরবাবু চেয়ে রইলেন তার দিকে খানিকক্ষণ। দুঃখ হল। জাগালেন না তাকে। আস্তে আস্তে ঘরের চারিদিকে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন, ব্যথার চোটে শুতে পারছিলেন না। ভয় করছিল তাঁর এবং ভয় করবার কারণও ছিল। এ রকম ব্যথা মাঝে মাঝে বছরে দু'একবার হয় তাঁর, এর ধরণ ধারণ জানা আছে ভাল করে'। লিভারের ব্যথা। প্রথমে কেমন যেন একটা আড়ষ্ট টাটান ভাব হয়, তারপর বুকের কোন একটা জায়গায় কাঁধের কাছে বরাবর টন টন করতে থাকে। তারপর বেড়ে চলে ক্রমশঃ। দশ ঘণ্টা বার ঘণ্টা চলে, শেষে মনে হয় প্রাণটা বেরিয়ে গেল বুঝি। বছর খানেক আগে শেষবার হয়েছিল। এমন দুর্ব্বল হয়ে পড়েছিলেন যে হাত পর্য্যন্ত নাড়তে পারছিলেন না—ডাক্তারে পাতলা চা ছাড়া আর কিছু খেতে দেয় নি। পরে একবার ক্রমাগত বমি হয়ে তবে কমল। সেঁক দিলেও কমে যায় অনেক সময়। যখন কমে তখন হঠাৎ কমে যায়। ···দেখতে দেখতে ব্যথাটা বেড়ে উঠল খুব। দম বন্ধ হয়ে আসছে যেন। এত রাত্রে ডাক্তার ডাকা মুস্কিল—হুট্ করে ডাকতেও চায় না—কতকগুলো বাজে ওষুধ গেলাবে এসে। ব্যথায় কাতরাতে লাগলেন...কাতরাণির শব্দে যুগলের ঘুম ভেঙে গেল। ঘুম ভেঙে বিছানায় উঠে বসল সে এবং হতভম্ব হয়ে রইল খানিকক্ষণ। পুরন্দরবাবু ছটফট করে বেড়াচ্ছিলেন।

"আপনার ব্যথাটা বাড়ল না কি? সেঁক দিন, কম্প্রেস। চাকরটাকে ডাকব?"

"না থাক।"

কিন্তু যুগল ব্যস্ত হয়ে উঠল। এত ব্যস্ত হয়ে পড়ল যেন তার একমাত্র ছেলের প্রাণ-সংশয়। পুরন্দরবাবুর কথায় কর্ণপাত না করে' সে চাকরটাকে উঠিয়ে ষ্টোভ জেলে গরম জল চড়িয়ে দিলে।

"দু'তিন কাপ গরম গরম চা খেয়ে ফেলুন।"

নিজেই চা করলে। চা খাইয়ে তারপর গরম গরম কম্প্রেস দিতে লাগল পুরন্দরবাবুর গেঞ্জি আর রুমালের সাহায্যে।

"খুব গরম গরম দিন, খুব গরম গরম।"

পুরন্দরবাবু যত আপত্তি করতে লাগলেন, যুগলের উৎসাহ তত বাড়তে লাগল।

"আর একটু চা খাবেন? জল আছে এখনও, খুব গরম খেতে হবে কিন্তু—"

আবার সে ব্যস্ত হয়ে উঠল। আধ ঘণ্টা পরে ব্যথাটা সত্যি কমল। যুগলের ইচ্ছে ছিল আরও কিছুক্ষণ কম্প্রেস দেওয়া, কিন্তু পুরন্দরবাবু আর কিছুতেই রাজি হলেন না।

"এবার ঘুমুতে দিন একটু।"

"বেশ বেশ। ঘুমোন—"

"আপনি যাবেন না, থাকুন। ক'টা বেজেছে?"

"পৌনে দুটো।"

"থাকুন আপনি, যাবেন না।"

মিনিটখানেক পরে পুরন্দরবাবু যুগলকে ডেকে মৃদুকণ্ঠে বললেন—"আপনি, আপনি আমার চেয়ে ঢের বেশী মহৎ। আমি সব বুঝতে পারছি, সব···অনেক ধন্যবাদ আপনাকে।"

"ঘুমিয়ে পড়ুন, বাতি নিবিয়ে দিচ্ছি।"

পা টিপে টিপে যুগল নিজের বিছানার দিকে চলে গেল।

বাতি নিবিয়ে দেবার পর পুরন্দরবাবু যে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন তাতে কোন

সন্দেহ নেই। এটা স্পষ্ট মনে ছিল তার। কিন্তু যতক্ষণ ঘুমিয়েছিলেন জেগে ওঠার পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তিনি স্বপ্ন দেখেছিলেন যে তিনি ঘুমুতে পারছেন না, নিদারুণ ক্লান্তি সত্ত্বেও কিছুতেই ঘুম আসছে না তাঁর। শেষে তাঁর মনে হতে লাগল যেন জেগে কিসের একটা ঘোরে আছেন তিনি, তাঁর আশেপাশে কি সব ছায়া মূর্ত্তি ঘুরছে, তাদের কিছুতেই তাড়াতে পারছেন না —অথচ এটা যে স্বপ্ন—সত্যি কিছু নয়—এ জ্ঞানও তাঁর আছে। ছায়ামূর্ত্তি-গুলো সবই পরিচিত: ঘরময় ঘুরে বেড়াচ্ছে দলে দলে, কপাটটা খোলা রয়েছে, আরও আসছে, সিঁড়িতে ভীড় জমে গেছে। ঘরের মাঝখানে যে টেবিলটা আছে···তার পাশে কিন্তু একটিমাত্র লোক বসে আছে···ঠিক এক মাস আগে যেমন দেখেছিলেন তেমনি। ঠিক আগের স্বপ্নে যেমন দেখে ছিলেন এবারও লোকটা টেবিলের উপর কনুইয়ের ভর দিয়ে বসে আছে, চুপ করে বসে আছে, একটি কথা বলছে না। কিন্তু এবার লোকটা যেন বেঁটে···অনেকটা যুগলের মতো। "সেবারও যুগলকেই দেখেছিলাম না কি" পুরন্দরবাবু ভাবতে লাগলেন। লোকটার মুখের দিকে ভাল করে' চেয়ে দেখলেন—এ অন্য লোক। বেঁটে কেন এত? আশ্চর্য্য! চীৎকার, কোলাহল, কলরবে চতুর্দ্দিক ভরে উঠল। গতবারের চেয়ে এবার লোক গুলো যেন আরও বেশী উত্তেজিত, সবাই মার-মুখী আর সবাই তাঁর বিরুদ্ধে। তাঁকে লক্ষ্য করে' সবাই কি যেন বলছে—চীৎকার করেই বলছে—কিন্তু কি বলছে বুঝতে পারছেন না তিনি ঠিক। "এ কিছু নয়, স্বপ্ন,"—দু'একবার ভাবলেন তিনি—"ঘুম আসছে না, তন্দ্রার ঘোরে স্বপ্ন দেখছি শুধু" —কিন্তু ওই চীৎকার, ওই লোকের ভীড়, ওদের তর্জ্জন গর্জ্জন এত বেশী রকম জীবন্ত যে মাঝে মাঝে সন্দেহও হচ্ছিল। সত্যি স্বপ্ন? উঃ কি চীৎকার! এরা চায় কি? কিন্তু···স্বপ্নই, তা না হলে যুগলের ঘুম ভেঙে যেত ঠিক। ওই তো সোফায় শুয়ে ঘুমুচ্ছে। তারপর হঠাৎ এক কাণ্ড হল···আগের বারও ঠিক এমনি হয়ে ছিল। সবাই এক সঙ্গে ছুটে সিঁড়ি দিয়ে নাবতে গেল,

কিন্তু দুয়ার দিয়ে বেরুতে পাচ্ছে না, আর একদল ঢোকবার চেষ্টা করছে। যারা ঢোকবার চেষ্টা করছে তারা যেন ভারী কি একটি বস্তু বয়ে আনছে—সিঁড়ির উপর তাদের পদশব্দ থেকে বেশ বোঝা যাচ্ছে যে একটা গুরুভার বহন করে' আনছে তারা, কথাবার্তা থেকে বোঝা যাচ্ছে—হাঁপিয়ে পড়েছে। ঘরের মধ্যে যারা ছিল তারা চীৎকার করে' উঠল সমস্বরে—এনেছে, এনেছে। সকলের দৃষ্টি পুরন্দরের উপর পড়ল গিয়ে, সকলেই সিঁড়ির দিকে আঙুল দেখাতে লাগল—এমন ভাবে যেন এইবার পুরন্দরকে কবলের মধ্যে পাওয়া গেছে। এটাকে স্বপ্ন বলে উড়িয়ে দিতে আর সাহস হল না পুরন্দরবাবুর। তিনি বিছানা থেকে উঠে পা টিপে টিপে গিয়ে বুড়ো আঙুলের উপর দাঁড়িয়ে সকলের মাথার উপর দিয়ে দেখবার চেষ্টা করতে লাগলেন কি আনছে ওরা। বুকের ভিতরটায় হাতুড়ি পিটছে কে যেন। তারপর হঠাৎ আগের বার যেমন হয়েছিল—ঠিক তেমনিভাবে ইলেট্রিক বেলটা বেজে উঠল—ঠিক তিনবার। এত স্পষ্ট, এত বাস্তবিক যে স্বপ্ন বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না কিন্তু সেবার যেমন দরজার দিকে ছুটে গিয়ে ছিলেন এবার তা গেলেন না। কি ভেবে যে গেলেন না, বস্তুত কোন ভাবনা সে সময় তাঁর মনে এসেছিল কি না, তা বলা শক্ত—কিন্তু কি করা উচিত তা কে যেন তাঁর কানে কানে বলে দিলে। তিনি একটি আক্রমণ প্রতিরোধ করবার জন্যে হাত দুটো সামনের দিকে বাড়িয়ে দিয়েই বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠলেন। এবং যুগল যেখানে শুয়েছিল সেই দিকে ছুটে গেলেন। হাত বাড়াতেই আর একটি হাতের সঙ্গে ধাক্কা লাগল এবং সে হাতটা তিনি মুটো করে' চেপে ধরলেন—ও, তাহলে একজন তাঁর বিছানার কাছে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে ছিল এসে। ঘরে অন্ধকার বিশেষ নেই, ভোরের আলো ঘরে ঢুকছে। হঠাৎ একটি তীব্র যন্ত্রণা তিনি অনুভব করলেন তাঁর বাঁ হাতের আঙুল-গুলোতে—যেন একটি ধারাল ছুরি কিম্বা ক্ষুর তিনি মুটো করে' ধরেছেন... সঙ্গে সঙ্গে মেঝেতে একটি গুরুভার পতনের শব্দ হল!

পুরন্দরবাবু যুগলের চেয়ে অন্ততঃ তিন গুণ বেশী শক্তিশালী, তবু কিছুক্ষণ ধস্তাধস্তি হল—পুরো তিনটি মিনিট। তারপর তিনি তাকে চিৎ করে' কেবল তার হাত দুটো বেঁকিয়ে পিঠের দিকে নিয়ে গেলেন, তারপর তাঁর মনে হল হাত দুটো বাঁধা উচিত। কাটা বাঁ হাত দিয়ে তাকে চেপে রেখে, ডান হাত বাড়িয়ে তিনি পরদার দড়িটা ছিঁড়ে নিলেন। কি করে, এত কাণ্ড করতে পারলেন পরে তা ভেবে নিজেই বিস্মিত হয়েছিলেন। এই তিন মিনিট দুজনের মধ্যে কেউ একটি কথা বলেন নি, জোরে জোরে নিশ্বাসের শব্দ আর ধস্তাধস্তির অস্ফুট শব্দ ছাড়া অন্য কোন শব্দ ছিল না। হাত দুটো পিছনে বেঁধে তাকে মেঝের উপর চিৎ করে' ফেলে রেখে পুরন্দরবাবু উঠলেন এবং জানালাগুলো খুলে দিলেন। সকাল হয়ে গেছে। জানালার সামনে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি। তারপর ড্রয়ারটা খুলে একটা ফরসা তোয়ালে বার করে' হাতে জড়ালেন সেটা—রক্ত পড়ছিল। দেখতে পেলেন মেঝের উপর একটা খোলা ক্ষুর পড়ে রয়েছে। সেটা তুলে মুড়ে খাপে বন্ধ করে' ফেললেন। কাল সকালে কামাবার পর ক্ষুরটা তুলতে ভুলে গিয়েছিলেন তিনি। যুগল যে সোফাটায় শুয়ে ছিল তারই পাশে ছোট টেবিলটার উপর পড়েছিল ক্ষুরটা। ক্ষুরটা ড্রয়ারে বন্ধ করে' রেখে দিলেন। এই সমস্ত করে' তারপর যুগলের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন তিনি।

যুগল ইতিমধ্যে মেঝে থেকে কোনক্রমে উঠে একটা ইজিচেয়ারে গিয়ে বসেছিল। তার গায়ে একটা কামিজ ছাড়া আর কিছু ছিল না। পায়ে জুতোও ছিল না। কামিজের হাতটা রক্তে ভেজা। পুরন্দরবাবুর রক্ত। তার চেহারা অদ্ভুত রকম বদলে গিয়েছিল—সে লোকই নয় যেন। পিছনে হাত দুটো বাঁধা থাকাতে ভালভাবে চেয়ারে বসতে পারে নি, বাঁকাভাবে বসেছিল। সমস্ত মুখটা যেন মুচড়ে গিয়েছিল, মুখের রংও কেমন যেন অস্বাভাবিক নীলচে গোছের, চিবুকটা মাঝে মাঝে কাঁপছিল থর থর করে'।

পুরন্দরবাবুর দিকে নির্নিমেষে চেয়ে ছিল সে···কিন্তু সে চাউনিতে যেন দৃষ্টি নেই, প্রাণহীন ভাষাহীন চাউনি। হঠাৎ সে বোকার মতো হাসলে একটু তারপর জলের কুঁজোটার দিকে ঘাড় ফিরিয়ে ইতস্ততঃ করে' বললে—"একটু জল খাব।" পুরন্দরবাবু একগ্লাস জল গড়িয়ে মুখের কাছে ধরতেই সে তাড়াতাড়ি মাথা নামিয়ে কয়েক ঢোক জল খেলে, তারপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে একবার চাইলে পুরন্দরবাবুর দিকে, তারপর আবার খেতে লাগল। জল খাওয়ার পর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে চুপ করে' বসে রইল। পুরন্দরবাবু নিজের বালিশ এবং চাদরটা নিয়ে পাশের ঘরে শুতে গেলেন, যুগলের ঘরটার তালা বন্ধ করে দিলেন।

কালকের ব্যথাটা আর ছিল না কিন্তু এই প্রচণ্ড ধস্তাধস্তির পর অত্যন্ত দুর্ব্বল বোধ করছিলেন তিনি। সমস্ত ব্যাপারটা ভালভাবে ভেবে দেখবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু পারলেন না। সমস্তই কেমন যেন অসংলগ্ন মনে হতে লাগল। মাঝে মাঝে তন্দ্রা আসছিল, চোখের সামনে অন্ধকারের মতো ঘনিয়ে আসছিল কি একটা—আবার চমকে উঠে পড়ছিলেন। মনে পড়ে যাচ্ছিল সব, তোয়ালে জড়ানো হাতের কাটা আঙুলগুলো জ্বালা করছিল...আবার প্রাণপণে ভেবে দেখবার চেষ্টা করছিলেন ব্যাপারটা। একটা বিষয়ে তিনি নিঃসংশয় হয়েছিলেন...এ কাজ করবার মিনিট দশেক আগে সে নিজেই জানত না বোধ হয় যে এ কাজ সে করবে। ক্ষুরটা হঠাৎ চোখে পড়ে' গিয়েছিল।

"প্রথম থেকেই যদি ওর উদ্দেশ্য থাকত আমাকে খুন করা তাহলে নিজেই ও ছোরা বা ক্ষুর নিয়ে আসত। আমার ক্ষুরের উপর নির্ভর করত না—তাছাড়া আমার ক্ষুর তো বাইরে থাকে না কখনও—কালই ভুলে ফেলে রেখেছিলাম..." নানা চিন্তার মধ্যে এই কথাটা বারবার মনে হতে লাগল তাঁর।

ছ'টা বাজল। পুরন্দরবাবু উঠে পড়লেন, জামা কাপড় বদলালেন,

তারপর যুগলের ঘরে গেলেন। তালা খুলতে খুলতে তাঁর মনে হল শুধু শুধু তালা বন্ধ করতে গেলাম কেন, দূর করে' তাড়িয়ে দিলেই হত। ঘরে ঢুকে বিস্মিত হয়ে গেলেন। যুগল হাতের বাঁধন খুলে ফেলেছে কি করে' যেন। জামা জুতো পরে' তৈরী হয়ে বসে আছে চেয়ারে। তিনি ঢুকতেই সে উঠে দাঁড়াল। তার চোখের দৃষ্টি যেন বলতে লাগল—"এ নিয়ে আর কিছু বলবেন না, বলবার কিছু নেই—"

"বেরিয়ে যান"—পুরন্দরবাবু বললেন—"আপনার ব্রেসলেট নিয়ে যান।"

দ্বারের কাছ থেকে যুগল ফিরে এল, ব্রেসলেটের বাক্সটা টেবিল থেকে তুলে পকেটে পুরে বেরিয়ে গেল। পুরন্দরবাবুও সিঁড়ির দরজাটা বন্ধ করবেন বলে' তার পিছু পিছু গেলেন। যুগল নাবতে নাবতে একবার ফিরে চাইলে, পুরন্দরবাবুর চোখের দিকে চেয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত, কি একটা বলবে বলে' যেন ইতস্তত করতে লাগল।

"যান"—হাত নেড়ে পুরন্দরবাবু বললেন।

সে নেবে গেল। পুরন্দরবাবু খিল বন্ধ করে' দিলেন।

১৬

পুরন্দরবাবু যেন নিশ্চিন্ত হলেন, একটা বোঝা যেন মন থেকে নেমে গেল। ভারী আরাম বোধ করলেন তিনি। অনির্দ্দিষ্ট যে যন্ত্রণাটা এতদিন ভোগ করছিলেন সেটার যেন অবসান হয়ে গেল সহসা। তোয়ালে বাঁধা হাতটা তুলে দেখলেন—"হ্যাঁ মিটে গেল এবার সব!" সেদিন পাপিয়ার কথাও মনে হল না একবার। যেন রক্তপাতের সঙ্গে সঙ্গে সে স্মৃতিও ধুয়ে গেছে মন থেকে।

মস্ত ফাঁড়া যে একটা কেটে গেল এ অবশ্য বুঝেছিলেন। এই লোকগুলো যারা খুন করবার এক মিনিট আগে পর্য্যন্ত জানে না যে তারা খুন করতে যাচ্ছে, হঠাৎ একটা ছুরি পেলে কম্পিত হস্তে যখন তারা একটা ঘুমন্ত লোকের গলায় ছুরি বসাতে যায়—তখন রক্তের ফিনিক একবার হাতে লাগলেই—এই ভীরু লোকগুলোই অন্য রকম হয়ে যায় হঠাৎ—সমস্ত মাথাটা ধড় থেকে নাবিয়ে দিতে পারে তখন বিনা দ্বিধায়।

তিনি বাড়িতে থাকতে পারলেন না, বেরিয়ে গেলেন। রাস্তায় বেরিয়ে হাঁটতে লাগলেন। তাঁর মনে হতে লাগল অবিলম্বে কিছু একটা করা দরকার তা নাহলে কিছু একটা ঘটে যাবে বুঝি। রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। কারও সঙ্গে কথা কইবার ভয়ানক ইচ্ছে করছিল, এমন কি অপরিচিত লোকের সঙ্গেও। এই জন্যেই বোধহয় ডাক্তারের কথা মনে পড়ল তাঁর—কাটা হাতটা ভাল করে' ব্যাণ্ডেজ করিয়ে নেবার অজুহাতে ডাক্তারের বাড়ি গেলেন তিনি। ডাক্তারবাবু পূর্ব্বপরিচিত লোক, যত্ন করে' কাটাটা দেখলেন, কি করে' কাটল জিগ্যেস করলেন। পুরন্দরবাবু হাসলেন

একটু, আর একটু হলে সব খুলে বলতে যাচ্ছিলেন কিন্তু আত্মসম্বরণ করলেন। ডাক্তারবাবু নাড়িটা পরীক্ষা করে একদাগ ওষুধও খেতে দিলেন, তারপর বললেন যে, কাটা তেমন সাংঘাতিক নয়, সেরে যাবে দু'চার দিনে। সেদিন আরও দুবার সমস্ত কথা খুলে বলবার প্রলোভন হ'ল তাঁর—একবার তো সম্পূর্ণ অপরিচিত একজন লোকের কাছে। আগে অপরিচিত লোকের সঙ্গে আলাপই করতে পরেতেন না তিনি পথে ঘাটে।

একটা দোকানে গিয়ে বই কিনলেন, কোট করাতে দিলেন একটা দর্জির কাছে। নীলিমা দেবীর কাছে যেতে ইচ্ছে করছিল না, তিনি আশা করছিলেন তারাই এসে পড়বে। হোটেলে ঢুকে খেলেন ভাল করে'। লিভারের ব্যপারটা আবার যে চাগাতে পারে এ কথা মনে হল না। তাঁর যে কোন ব্যাধি আছে একথা আর তাঁর মনেই হচ্ছিল না। তিনি যখন ঘুম থেকে লাফিয়ে উঠে যুগল পালিতকে অমন অবস্থায় পেড়ে ফেলতে পেরেছেন তখন তাঁর আর কোন অসুখই নেই। সন্ধ্যাবেলায় অবসন্ন বোধ করতে লাগলেন। যখন বাসায় ফিরলেন তখন বেশ অন্ধকার হয়ে গেছে। ঘরে ঢুকতে কেমন যেন ভয় ভয় করতে লাগল। সমস্ত বাসাটারই কেমন যেন ভুতুড়ে-ভুতুড়ে ভাব, তবু চারিদিকে ঘুরে ঘুরে দেখলেন। এমন কি যে রান্নাঘরে কখনও ঢোকেন না, সেখানেও উঁকি দিয়ে দেখলেন একবার। কপাটে খিল দিয়ে আলোটা জ্বাললেন। খিল দেবার আগে চাকরটাকে ডেকে একবার জিগ্যেস করলেন—যুগলবাবু এসেছিল কি? যেন যুগলবাবুর আসা সম্ভব এর পর!

ঘরে খিল দিয়ে ড্রয়ারটা খুললেন, ক্ষুরটা বার করে' ভাল করে' দেখলেন আবার। সাদা বাঁটটায় রক্ত লেগে আছে এখনও একটু। আবার বন্ধ করে রাখলেন সেটাকে। ঘুম পেতে লাগল, ভাবলেন আর দেরী না করে' এখনই শুয়ে পড়ি, কাল শরীরের গ্লানি কাটবে না তা' না হলে। কাল যে বিশেষ কিছু একটা ঘটবে এ কথা খালি মনে হচ্ছিল।

কিন্তু যে চিন্তাটা সমস্ত দিন তাঁকে একমুহূর্তের জন্য ছাড়ে নি, সমস্ত দিন রাস্তায় রাস্তায় ঘুরতে ঘুরতে যে কথাটা তিনি ক্রমাগত ভেবেছেন, এখন সেই চিন্তাগুলোই তাঁর ক্লান্তমস্তিষ্কে ভীড় করে' আসতে লাগল আবার। ঘুম এল না।

"আমাকে খুন করবার কথাটা তার হঠাৎই না হয় মনে হয়েছিল কাল, মানলাম—কিন্তু এর আগে কখনও কি সে একথা ভাবে নি একবারও ?" শেষে এক অদ্ভুত সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন তিনি—"যুগল আমাকে মারতে চেয়েছিল, কিন্তু খুন করবার কথা তার মনে হয় নি"—সংক্ষেপে—যুগল তাঁকে অজ্ঞাতসারে মারতে চেয়েছিল, সচেতন ভাবে নয়। যদিও এটা অদ্ভুত শোনাচ্ছে—কিন্তু এইটেই সত্য। যুগল এখানে চাকরির জন্যেও আসে নি—পূর্ণ গাঙুলীর জন্যেও আসে নি—যদিও চাকরির চেষ্টা করেছিল, পূর্ণ গাঙুলীর সঙ্গে দেখাও করতে গিয়েছিল, পূর্ণ গাঙুলী ফাঁকি দিয়ে সরে' যাওয়াতে মর্মাহতও হয়েছিল খুব—কিন্তু তারপর সে আর পূর্ণ গাঙুলীর কথা একদিনও বলে নি—না, আসলে এসেছিল ও আমার জন্যে, আর সেইজন্যেই পাপিয়াকে নিয়ে এসেছিল···"

যুগল আমাকে খুন করতে পারে এ কথা কি ভেবেছিলাম আমি ? তাঁর মনে পড়ল, ভেবেছিলেন। যুগলকে পূর্ণ গাঙুলীর পশ্চাদ্গমন করতে যে দিন দেখেছিলেন সেইদিনই তাঁর মনেও এ আশঙ্কা হয়েছিল নই কি। তিনি প্রতি মুহূর্তেই কিছু একটা প্রত্যাশা করছিলেন···কিন্তু ঠিক এ রকম নয়···এটা তিনি প্রত্যাশা করেন নি ঠিক···না, খুন করবে এটা ভাবেন নি।

"এ কি কখনও সত্যি হতে পারে ? আমাকে কত ভালবাসে, কত শ্রদ্ধা করে—কালই তো বলছিল বুক চাপড়ে চাপড়ে—গলাটা কাঁপছিল। সব মিছে কথা ? মোটেই না। ও রকম লোক আছে। ওরা একাধারে নীচ এবং মহৎ—স্ত্রীর প্রণয়ীকে স্বচ্ছন্দে শ্রদ্ধা করতে পারে ওরা। স্ত্রীর সঙ্গে কুড়ি বছর বাস করল, তার এতটুকু স্খলন চোখে পড়ল না অথচ আমার

কথা, আমার ব্যবহার, আমার কবিতার লাইন—ন'বছর ধরে' শ্রদ্ধাসহকারে মনে করে' রেখেছে ও। অথচ আমি এর কিছুই জানতাম না। কিন্তু কাল তো বলেছিল "আমি বোঝাপড়া করতে চাই"—এটা কি ভালবাসার লক্ষণ? হতে পারে বই কি। আমাকে অত্যন্ত ঘৃণা করে বলেই অত্যন্ত ভালবাসে হয় তো…"

বর্দ্ধমানে থাকতে হয় তো—হয় তো কেন নিশ্চয়ই—খুব বেশী রকম অভিভূত হয়ে পড়েছিল লোকটা আমাকে দেখে…ওরা সহজেই অভিভূত হয়। আমাকে একটু ভাল লাগতেই শতগুণ বাড়িয়ে তুলেছিল আমাকে মনে মনে। কি দেখে ভাল লেগেছিল জানতে ইচ্ছে হয়…হয় তো আমার কামিজের ছিট বা সিগারেট-হোলডার দেখে। ওই সবে খুব মুগ্ধ হয় ওরা। কামিজের ছিটটুকু ওরা দেখতে পায়, বাকীটা সৃষ্টি করে' নেয় কল্পনায়। তারপর ভক্ত হয়ে পড়ে। আর…। আমার লোককে মুগ্ধ করবার ক্ষমতাও হয় তো তাক লাগিয়ে দিয়েছিল।…এসে বললে, আপনাকে জড়িয়ে ধরে' আমি কাঁদতে এসেছি…অথচ এসেছিল খুন করতে…। পাপিয়াকেও এনেছিল সঙ্গে করে'।"

হঠাৎ পুরন্দরবাবুর মনে হল—"কি জানি, হয় তো আমিও যদি কাঁদতাম ওর গলা জড়িয়ে, তাহলে হয় তো ও আমায় ক্ষমা করত। ক্ষমা করতেই তো এসেছিল। ক্ষমা করবার ভয়ানক একটা আগ্রহ ছিল তার।…প্রথম ধাক্কাতেই কিন্তু বদলে গেল লোকটা, সুরই বদলে ফেললে। মেয়েলি সুরে শুরু হয়ে গেল ভ্যানভ্যানানি আর প্যানপ্যানানি। সব বলবার জন্যে ইচ্ছে করে' মাতাল হয়ে আসত, কিন্তু সবটা মাতলামিই হয়ে পড়ত আর কিছু হত না। মদ না খেলেও ও কিছু বলতেও পারত না। ভাঁড়ামি করা স্বভাব লোকটার…আমাকে দিয়ে চুমু খাইয়ে কি ফুর্ত্তি…তখনও ঠিক করতে পারে নি বোধ হয় যে খুন করবে, না ভাব করবে। দুইই করবার ইচ্ছে ছিল বোধ হয়। উদারস্বভাব পিশাচই সব চেয়ে ভয়ঙ্কর। প্রকৃতি তাদের মা নয়,

সৎ মা—তাদের পীড়ন করে কেবল, স্নেহ করে না। পাগল করে' তোলে শেষ পর্য্যন্ত।

দ্বিতীয় পক্ষে বিয়ে করবে—আমাকে নিয়ে গেছে বউ দেখাতে! কি বোকা! বউ! যুগল পালিতের বউ! ওর মতো গাড়োলই ভাবতে পারে যে ও আবার বিয়ে করে' সুখী হবে। কচি মেয়েটার দফা নিকেশ করবার চেষ্টায় আছে···তোমার দোষ নেই যুগল···তোমার আশা আকাঙ্খাও তোমারই মতো অদ্ভুত। অদ্ভুত যে তা নিজেও বোধ হয় বুঝত, তাই শ্রদ্ধেয় পুরন্দরকে দিয়ে নিজের খেয়ালটাকে বাঁচিয়ে নেবার প্রয়োজন হয়েছিল! আমাকে দিয়ে বিয়েটা সমর্থন করিয়ে নেবার তাই বোধ হয় এত আগ্রহ।···ভুলে ক্ষুরটা যদি বাইরে ফেলে না রাখতাম তাহলে বোধ হয় কিছু হত না। তাই কি? আমার জন্যেই যদিও এসেছিল, তবু এড়িয়েই চলছিল আমাকে, পনর দিন তো দেখাই করে নি। পূর্ণ গাঙ্গুলীকে নিয়ে পড়েছিল প্রথমে।···কাল আমাকে কম্প্রেস দেবার কি ধুম! কাকে তোলাচ্ছিল? আমাকে, না, নিজেকে?"

একই কথা নানাভাবে ক্রমাগত ভাবতে লাগলেন পুরন্দরবাবু, শেষে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। সকালে উঠে অনুভব করলেন মাথাটা বেশ ধরে' আছে—শুধু তাই নয়, নতুন ধরণের একটা আতঙ্কও বসে আছে সারা মন জুড়ে।

নতুন ধরণের আতঙ্কটা বেশ অপ্রত্যাশিত। তাঁর মনে হতে লাগল যে শেষ পর্য্যন্ত তাঁকে যুগল পালিতের কাছে যেতে হবে। কেন? কি দরকার? তা তিনি জানেন না, জানতে চানও না—এইটে শুধু অনুভব করছিলেন যে যেতে হবে। কারণ যা-ই হোক। এই পাগলামির—পাগলামি ছাড়া আর কি—একটা অজুহাতও জুটে গেল শেষ পর্য্যন্ত। তাঁর ভয় হচ্ছিল যুগল পালিত হয়তো গলায় দড়ি দেবে। কেন? তখনই মনে হল অনুরূপ অবস্থায় পড়লে আমিও হয়ত দিতাম।

শেষ পর্য্যন্ত যুগলের বাসার দিকেই অগ্রসর হলেন তিনি। তারপর চাকরটার কাছে খোঁজ নিয়ে চলে আসব। কিছুদূর গিয়েই কিন্তু থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। মনে হল তার কাছে নতজানু হয়ে গলদশ্রুলোচনে ক্ষমা চাইতে যাচ্ছি না কি? এইটে করলেই তো চূড়ান্ত হয়ে যায়!

কিন্তু ভগবান রক্ষা করলেন তাঁকে—হঠাৎ দিলীপ হালদারের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল তাঁর। দিলীপ ঊর্দ্ধশ্বাসে আসছিল—ভয়ানক উত্তেজিত মনে হল।

"আপনার কাছেই যাচ্ছিলাম। যুগলবাবু কি করলে জানেন শেষ পর্য্যন্ত?"

"গলায় দড়ি দিয়েছে না কি।"

"কে গলায় দড়ি দিয়েছে? কেন?"

"না না কিছু নয়—কি বলছিলেন বলুন।"

"কি যে অদ্ভুত কথা সব বলেন আপনি! গলায় দড়ি দিতে যাবে কোন দুঃখে। চলে গেল। আমি তাঁকে ট্রেণে তুলে দিয়ে আসছি। উঃ! কি ভয়ানক মদ খায়। একটি বোতল পুরো খেয়ে ফেললে। ট্রেণে গান গাইছিল, আপনাকে নমস্কারও জানিয়েছে। আচ্ছা, লোকটা একটা স্কাউণ্ড্রেল, নয়?"

পুরন্দরবাবু অট্টহাস্য করে' উঠলেন।

"সব ছেড়েছুড়ে চলে গেল শেষ পর্য্যন্ত। অ্যাঁ! চলে গেল!"

"হ্যাঁ। জ্যাঠামশায়ের কাছে গিয়ে খুব লাগান-ভাঙান করলে, কিন্তু কিছু হল না। পারুল কিছুতে রাজি হল না। আপনার কথা খুব বলছিল কিন্তু। মানে বিরুদ্ধে—। যাই বলুক, আমাদের কিন্তু আপনার উপর শ্রদ্ধা এতটুকু কম না। আপনি যে ভদ্রলোক তা একনজরেই বোঝা যায়। আজকাল মুশকিল কি হয়েছে জানেন, শ্রদ্ধা করবার মতো লোক খুঁজে পাওয়া শক্ত। বুড়ো হলেই শ্রদ্ধেয় হয় না, কি বলেন? ও আপনাকে একখানা চিঠি দিয়েছে···এই নিন—ভুলেই যাচ্ছিলাম।"

পুরন্দরবাবু চিঠিটা নিয়ে বিমূঢ়ের মতো দাঁড়িয়ে রইলেন চুপ করে।

"আপনার হাতে কি হল ?"

"কেটে গেছে।"

"কি করে ?"

"এমনি, ছুরিতে—তোমাদের বিয়ে হচ্ছে কবে ?"

"আমাদের ? সে এখন সুদূরপরাহত। তবে এই ফাঁড়াটা খুব কেটে গেল। আচ্ছা চলবাম তাহলে আমি। আমার অনেক কাজ···চলি।"

মুচকি হেসে ঘাড় নেড়ে দিলীপ হালদার গলির বাঁকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

পুরন্দরবাবু বাড়ি ফিরে এসে চিঠিটা খুললেন। খামের ভিতর যুগলের লেখা একটি ছত্রও ছিল না। চিঠির কাগজ এত পুরোনো যে হলদে হয়ে গেছে, কালির রংও বিবর্ণ। চিঠিখানা অপর্ণা তাকে লিখেছিল···বহুদিন আগে। এ চিঠি তো তিনি পান নি! এর বদলে আর একটা চিঠি পেয়েছিলেন। এ চিঠিতে অপর্ণা তাঁর কাছে বিদায় চাইছে। লিখেছে যে আর একজনকে সে ভালবেসেছে। সে যে সন্তানসম্ভবা সে কথাও লিখেছে। "যদি বলেন আপনার সন্তানকে আপনার কাছে পৌঁছেও দিতে পারি···হাজার হোক আপনারও একটা কর্ত্তব্য আছে তো"···এ কথাও লিখেছে।

পুরন্দরবাবুর মুখখানা বিবর্ণ হয়ে গেল সহসা। চিঠিখানা পড়তে পড়তে তিনি কল্পনা করতে চেষ্টা করলেন—যুগল যখন চিঠিখানা প্রথম পড়েছিল তখন কি রকম মুখভাব হয়েছিল তার।

১৭

ঠিক দুটি বছর অতীত হয়েছে।

পুরন্দর রায়চৌধুরী লক্ষ্ণৌ চলেছেন। সেখানে এক বন্ধুর বাড়িতে নিমন্ত্রণ আছে, শুধু নিমন্ত্রণ নয়, চমৎকার সম্ভাবনাও আছে একটা। একটি সুরসিকা সুন্দরীর সঙ্গে অনেক দিন থেকে আলাপে করার ইচ্ছে—এই বন্ধুটির সাহায্যে সে বাসনা চরিতার্থ হবার সম্ভাবনা আছে। এই দু'বছরে অনেক পরিবর্ত্তন ঘটেছে তাঁর। যে সব মানসিক পীড়ায় তিনি সর্ব্বদা উদ্বিগ্ন থাকতেন তা আর নেই। দু'বছর আগে কোলকাতায় মকোর্দ্দমার হাঙ্গামার মধ্যে যে সব অদ্ভুত 'স্মৃতি' পাগল করে' তুলত তাঁকে—সে সব তিরোহিত হয়েছিল। নিজের সে সব দৌর্ব্বল্যের কথা স্মরণ করে' এখন মাঝে মাঝে লজ্জিত হন শুধু। এখন প্রতিজ্ঞা করেছেন ও জাতীয় দুর্ব্বলতাকে আর প্রশ্রয় দেবেন না কখনও। তখন কারও সঙ্গে মিশতেন না, লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়াতেন, নোংরাভাবে থাকতেন···সকলেই আশ্চর্য্য হয়ে যেত তাঁর ব্যবহারে—এখন আর সে সব কিছু নেই। এখন সকলের সঙ্গে মেশেন হাসেন, কথা কন, যেন কিছুই হয় নি। এই পরিবর্ত্তনের মূল কারণ অবশ্য মকোর্দ্দমাটা জিতেছিলেন তিনি। তিন লক্ষ টাকা পেয়েছিলেন সব শুদ্ধ। তিন লক্ষ টাকা অবশ্য খুব বেশী টাকা নয়, কিন্তু তাঁর পক্ষে যথেষ্ট। প্রথমতঃ—দাঁড়াতে পেরেছেন যে এতেই খুশী আছেন তিনি। প্রথম যৌবনে বোকার মতো অনেক টাকা উড়িয়েছেন এবার শিক্ষা হয়ে গেছে। যদি না ওড়ান তাহলে যা আছে তা তাঁর জীবনের পক্ষে যথেষ্ট।

হজুকে মাতবার আর প্রবৃত্তি নেই···নিজের ক্ষুদ্র স্বর্গেই সন্তুষ্ট আছেন তিনি। নিজের পছন্দ মতো খাবারটি, দু' একটি অন্তরঙ্গ বন্ধু, এক আধটি বান্ধবী, খান কয়েক ভাল বই—এর বেশী কিছু কাম্য নেই তাঁর আর। এই জীবনেই ক্রমশঃ মশগুল হয়ে পড়েছিলেন তিনি। আগেকার উদ্দাম পুরন্দরবাবু আর ছিলেন না। চেহারারও পরিবর্ত্তন হয়েছিল। বেশ শান্ত গম্ভীর প্রফুল্ল মুখ-শ্রী হয়েছিল এখন। বলি-রেখাগুলো পর্য্যন্ত ছিল না। রংও ফিরে গিয়েছিল।

প্রথম শ্রেণীর একটা কামরায় বসেছিলেন তিনি। পরের ষ্টেশন মোগলসরাই। আর একটা মনোরম কল্পনায় তা দিচ্ছিলেন তিনি বসে' বসে'। ভাবছিলেন "কাশীটা ঘুরে গেলে কেমন হয়। কাশী থেকে তারপর লক্ষ্ণৌ যাওয়া যাবে। কাশীতে মীনা বসে' বিরহ-যন্ত্রণা ভোগ করছে, তার সঙ্গে একটু আড্ডা দিয়ে গেলে মন্দ হয় না।" মীনা তাঁর একজন প্রাক্তন বান্ধবী। মোগলসরাইয়ে নেবে পড়বেন কি না ঠিক করতে পারছিলেন না। কিন্তু এমন একটা ঘটনা ঘটল যে দ্বিধার আর অবসর রইল না।

মোগলসরাই ষ্টেশনে অনেকক্ষণ গাড়ি থামে। কিছু খেয়ে নেবার জন্যে পুরন্দরবাবু গাড়ি থেকে নাবলেন। কেলনারের কাছে গিয়ে দেখেন একটা ভীড় জমে গেছে। একটি সুসজ্জিতা যুবতীকে কেন্দ্র করে দুটি লোক খুব উত্তেজিত হয়েছেন···একটি মাড়োয়ারি এবং একটি বাঙালী ছোকরা। যুবতীটির অলঙ্কার এবং পোষাক পরিচ্ছদের জাঁকজমক দেখলে হাসি পায়··· কিন্তু তিনি সুন্দরী এবং যুবতী—সুতরাং না হেসে সবাই হাঁ করে' চেয়েছিল তাঁর দিকে। মাড়োয়ারিটি নাকি পাশ দিয়ে চলে যাওয়ার সময় মেয়েটির গায়ে হাত দিয়েছে···বাঙালী ছোকরা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছেন তা। প্রতিবাদ করাতে মাড়োয়ারি অপমানসূচক কথা বলেছে কি একটা। বাঙালীটি যদিও বলিষ্ঠ যুবক, কিন্তু এত মদ্যপান করেছেন যে দাঁড়াতে পারছেন না ভাল করে'। মাড়োয়ারি তাঁর এই অবস্থার সুযোগ নিয়ে তম্বি করছে। মেয়েটি সসঙ্কোচে দাঁড়িয়ে আছে একধারে এবং মাঝে মাঝে মৃদুস্বরে—"আপনি

সরে' আসুন বীরেনবাবু" বলছে ; এমন সময় রঙ্গস্থলে পুরন্দর প্রবেশ করলেন এবং নিমেষের মধ্যে সমস্ত ব্যাপারটা হৃদয়ঙ্গম করে' যা করলেন তা বাস্তবিকই নাটকীয়। এক বিরাট চপেটাঘাতে মাড়োয়ারিটিকে নিরস্ত করে' ভদ্রমহিলার দিকে চেয়ে বললেন—"বসুন আপনারা কেলনারে গিয়ে। এর ব্যবস্থা আমি করছি। এখানকার দারোগার সঙ্গে আলাপ আছে আমার।"

পুরন্দরবাবুর চেহারা এবং পরুষ ব্যবহার দেখে মাড়োয়ারি হকচকিয়ে গিয়েছিল। সে ব্যবসায়ী লোক, ভীড়ের মধ্যে স্ত্রী-অঙ্গের লালিত্যটুকু বিনা পয়সায় উপভোগ করতে গিয়ে বিপন্ন হয়েছে যদিও—কিন্তু ব্যবসায়-বুদ্ধিই তাকে বাঁচালে শেষ পর্য্যন্ত। পুরন্দরবাবু-জাতীয় লোকদের সে চেনে, এদের কি করে' বশ করতে হয় তাও জানা আছে। ঝুঁকে সেলাম করে' বললে "মাফি মাংতে হেঁ হুজুর। ভীড় মে হাত লাগ গিয়া থা।"

পুরন্দরবাবু তাঁকে ছেড়ে দিলেন। মহিলাটির দিকে চেয়ে হেসে বললেন, "চলুন আমরা চা খাই গে।"

বীরেনবাবু টলছিলেন। তিনি নমস্কার করে' বললেন—"ধন্যবাদ মশাই। বেশ করেছেন, খুব করেছেন। ব্যাটা মেড়ো···"

"চলুন চা খাওয়া যাক" পুরন্দরবাবু আবার বললেন।

"উনি যে ট্রেন থেকে নেমে কোথা গেলেন" মহিলাটি এদিক-ওদিক চাইতে লাগলেন বিরক্তিভরে।

"উনি আসবেন এখুনি। জিনিস সামলাচ্ছেন"—বীরেনবাবু বললেন।

"আপনারা কেলনারে বসুন ততক্ষণ। আমি খুঁজে আনছি তাঁকে। কি নাম ভদ্রলোকের—?"

"যুগল পালিত।"

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বেঁটে যুগল পালিত ভীড় ঠেলে এসে হাজির হল। পুরন্দরবাবুকে দেখে চমকে উঠল সে—যেন ভূত দেখেছে। হাঁ করে' দাঁড়িয়ে রইল। তার স্ত্রী তাকে যা বলছিল তা যেন সে শুনতেই পাচ্ছিল না,

পুরন্দরবাবুকে দেখে হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল সে। তার স্ত্রী বলছিল—"ওই ভদ্রলোক না থাকলে যে কি মুশকিলেই পড়তাম আমি—"

পুরন্দরবাবু হেসে উঠলেন।

"আরে! যুগলবাবু নাকি"—তারপর তার স্ত্রীর দিকে ফিরে বললেন—"আমরা দুজন পুরোনো বন্ধু···। আপনাকে পুরন্দরের কথা বলেনি কখনও?"

"না, বলেনি তো—"

"বলা উচিত ছিল। দিন, ফর্মালি আমাদের পরিচয় করিয়ে দিন। বিয়ের সময় একটা খবরও তো দিলেন না। আচ্ছা লোক আপনি মশাই—"

যুগল আমতা আমতা করে' বললে—"ও হ্যাঁ—বিয়ের সময় নানা গোলমালে—হ্যাঁ···ললু···ইনি ইনি আমার বন্ধু···পুরোনো বন্ধু পুরন্দরবাবু—"

বলতে বলতে থেমে গেল সে হঠাৎ—দুটো চোখ দিয়ে দু'ঝলক আগুন বেরুল যেন।

পুরন্দরবাবু হাত তুলে নমস্কার করলেন। 'ললু'ও প্রতি-নমস্কার করে' বললেন, "ভাগ্যে আপনি ছিলেন, তা না হলে কি মুশকিলেই যে পড়তাম।"

পুরন্দরবাবু সকলকে নিয়ে কেলনারে ঢুকলেন। একটু পরেই পরিচয় হয়ে গেল ভাল করে'। পুরন্দরবাবুর পরিচয় শুনে ললু একমুখ হেসে বললেন—"আপনিও বেড়াতে বেরিয়েছেন? চলুন না আমাদের সঙ্গে হরিদ্বার। আমরা একটা বাড়ি নিয়েছি সেখানে একমাসের জন্যে। চলুন না, যাবেন?"

"বেশ তো। দিন দশেক পরে যেতে পারি।"

যুগল পালিতের মুখখানা কালো হয়ে গেল।

বীরেনবাবু হাত ঘড়ি দেখে বললেন—"আর বেশী দেরী নেই কিন্তু। এবার ওঠা যাক—"

পুরন্দরবাবু হরিদ্বারে যাবেন শুনে বীরেনও একটু বিচলিত হয়ে পড়েছিল। চা খাওয়া কোন রকমে সেরে সে ললুকে নিয়ে তাড়াতাড়ি গিয়ে ট্রেনে উঠল। যুগল পালিত বসে রইল। ওরা চলে যেতেই সে

পুরন্দরবাবুর দিকে চেয়ে স্খলিতকণ্ঠে জিগ্যেস করলে—"সত্যিই আসছেন আপনি হরিদ্বারে ?

"আপনি একটুও বদলান নি দেখছি"—হেসে ফেললেন পুরন্দরবাবু—

"আপনি সত্যিই ভেবেছেন আমি যাব ? পাগল না কি, আমার সময় কোথায় হা—হা—হা—"

যুগল পালিতের মুখও উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

"ও যাচ্ছেন না তাহলে—"

"না যাচ্ছি না, ভয় নেই আপনার।"

"যা খুশী বলবেন। বলবেন আমার পা ভেঙে গেছে—।"

"বিশ্বাস করবেন না সে কথা।"

"না করলেই বা। ও বাবা, গিন্নির ভয়ে যে একেবারে অস্থির দেখছি।" যুগল হাসবার চেষ্টা করলে একটু কিন্তু পারলে না। পুরন্দরবাবুর ব্যঙ্গটা কশাঘাত করলে যেন তাকে।···গাড়ি ছাড়বার ঘণ্টা পড়ল। পুরন্দরবাবু ঠিক করে' ফেলেছিলেন এ গাড়িতে আর যাবেন না, এখানেই ব্রেক জার্নি করবেন। ষ্টেশন প্লাটফর্মে থাকতে তাঁর ভারী ভাল লাগে। জিনিসপত্র ওয়েটিংরুমে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

পুরন্দরবাবু হঠাৎ প্রশ্ন করলেন—"এই বীরেনবাবুটি কে ?"

"ও আমার দূর সম্পর্কের একজন ভাই হয়। ভাল ফুটবল খেলত। একটা চাকরিও করে' দিয়েছিলাম, কিন্তু রাখতে পারলে না। মদেই মাটি করেছে ওকে···।"

পুরন্দরবাবুর মনে হল—"বাঃ, ঠিক জুটে গেছে, ষোলকলা পূর্ণ একেবারে।"

"যুগলদা, আসুন না।"

বীরেন গাড়ি থেকে ডাকতে লাগল।

যুগল পালিত উঠতে যাচ্ছে এমন সময় হঠাৎ পুরন্দরবাবু তাকে

বললেন—"এখন যদি আপনার স্ত্রীকে গিয়ে বলি যে আপনি রাত্রে আমাকে খুন করতে গিয়েছিলেন, কেমন হয় তা হলে?"

"অ্যাঁ, কি যে বলেন!" যুগলের মুখ পাংশু বর্ণ হয়ে গেল।

"যুগলদা, যুগলদা ও যুগল দা—।"

বীরেনবাবুর জড়িত কণ্ঠস্বর আবার শোনা গেল।

"আচ্ছা যান আপনি।"

"সত্যিই আপনি আসছেন না তো?"

"শপথ করব? ট্রেণ ছাড়ছে যান।" এই বলে পুরন্দরবাবু সত্যার সাহেবী ভঙ্গীতে হাতটা বাড়িয়ে দিলেন শেকহ্যাণ্ড করবার জন্তে। বাড়িয়েই কিন্তু অপ্রস্তুত হয়ে পড়তে হল, যুগল হাত বাড়ালে না। এমন কি সরিয়ে নিলে।

গাড়ি ছাড়বার তৃতীয় ঘণ্টা পড়ল।

মুহূর্তে দু'জনের মধ্যে কি একটা কাণ্ড ঘটে গেল যেন। কি একটা যেন ছিঁড়ে গেল, কেটে গেল। পুরন্দরবাবু হঠাৎ বজ্রমুষ্টিতে যুগলের ঘাড়টা ধরে কাটা হাতটা তার মুখের সামনে ধরে বললেন—"এই হাত আমি বাড়িয়ে দিতে পারলাম, আর আপনি সেটা নিতে পারলেন না।"

যুগলের ঠোঁট কাঁপতে লাগল, সর্বাঙ্গ শিউরে উঠল।

প্রায় অস্ফুট কণ্ঠে সে বললে—"আর পাপিয়া?"

হঠাৎ তার ঠোঁট, গাল, থুতনি সব থর থর করে কেঁপে উঠল, চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল। পুরন্দরবাবু তাকে ছেড়ে দিয়ে নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

"যুগল দা, কি করছ তুমি, ট্রেণ যে ছাড়ে—"

গার্ডের হুইস্‌ল্ শোনা গেল।

যুগল পালিত হঠাৎ ছুটে বেরিয়ে গেল এবং চলন্ত ট্রেণে লাফিয়ে উঠে পড়ল। পুরন্দরবাবু দাঁড়িয়ে রইলেন চুপ করে'।



বনফুল

রচনাবলী ০৬